গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান

সুভাষ সমাজদার

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫-২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রণে :
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শর্মিষ্ঠাকে

GANGA THEKE CASPIAN
A Historical
Novel
Subhas Samajdar

॥ গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ানের অগ্রজ

আবগারী দারোগার ডায়েরী

কোরিয়ার গণযুদ্ধ

দাসদাসীর হাট

হারেমের নায়িকা

ঢেউ কথা কয়

কৈফিয়ৎ

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা অচল।

কিন্তু প্রচলিত ধারায় ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসের চেয়ে নিঃসন্দেহে আলোচ্য গ্রন্থের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কেননা, বর্তমান উপন্যাসটির পটভূমি গৌড় থেকে মস্কো পর্যন্ত প্রসারিত। কাল—ষোড়শ শতাব্দীর সাতের দশক। তাই এই গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা।

প্রায় বছর দশেক আগে আর একটি গ্রন্থের উপাদান খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মালদহ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে নজরে পড়েছিল একটি চমকপ্রদ তথ্য—'In the year 1577, one Sheik Bhik, who used to trade in Maldahi cloths, set sail for Russia with three ships laden with silk clothes, and that two of which unfortunately wrecked somewhere near the Persian Gulf.' (Bengal District Gazetteer Malda—Lambourne, 1910, P. 59)। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা'য় এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাসে'ও (দ্বিতীয় খণ্ড) ভিখু শেখের উল্লেখ আছে। অনেক অনুসন্ধান করেও ভিখু শেখের সম্বন্ধে আর কোন তথ্য কোথাও পাই নি। কিন্তু গেজেটীয়ারের এই তথ্যটুকুই আমার মনে জাগিয়ে তুলল অনেকগুলো প্রশ্ন—ষোড়শ শতাব্দীর সেই সপ্তম দশকে এক বাঙালী ব্যবসায়ী হঠাৎ রাশিয়ায় গেল কেন? কেমন করে গেল? সুদূর সেই অতীতে বাংলার তথা ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার কোন ব্যবসায়িক সম্বন্ধ ছিল কিনা? আমার বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম P. M. Kemp রচিত 'Bharat-Rus' গ্রন্থে। ষোড়শ শতাব্দী নয়, সেই নবম শতাব্দী থেকেই রুশীয় সওদাগররা তাদের পণ্য নিয়ে ভল্গা নদীর তীরবর্তী বন্দর বুলজার এবং রাশিয়ার একদা বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র ও ধনেজনে সমৃদ্ধ শহর নভোগোরোদ ও কিয়েভ থেকে আস্ত্রাখান, বাকু, তাব্রিজ হয়ে একেবারে চলে আসতো বাগদাদে কি বোখারায়। এদিকে মুলতান, লাহোর, দিল্লী এবং উত্তর-ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর থেকেও ভারতীয় বণিকদের পণ্য বোঝাই কাফেলা চলে যেত বাগদাদে, বাকুতে, আস্ত্রাখানে। দুই দেশের সওদাগররা ব্যবসার সূত্রেই কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরের ঐ শহরগুলোতে পাশাপাশি বসবাস

করতো বছরের পর বছর। 'There was abundant opportunity for mutual intercourse for the merchants habitually took two to three years to complete their business.' (Bharat-Rus, Kemp. P. 65). তাহলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আজকের ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর আভাস সূচিত হয়েছিল হাজার বছর আগে। কাস্পিয়ান-ভল্গার জলের কলরোলে ধ্বনিত হয়েছিল দুটো দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ইতিবৃত্ত।

ভারত থেকে হিন্দু ব্যবসায়ীরা সঙ্গে নিয়ে যেত শালগ্রাম শিলা আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত। কালক্রমে বাকুতে, আস্ত্রাখানে গড়ে ওঠে ভারতীয় বেনিয়াদের স্থায়ী উপনিবেশ। বলাবাহুল্য, এইসব বিচিত্র ও চমকপ্রদ তথ্যই এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে উৎসাহিত করে তোলে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঐতিহাসিক উপন্যাসে ভূমিকার যেমন রেওয়াজ নেই, তেমনি চল নেই গ্রন্থ-পঞ্জীর। তবু কথাসাহিত্যের চিরাচরিত রীতিকে বর্জন করেও পরিশিষ্টে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক তালিকা দিতে হয়েছে। তার কারণ, এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতে। তাই ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ের রেশম ব্যবসায়ী ভিখু শেখের রাশিয়া যাত্রার মাধ্যমে সেই চারশো বছর আগের ভারত ও রাশিয়ার ব্যবসায়িক আদান-প্রদান, গৌড় থেকে সমুদ্রপথে বুশায়ার (পারস্যোপসাগরের বন্দর) হয়ে ইস্পাহান, তাব্রিজ, বাকু, আস্ত্রাখান পেরিয়ে নিজনি, নভোগোরোদের আন্তর্জাতিক মেলার বিবরণ এবং তদানীন্তন কালের দু-দেশের সাধারণ ব্যবসায়ীদের চালচলন, আচার-ব্যবহারের যে চিত্র এঁকেছি তা যতদূর সম্ভব তথ্যভিত্তিক এবং ইতিহাসানুগ করার চেষ্টা করেছি বলেই গ্রন্থ-পঞ্জী অপরিহার্য মনে হয়েছে—যাতে অনুসন্ধিৎসু এবং গবেষকমনা পাঠক সেগুলি যাচাই করে দেখতে পারেন।

পরিশেষে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক,—Kemp-এর 'Bharat-Rus' গ্রন্থে আছে, কাবুলে, বাগদাদে এবং বাকুতে, আস্ত্রাখানে রুশীয় ও ভারতীয় সওদাগররা এমন একটা ভাষায় কথা বলতো, যে ভাষাটা দু-দেশের বণিকদের কাছেই ছিল সহজবোধ্য। ভাষার বিষয় বলেই ভাষাচার্য পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, 'স্মরণাতীত কাল থেকেই দু-দেশের বণিকরা পার্শী ভাষায় কথা বলতে পারতো'—তাই শুধু পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্যই জায়গায় জায়গায় পার্শী ভাষা ব্যবহার করেছি।

সুপরিচিত বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং রুশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞ পরমশ্রদ্ধাস্পদ গোপাল হালদার, ডক্টর মহাদেব সাহা আমাকে অনেক অমূল্য উপদেশ দিয়ে এই গ্রন্থরচনায় প্রভূত সাহায্য করেছেন। পার্শী উচ্চারণে এবং তিন চারটে 'বয়েত' বলে আমাকে ঋণী করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের আরবী ও পার্শী বিভাগের সহ-গ্রন্থাগারিক আব্দুল করিম। রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ হরিশচন্দ্র গুপ্তা মহাশয় রুশীয় ভাষায় লেখা দু'খানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের কিছু অংশ তর্জমা করে দিয়ে এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। গ্রন্থ দুটির নাম—(১) Russian-Indian Relations in the 17th Century: Collected Documents, Moscow, Oriental Literature Publishing House, 1958 এবং (২) Russian-Indian Relations in the 18th Century

তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে অবাস্তব কাহিনী এবং লঘু উপন্যাসে প্লাবিত সাহিত্যের বাজারে বাংলা ভাষায় এই প্রথম ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর ভিত্তিতে রচিত বিপুলায়তন এই গ্রন্থখানি প্রকাশের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ প্রাপ্য রবীন্দ্র লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের। তথ্যবহুল এই উপন্যাসের প্রকাশনা নিঃসন্দেহে তাঁর নিবিড় সাহিত্য-প্রীতি ও সৎসাহসের পরিচায়ক।

বিনীত

স্বাধীনতা দিবস গ্রন্থকার

১৩৬৭

এখনও কেউ কেউ এদিকে আসে।

আসে ব্যবসাদার মানুষ। বলে—দেখে যাই কেমন তোমাদের বিখ্যাত রোহনপুর আর ট্যাপাজানীর হাট! এখানে নাকি দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে রেশম-কাটুনীরা ভুবনবিখ্যাত 'মালদহী' সিল্ক নিয়ে আসতো? আর এই নিমাসরাই ও রুকুনপুরের দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে নাকি তুঁতগাছের চাষ হতো? তুঁতের গাছে গাছে পাতায় পাতায় রেশমকীট বা পলুর কোয়া ঝুলতো? কত রকমের পলু—বড় পলু—ছোট পলু, সোংহাই পলু, নিস্তারী পলু! কোথায় সেসব? তারা বিদ্রূপ করে যায় ফিরে যেতে যেতে এককালের বিখ্যাত রেশম-কাটুনীর আড়ং গ্রাম নিমাসরাইকে, ট্যাপাজানীকে। বলে—ছিঃ ছিঃ! কয়েকটা ভেঙে-পড়া কুঁড়েঘর নিয়ে তাঁতি-জোলাদের গ্রাম, চারিদিকে আটিশ্বরী আর বিষকাঁটারীর ঘন জঙ্গল দেখতে মিছিমিছি এতদূর এলাম!

আমি সইতে পারি নে তাদের এই বিদ্রূপ। তাই আজও আমাকে মুখর হতে হয় কাহিনী শোনাতে। আমি ডাক দিই সেই সব অচেনা আর শহুরে একালের মানুষদের—

শোন ভাই, ব্যবসায়ী সুজন—মন দিয়ে শোন! অভিশপ্ত স্তব্ধতায় ঘেরা যে মৃত্যুজীর্ণ গ্রাম নিমাসরাই তুমি দেখে এলে,—দেখে এলে কঙ্কালসার কালো কালো কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ধুঁকতে ধুঁকতে গামছা বুনছে, তারা—হ্যাঁ, তারাই হলো শত শত বছর আগের সেই পৃথিবী-বিখ্যাত রেশম-কাটুনীদের উত্তরপুরুষ! একদিন এই মহা-শ্মশানের মতো জমাট স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন গ্রাম রোহনপুর, ট্যাপাজানী, নিমাসরাই জুড়ে গোটা তল্লাট হাজার হাজার মানুষের পদশব্দে মুখরিত হয়ে থাকতো। দূর থেকে সমুদ্র গর্জনের মতো কানে আসতো

তাদের কলগুঞ্জন। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে গৌড় অথবা 'বেঙ্গলা' বন্দর সন্নিহিত গঙ্গা বেয়ে বিদেশী সওদাগররা আসতো তেহরান থেকে, আসতো বাগদাদ থেকে, আসতো যবদ্বীপ থেকে—আসতো মালয় থেকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরও দূর-দূরান্তরের দেশ থেকে। শীতের নরম আর হলদে রোদের মতো 'মালদাই' সিল্কের সুতো কেনার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত তাদের ভেতরে। শুধু কি যবদ্বীপ, বলিদ্বীপের লোক? এক-একদিন ট্যাপাজানী আর রোহনপুরের হাটে চাঞ্চল্যের সাড়া জেগে উঠতো। দেখা যেত কালো কালো মানুষদের ভীড় ঠেলে তেজী ঘোড়ার লাগাম ধরে আসছে লাল লাল মুখের কয়েকটা মানুষ! আর সঙ্গে সঙ্গে কাটুনীরা মাছির মতো ছেঁকে ধরতো তাদের। চড়া দামে কিনে নিয়ে যেত তারা মালদাই সিল্কের সুতো। তারা আসতো মরক্কো থেকে, মিশর থেকে—আসতো মধ্য-এশিয়ার দিগন্ত-বিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করে পারস্যোপসাগর পাড়ি দিয়ে হোর্মুজ প্রণালী পার হয়ে, কাস্পিয়ান-ভল্গার উপত্যকা থেকে।

যাক সেসব কথা। বিষকাঁটারী আর লটা ঝোপের ঘন জঙ্গলে ভরা এই গণ্ডগ্রাম রোহনপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে শত শত বছর আগের সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিবৃত্ত তোমার কাছে শিশুদের রূপকথার মতো মিথ্যা কল্পনার মৌতাতে তৈরি বলে মনে হবে। তার চেয়ে তুমি শোন, রেশম নয়, রেশম-কাটুনী নয়, সেকালের এক রেশম-ব্যবসায়ীর অদ্ভুত দুঃসাহসের বিচিত্র কাহিনী!

নিমাসরাই ছাড়িয়ে আমার সঙ্গে এসো। এসো গ্রামের প্রান্তে নিবিড় বাঁশবনের সামনে। বাঁশবনের হু-হু কান্নায় ভয় পেও না। ওরা বাতাস। মহানন্দার জল ছোঁয়া ঘাসবনের সবুজ ব্যথা-মাখা বাতাসই শুধু।

বাঁশবন শেষ হয়ে এলে সামনে দেখবে একটা ভাঙা মসজিদ। পুরু শ্যাওলার আস্তরণ পড়েছে তার গায়ে। খসে পড়েছে তার

সরু সরু ইঁট। কিন্তু সেই ভাঙা দরগার উঠোনটা তকতকে করে নিকানো। আর সেই পরিষ্কার প্রাঙ্গণের পুবকোণে সন্ধ্যামালতী গাছের নীচে দেখবে একটা কবরখানা! আমি না বললেও, নিজের অজান্তেই এখানে থেমে দাঁড়াবে তুমি। মনে হবে, এ তো সমাধি নয়। নসীবন বেগমের শিশমহলই বুঝি। চারশো বছরের বজ্র-বর্ষা-রৌদ্র তাকে এতটুকু জীর্ণ করে নি, বরং নিপুণ শিল্পীর মতো তার গায়ে বুলিয়ে দিয়েছে সবুজ খয়েরী শ্যাওলার তুলি, কোথাও বা আলগা করে দিয়েছে হাতে-গড়া পাতলা পাতলা ইঁট। এই সন্ধ্যামালতী ফুল-ফোটা মসজিদের উঠোনে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে বড়-জ্বালায়-জ্বলে-যাওয়া কাটুনী মেয়ে নসীবন।

নসীবনের কবরের বালির কাজ উঠে গেছে। খসে গেছে ঝিনুকের চিকন-কারি, ম্লান হয়ে গেছে মীনে-করা লাল-নীল-সবুজ রঙের পাথর। তবুও চোখে পড়বে নসীবনের কবরের শিয়রে একটা গলিত মোমবাতি। রাতেব অন্ধকারে এই বিজনবনে কে যে এসে মোম জ্বালিয়ে দিয়ে যায় -- তা কেউ জানে না।

সময় হয়েছে। নিমাসরাইতে দুপুর নামছে। এবার আমার কাহিনী শোন। সেই বিচিত্র বৃত্তান্তটি শোনার আগে একবার—একবার তাকাও মুহূর্তটির দিকে! এখন নির্জন দুপুরের উদাস বাতাস বয়ে চলেছে নিমাসরাইয়ের স্থাবর-জঙ্গমের ওপর দিয়ে! ঘূর্ণি হাওয়া উঠবে এখুনি দূরে ওই ভূতকুঁড়ির ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠে! আর সেই বাতাস সন্ধ্যামালতীর কানে কানে কত গোপন কথা বলবে। তখন নিমাসরাইয়ের বাঁশবনের বাঁশপাতারা তাদের সবুজ বাহু আকাশের নীলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আকুল হয়ে তোমাকে বলবে—শোন, শহুরে—সুজন! তুমি কি জানো—রোহনপুরের নসীবন বিবির আর নিমাসরাইয়ের ভিখু শেখের সেই বাল্যপ্রেমের করুণ মধুর কাহিনী—তুমি কি শুনেছো, নসীবন আর দেশের মাটির বন্ধন কাটিয়ে ভিখুর দূর বিদেশের উদ্দেশে দুঃসাহসী সমুদ্রযাত্রার রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত?

আমার কাহিনী শুনতে হলে পায়ে পায়ে পিছিয়ে যেতে হবে। সময়ের রাস্তা ধরে ফিরে যেতে হবে, চারশো বছর আগের ভোরের-তারার-আলো-ধোয়া মহানন্দার ঘাটে। বর্ষাকাল। ভরা যৌবন তখন মহানন্দার। মহানন্দা গরবিনী মেয়ের মতো হেলেদুলে হাস্যে-লাস্যে উদ্দাম হয়ে চলেছে দূরে জীবনপ্রবাহিনী গঙ্গার বিশাল জলরাশির দিকে। এপারে তার রোহনপুর, ওপারে নিমাসরাই।

ভোরের আঁধার ঝিকমিক করছে গাছের ডালে ডালে। নিমাসরাইয়ের গা দিয়ে লালমাটির রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে মেটে সাপের মতো চলে গিয়েছে মহানন্দার ঘাটে। সেই রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালো তিনটি ছায়া দেহ। তিনটি কিশোরী মেয়ের ছায়া। ছিপছিপে লতার মতো সঞ্চারিণী শরীর। টান করে বাঁধা খোঁপা। কারো পরনে জেলেপাটের, কারো পরনে মেঘডম্বুর শাড়ি। কিন্তু তাদের চোখে ভয়ের ছায়া। এদিকে-ওদিকে তাকায় তারা। আর টিপেটিপে পা ফেলে। নিজের পায়ের শব্দেই চমকে চমকে ওঠে! সেই শেষরাতের জনহীন রাস্তা ধরে কোন পথিকের আগমন সম্ভাবনায় ঢিপঢিপ করে তাদের বুকের ভেতরটা।

তারা মহানন্দার ঘাটে এসে নামল। কারো মুখে একটা কথা নেই। এক-এক টুকরো কালো ঘন অন্ধকারের মতো দেখা যাচ্ছে তাদের কোমরে এক-একটা বেতের টুকরি। টুকরিতে ভরা রাশি রাশি পলু। উঁচু জাতের বড় পলু। কোয়াগুলোর কোনটা সাদা রঙের, আবার কোনটা সবুজ, কোনটা হলদে রঙের। নসীবন ফিস্ ফিস্ করে বলল, চ—তাড়াতাড়ি পলুগুলো ধুয়ে নিয়ে যাই। আবার কখন—হঠাৎ থেমে গেল সে। দূরে তরল অন্ধকার ঘেরা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল প্রখর চোখে। সোফিয়া বলল, কি রে, শেখ সাহেব আসছে নাকি—

ধুর, তুইও যেমন! ফিক করে হেসে ফেলে লায়লা বলে, ও যাকে দেখার তাকে দেখছে, বুঝলি সোফিয়া! নসীবন কথা বলে না। কপট

রাগের ভঙ্গীতে বলে, নে—নে, হাসি-মস্করা আর করতে হবে না—যা করবি তাড়াতাড়ি কর—

হ্যাঁ। যা বলেছিস ভাই—শেখের পো ওই মুরু মিঞার একবার চোখে পড়লেই হয়। দেবে সব কোয়া টান মেরে ফেলে—

দশমাস ধরে বড় যত্নে পালন করা সুদৃশ্য পলুর কোয়াগুলোর দিকে তাকিয়ে ওদের চোখে ব্যথার ছায়া ফুটে ওঠে। দ্রুতহাতে টুকরির ভেতরের ডিম ফুটে বেরুনো পলুগুলো জলে ধুতে লাগল। সোফিয়া বলল, এ কাজের বড্ড হাঙ্গামা ভাই—এখন আবার এই ডিমগুলো ছায়ায় নিয়ে শুকিয়ে বেলেমাটির হাঁড়ির ভেতরে রাখো—

হুঁ, হাঁড়ির ভেতরে রাখলেই হবে! হাঁড়ির নীচে কিছু পেঁজা তুলো খুব আলগা করে ছড়িয়ে দিতে হবে না? শুধু তাই? ওদের ভেতরে একটু বয়সে বড় লায়লা গম্ভীর হয়ে বলে, মশারীর কাপড়ের ছুটো থলি জোগাড় কর—এক-একটা থলির ভেতরে তু' ছটাক ওজনের ডিম পুরে তবে হাঁড়িতে ভর—একটু থামে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এইসব নিটিপিটি খুঁটিনাটি কাজ করতে করতেই একদিন বুড়িয়ে যাব—

নসীবন আর সোফিয়া কিছু বলে না। বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তাদের মুখ। লায়লার মতো এত চটপটে কাজের মেয়েকে কেন স্বামী নেয় না, তারা ভেবে পায় না। আবার কিসের জন্য—কেন লায়লা নিকা বসতে চায় না রোহনপুরের বসিরের সঙ্গে, তাও তারা বুঝতে পারে না।

তিন সখী আর কথা বাড়ালো না। গায়ে গা দিয়ে ঘাট ছেড়ে উঠে এল মহানন্দার উঁচু পাড়ে। আর তাড়াখাওয়া হরিণের মতো বিদ্যুৎগতিতে চলতে শুরু করল গ্রামের দিকে।

সকালের আলো ছড়িয়ে পড়ল নিমাসরাইয়ের চারিদিকের সবুজ ধানের মাঠে। যতদূর তাকানো যায় বরিন্দের দিগন্তবিসারী প্রান্তর শান্ত আর নিস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্রের মতো দেখায়। সেই সবুজের

সমারোহে সকালের সূর্যের আলো দূরদিগন্তে রামধনুর ঝিলিমিলি ফুটিয়ে তুলল। হঠাৎ নসীবনের নজরে পড়ল, সেই দিগ্‌বিস্তীর্ণ সমুদ্রের ভেতরে একটা বিন্দুর মতো একটা কালো মাথা যেন ভাসছে। ভয় গুর-গুর করে উঠল তার বুকের ভেতরে! আসছে —আসছে যমদূতের মতো শেখ নুরুদ্দিন ওরফে নুরু মিঞা! সে ছুটে বাড়ির ভেতরে এসে পলুর হাঁড়িগুলো বের করে রান্নাঘরের পিছনে ভাঙ্গগাছের জঙ্গলের ভেতরে রেখে দিল। দৌড়ে ছুটে যেতে চাইল পাশেই সোফিয়া আর লায়লাদের বাড়িতে। কিন্তু যেতে পারল না। ভয় হলো। কয়েকদিন আগের একটা দুঃসহ ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল—

ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর। দূর আকাশে একটা-দুটো চিল ডানা মেলে উড়ছে। সে তার মার সঙ্গে বসে পলুর কোয়া থেকে সুতো বের করছিল। হঠাৎ একটা বাজখাঁই গলার আওয়ার্জ আছড়ে পড়ল তাঁদের দরজার গোড়ায়, এই আলম – তোর ঘরে নোংরা জিনিসের গন্ধ পাচ্ছি কেনে রে?

ছুটে বাইরে এল তার বাপজান। আর ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। সামনে মূর্তিমান অভিশাপের মতো দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ শেখ নুরুদ্দিন! পাকা গোঁফ জোড়া সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মতো দু'দিকে ঝুলে পড়েছে। কাঁচা মাটির রাস্তার মতো এবড়ো-খেবড়ো মুখ। বড় বড় দুটো চোখ যেন লাল লাল কাঁচের মার্বেল। সাদা ভ্রূ দুটো সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো করে বলল, তোর বিবি আর বেটি নিশ্চয়ই পলু পালছে কেমন— খোদার নামে কসম খেয়ে বল্—

করলে কি হয়েছে বল চাচা—বহুকাল আগেই সুবেদার সাহেব তো পরোয়ানা জারী করে বলেছে রেশমের জন্যে পলু—

চুপরও উল্লুকা বাচ্চা! রাগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো নেমে পড়ল টাট্টুর পিঠ থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে চাবুকটা নীল আকাশের দিকে উচিয়ে চিৎকার করে বলল, তুই মুসলমানের বাচ্চা

না—শয়তান, বেতমিজ কাঁহাকা! জানিস না ঘরে পলু পাললে জাত যায়! বলেই হন্ হন্ করে বড় ঘরের ভেতরে ঢুকে টান মেরে ফেলে দিল পলুর হাঁড়িগুলো। উঠোনের শক্ত লালমাটিতে ঠোক্কর খেয়ে ভেঙ্গে গেল বেলেমাটির হাঁড়ি। ছত্রাখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ডিম ফুটে ওঠা পলুগুলো—তার মার খুব যত্নে বড় করা পলু! যাওয়ার সময় গজগজ করতে করতে গেল নুরু মিঞা, হুঁ, সাচ্চা মুসলমান কখনো পয়সার লোভে জাত নষ্ট করতে পারে! একটু থেমে বলল, এই আলম—তোর বাড়িতে যেন ওসব নোংরা জিনিস না দেখি—বুঝলি—

তার বাবা ভীতু স্বভাবের মানুষ। বুড়ো নুরু মিঞা হলো বাইশ বাজারের কাজীর গোমস্তা। তাই কিছুই বলল না। তার মা কিন্তু পলুগুলো হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বহু টাকার রেশমের কোয়া একেবারে নষ্ট হয়ে গেল—

নসীবনের মনে হয়—মনে হয়, বুড়ো নুরুদ্দিন যেন বখতিয়ার খিলজীর প্রেতাত্মা। ভিখুর মুখে সে শুনেছে বাংলার প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা বখতিয়ার খিলজী নাকি সিংহাসনে বসেই পরোয়ানা জারী করে তুঁতগাছের চাষ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল! মাঠের পর মাঠ জুড়ে তুঁতগাছ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল, পলু থেকে রেশমের সুতো কাটলে ইসলামধর্মের অবমাননা হবে—দেশসুদ্ধ যেখানে যত তুঁতগাছ ছিল সব—সব বখতিয়ারের আক্রোশে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল! ঘরে ঘরে সুতো-কাটা লাটাই, তকলি, মাকু—সুতো কাটার সব সাজ-সরঞ্জামে ধুলো পড়ে গিয়েছিল। তাদের জায়গা হয়েছিল আস্তাকুঁড়ে। হয়তো আর এদেশে কখনো তুঁতগাছের চাষই হতো না—হতো না ঘরে ঘরে রেশম তৈরি। কিন্তু বছরের পর বছর রেশম বিক্রি করে যে মোটা টাকার অঙ্ক ঘরে আসতো সেই টাকাটার আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজকোষে টানাটানি পড়ল, তখন বাংলার সুবেদার খিজির খান হুকুম দিল

তুঁতের চাষ করতে—এসব ওই বুড়ো শয়তান নুরু মিঞা জানে। তা সত্ত্বেও বৃদ্ধ যখের মতো অতীতের সেই কুসংস্কারটাকে সতর্ক প্রহরায় আগলে রাখার মিথ্যে চেষ্টা করে চলেছে!

দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখল নসীবন, কোথায়—কতদূরে সেই বাইশ বাজারের কাজীর গোমস্তা—রেশমের মহাশত্রু!

না! কোথাও তো দেখা যাচ্ছে না! গেল কোথায়? হয়তো লায়লাদের বাড়িতে হামলা করছে। ধীরপায়ে বাইরে এল নসীবন। পা দুটো উঁচু করে যেই মাঠের দিকে তাকাতে যাবে, অমনি তার চোখ-দুটো বাঘের থাবার মতো দুটো হাত দিয়ে কে যেন আটকে দিল—

আঃ ছাড়ো-ছাড়ো—বুঝতে পেরেছি কে—ছাড়ো বলছি! খিল খিল করে হাসতে হাসতে তার যৌবনপুষ্ট তন্বী দেহটা এলিয়ে দিল ভিখুর চওড়া বুকে, হাসির রেশ টানতে টানতে বলল, লক্ষ্মীটি, এইবার ছেড়ে দাও—কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে—

নসীবনকে ছেড়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ালো ভিখু। দূরে ধানের মাঠের শেষে কাজল কালো দিগন্তের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, নসু, তোকে আজ একটা জায়গায় নিয়ে যাব। তার কথাটা যেন শুনতেই পেল না নসীবন। কল কল করে বলল, দূর থেকে তোমাকে দেখে আমি ভেবেছি, নুরু মিঞা আসছে—আমার সে কী ভয়!

ভিখু কোন কথা বলল না। তার বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল। হু-হু বাতাসে তার একমাথা ঝাঁকড়া চুল উড়তে লাগল। তার কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো নসীবন। বলল, তুমি কি ভাবছো গো, আমাকে বলবে না?

বুড়ো নুরু মিঞা ঠিকই করে—একটু থেমে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল ভিখু, এই যে গাঁ-সুদ্ধ তোরা দিন নেই রাত নেই পলু নিয়ে পড়ে আছিস আর কোয়া থেকে রেশমের সুতো কাটছিস—এই জীবনের কোন মানে হয় না—

নসীবন চুপ করে থাকে। কি বলতে চায় বোঝে না। তাই মনের ভেতরে অস্বস্তির কাঁটা বিঁধতে থাকে। সে মুখ্যু মেয়েমানুষ। আর ভিখু মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে। তবুও ভিখুকে তার ভাল লাগে। তার দীর্ঘ সুগঠিত স্বাস্থ্যের লীলায়িত পেশীপুঞ্জের দিকে তার অনুরাগের দৃষ্টি খেলা করে।

অমন ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে কি দেখছিস রে নসু ?

না—ভাবছি, তোমার মনের কোন থৈ পেলাম না কখনো—ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলল, মজিবর চাচা, মানে তোমার বাপজান—রেশমের এতবড় ব্যবসাদার আর তুমি—

আরে ধ্যাৎ, নিকুচি করেছে তোর রেশমেব ব্যবসা ! হঠাৎ ভেতরে ভেতরে কিসের যেন জ্বালায় ছটফট করে বলল, এখন চল্, চল্ তো আমার সঙ্গে—

বলছো কি! চোখদুটো বড় বড় করে বলল নসীবন, আমার এখন কত কাজ, নুরু মিঞার ভয়ে পলুর হাঁড়িগুলো জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছি—

তার কথা শেষ হলো না। তার আগেই একটা কাণ্ড করে বসল ভিখু। খপ করে নসীবনের ডান হাতটা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল বাইরে।

আঃ করছো কি বল তো—মা আছে পুকুরঘাটে—একটু বলে আসি—

আরে বলে কি হবে—এখুনি তো ফিরে আসবি—

ভিখুর সঙ্গে হাঁটতে পারছে না নসীবন। সে ছুটে ছুটে যাচ্ছে তার সঙ্গে। আর হাঁফাতে হাঁফাতে বলছে, কোথায় যাচ্ছো এই সাত-সকালে ?

তুই চল্ না—ভিখুর ওই এক কথা।

কী ক্ষ্যাপা লোকের পাল্লায় যে পড়েছে ! মনে মনে রাগে ফোঁসে নসীবন। কিন্তু তাকে ছেড়ে যেতে চায় না। পারে না।

পদ্মপুকুরের সামনে এসে দাঁড়ালো ভিখু। চারিদিকে উঁচু পাড় দিয়ে ঘেরা বহুকালের প্রাচীন পুকুর। নীচে আছে ঘন শ্যাওলা, তাই জলের রং কালো দেখায়। সেই কালো জলের ফাঁকে ফাঁকে পদ্মপাতার আড়ালে হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে এক-একটা রক্তবর্ণ পদ্ম।

কি ব্যাপার! এই পদ্মপুকুর আমি দেখি নি নাকি! নসীবনের কালো চোখে অনুযোগ ঘনিয়ে এল।

আয় এখানে বসি। কেমন গম্ভীর শোনালো ভিখুর গলার স্বর। নসীবন ভয়ে ভয়ে বসল ঝাপড়া একটা জামগাছের নীচে। তার নিজের ওপর কোন বশ নেই।

স্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল। উত্তুরে বাতাসে দুলে দুলে উঠছে পদ্মপুকুরের জল। বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে রাশি রাশি পদ্ম। নসীবনের বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। চারিদিকে এই অবিচ্ছিন্ন নির্জনতায়, জনমানবহীন এই পদ্মপুকুরে তাকে নিয়ে এসে কী—কী বলতে চায় ভিখু!

শোন্ নসু, তোদের এই যে গোরুর মতো চোখে ঠুলিবাঁধা জীবন আমি একটুও পছন্দ করি না—

ওমা, সে তো জানি, এই পুরানো কথাটা বলার জন্যেই নিয়ে এসেছো! একটু থেমে ভার ভার গলায় বলে, গৌড়ের বিদেশী সওদাগরগুলোই তোমার মাথা খেয়েছে। তুমি তাদের মত কালাপানি পার হয়ে—

না-না, শোন্ নসু, তোকে আমি ভালবাসি—

ওমা! তাই নাকি?

দেখ্ নসু, মস্করা করিস না বলছি, শোন্, দেখিস আমি সাংঘাতিক একটা কিছু করব—

খিলখিল করে হেসে উঠল নসীবন। বলল, পীরফকির হয়ে যাবে না কি—

দেখতেই পাবি একদিন। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে যেন

বহু—বহুদূর থেকে বলল ভিখু, এই নিমাসরাইতে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না রে নসু—

আচ্ছা, কি তুমি চাও—তোমার বাপজান এত বড় ব্যাপারী !

ফের যদি বাপজানের কথা মুখে আনবি—হঠাৎ যেন কোন তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে চিৎকার করে বলল, তাহলে দেখবি, তোর সঙ্গে আমি কথাই বলব না।

ক্রোধে কঠিন হয়ে উঠল ভিখুর মুখখানা। বিড়বিড় করে বলল, আজ ট্যাপাজানী, কাল সাদুল্ল্যাপুর, পরশু জহরতলার হাটে হাটে রেশমের কাপড়ের গাঁঠরী নিয়ে ঘোরা, মনে হয় যেন জন্তুর মতো জীবন। ঘৃণায় কুঁচকে উঠল তার খাড়া নাকের পাটাটা।

তাকে একটু খুশি করাব জন্যেই বলল নসীবন, কোন্ নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে বলেছিলে ?

যাবি তুই - চল্—

ওরা নিমাসরাই ছাড়িয়ে চলল গৌড়ের দিকে। দূরে নীল আকাশের গায়ে আঁকা মহানগরীর সুদৃশ্য শত শত প্রাসাদের চূড়া দেখা যাচ্ছে। দিগ্‌বিকীর্ণ সমুদ্রের মতো ধানের মাঠের ভেতরে দ্বীপের মতো এই গ্রাম নিমাসরাইয়ের এত কাছে ধনে-জনে সমৃদ্ধ অত বড় একটা নগর আছে বোঝাই যায় না। যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো নসীবন—তুমি গৌড়ে কোথায় যাচ্ছো - বাপজান দেখলে—

আবে চল্ না—আমার সঙ্গে যাচ্ছিস তো—তোর বাপজান খুশিই হবে—

কোন কথা বলল না নসীবন। মনে মনে ভাবল, তোমার যা মতিগতি। ওসব কানে পড়লে আর তোমার হাতে মেয়ে দেবে না। বেঁকে বসবে—

হঠাৎ ডানহাতটা ধরল ভিখু। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে তার

চোখ-মুখ। দূরে—বহুদূরে গঙ্গার রূপালী রেখার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওই কালো কালো লম্বা এক-একটা বাঁশের মতো আকাশে উঁচু হয়ে আছে, ওগুলো কি বল্ তো ?

চোখদুটো ছোট করে নসীবনও তাকালো সেদিকে। বিড় বিড় করে বলল, গঙ্গার মাঝখানে অত বড় বড় বাঁশ পুঁতল কে ?

হো-হো করে হেসে উঠল ভিখু, বলল, বাঁশ নয় রে—বাঁশ নয়—ওগুলো হলো জাহাজের মাস্তুল।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নসীবন।

চল্—আবার কি হলো ! দ্রুত উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, চল্ দেখবি, কত বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার ঘাটে। ওরা সমুদ্র পাড়ি দেয়। কত রকমের গড়ন, কত রকমের নাম ওদের—উর্ধা, স্বর্ণমুখী, গর্ভিনী, মন্থরা—

না, আমি ওখানে যাব না—যেতে পারব না, তোমার পায়ে পড়ি ! কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল নসীবন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল গ্রামের দিকে। খুন চেপে গেল ভিখুর মাথায়, চিৎকার করে বলল, ভাল হবে না বলছি—নসু— যদি ভাল চাস তো ফিরে আয়—ফিরে আয় বলছি—

জাহাজঘাটে যা-রা থা-কে—তা-রা—লো-ক ভা-ল ন-য়—সাঁ সাঁ হাওয়ায় ভেসে এল নসুর কথাগুলো।

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভিখু।

দূরে মিলিয়ে-যাওয়া নীল ডুরে শাড়ি পরা নসীবনের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে তীব্র আক্রোশে সে ফুঁসতে লাগল, তার ইচ্ছে হলো, এখুনি ছুটে যেয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসে। ভাবে, দাঁড়াও সাদীটা একবার হোক না—তখন এইরকম বেয়াদপি করলে কেটে দু'টুকরো করে ফেলব—

কি, বন্ধু বুঝি চলে গেল, মন খারাপ ? আচমকা পিছন থেকে

কে একজন বলে উঠল। বলেই জলতরঙ্গের মতো তীব্র শব্দ করে হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল সে।

মুখ ফিরিয়ে তাকালো ভিখু। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটো স্থির হয়ে গেল।

অপূর্ব সুন্দরী একটি মহিলা। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রঙ। পেঁচিয়ে পরেছে নীলাভ রঙের বাতাসজাল শাড়ি। প্রায় স্বচ্ছ শাড়ির আড়ালে আগুনের মতো জ্বলছে তার তন্বী দেহরেখা। কিন্তু সুর্মাটানা দুটো হাসি-হাসি চোখের নীচে কেমন কালির রেখা।

কে তুমি?

আবার হাসিতে এলিয়ে পড়ল সে। হাসির দমকে দমকে কেঁপে উঠতে লাগল তার যৌবনপুষ্ট তন্বী দেহ। হাসির রেশে টেনে টেনে বলল, আমাকে তুমি চিনবে না ভাই—

চেনা নেই, শোনা নেই। পাগলের মতো হাসছো যে?

সে কোন কথা বলল না। ভিখুর দেবদারুর মতো দীর্ঘ দিব্যকান্তির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল, তাকিয়ে রইল তার বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ আর একমাথা ঝাঁকড়া চুলের দিকে। তার দু'চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা থম থম করতে লাগল। কেমন আচ্ছন্নের মতো তার হাতটা ধরে বলল, আমার সঙ্গে যাবে?

কোথায়?

জাহাজঘাটে—

তুমি সেখানে থাকো?

না।

তাহলে?

চল না—অনেকেই যাচ্ছে—আজ হোসেনচাচা বাগদাদ থেকে বাণিজ্য করে ফিরছে। গোটা গৌড়-চিড়াইবাড়ি বন্দরের ঘাটে ভেঙ্গে পড়েছে—

তাই নাকি! চল—চল—

॥ দুই ॥

নিমাসরাইয়ের পাশেই জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম জালালপুর। এই গ্রামের উত্তরে শিবপুকুরের দক্ষিণপাড়ে ধ্যানস্থ মূর্তির মতো বসে আছে মজিবর। বুক অবধি লুটিয়ে পড়া কাঁচাপাকা দাড়ি। পরনে নীল লুঙ্গি। গায়ে সাদা কামিজ।

বেলা পড়ে আসছে। বিকেলের ম্লান আলো চিক চিক করছে বটগাছের পাতায় পাতায়। এই অসময়ে ট্যাপাজানী হাটের রেশমের অতবড় ব্যাপারী—এই তল্লাটের সবচাইতে ডাকসাইটে ব্যবসায়ীকে সেখানে দেখেই থমকে দাঁড়ালো আলেকচাঁদ। সে গোরু নিয়ে ঘরে ফিরছিল।

কী ব্যাপার! এখানে কত্তা কি করে, নামাজ পড়ে নাকি? কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেল না। রাশভারী স্বভাবের মানুষ। বড়লোক। কিন্তু কৌতূহলটাও তাকে হলদে পিঁপড়ের মতো কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে। তাই সে গোরু ছেড়ে চুপ করে বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে।

মজিবর ধ্যান শেষ করে উঠে দাঁড়ালো। ওদিকে আলেকচাঁদের বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। বুড়োর অনেক টাকা। নিশ্চয়ই শিবপুকুরের পাড়ে বনতুলসীর জঙ্গলের ভেতরে পুঁতে রাখতে এসেছে!

মজিবরের হাতে রঙীন কাপড়ের থলি! ওই থলি থেকে এখুনি—এখুনি বের করবে মোহর! সে যাত্রার দলে সখী সাজে। যে কেষ্ট ঠাকুর সাজে, সেই রণেশের কাছে সে শুনেছে, বুড়োর বাড়িতে নাকি ইটের মতো এক-একটা সোনার তাল আছে! কিন্তু—

আলেকচাঁদকে অবাক করে দিয়ে মজিবর থলির ভেতর থেকে

বের করল একটা মাটির প্রদীপ। হতাশ হয়ে গেল আলেকচাঁদ। বসে পড়ল বটগাছের গুঁড়ির ওপরে। বুড়ো এই বনতুলসীর জঙ্গলে এখানে কোথায় 'চেরাগ' জ্বালবে ? দেখা যাক—

মজিবর ধীরপায়ে এগিয়ে গেল কয়েক ধাপ আগে। সেখানে আছে ঝাপড়া একটা বকুল গাছ। স্বর্ণলতায় ছেয়ে থাকা তার চারিদিকে বোনারচা আর রয়না গাছের ভীড়ে জায়গাটা দিনের বেলাতেই অন্ধকার মনে হচ্ছে। সেই নীলাভ অন্ধকারে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ঘন সবুজ ঘাসে ছেয়ে থাকা একটা উঁচু ঢিবি! কার একটা কবর—বহুযুগ আগের কবর মনে হয়।

খুব যত্ন করে সলতে সাজিয়ে প্রদীপে রেড়ির তেল ঢালল মজিবর। তারপর চকমকি পাথর ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালল। জ্বলন্ত প্রদীপ ধরিয়ে আস্তে আস্তে সেই সমাধির গায়ে হাত বুলোতে লাগল। যেন নিবিড় মমতায় ফুলের গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছে! আর তখুনি —ঠিক তখুনি তার মনেব ভেতরে বকুল ফুলের মতো টুপটাপ ঝরে পড়তে লাগল বহুকাল আগের বেদনাদীর্ণ আর করুণ এক ইতিবৃত্ত—

স্বাধীন বাংলার ওপর মত্তহস্তীর মতো আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বখতিয়ার খিলজী। সিংহাসনে বসেই তার নজরে পড়েছিল দেশজুড়ে শুদ্ধ পট্টবস্ত্রের বিপুল মহিমা। রেশমের সুতো দিয়ে তৈরি নবোদিত সূর্যের রঙের মতো পট্টবস্ত্র পরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা, পবে ধর্মপ্রাণ অন্তঃপুরবাসিনীরা—অতএব সুলতানের রোষ পড়ল রেশমের ওপরে। যখন দেশজুড়ে তুঁতের চাষ বন্ধ হয়ে গেল, যখন কাটুনীরা হতাশ হয়ে চাষবাসে মন দিল, তখন এই জালালপুরের একটি বাড়িতে গোপনে রেশমের সুতো কাটা হতো! কিন্তু লুপ্তপ্রায় রেশম-শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এক ধর্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান মুসলমান, ফকরুদ্দিন। সে বলতো, কোরানের কোথাও নেই,—পলুপালন করলে ইসলামধর্মের অবমাননা হবে!

কিন্তু বখতিয়ার খিলজীর অনুচররা একদিন জেনে ফেলেছিল, ফকরুদ্দিনের গোপনে রেশমের সুতো কাটার কথা। তাকে গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তার করুণ আর্ত চিৎকারে শিউরে উঠেছিল গ্রামের বাতাস। আড়ষ্ট ব্যথায় একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জালালপুরের মানুষ।

তারপরে কেটে গিয়েছিল বহু যুগ। গঙ্গার এপারে যেখানে মাঠের পর মাঠ জুড়ে হাওয়ায় মাথা দোলাতো তুঁতগাছ, সেখানে চাষ হতো রবিশস্যের। এ অঞ্চলের লোক ভুলেই গিয়েছিল রেশমের কথা। কিন্তু—

ফকরুদ্দিনের বংশধররা রেশমকে ভুলতে পারে নি—ভুলতে পারে নি তাদের অতীত পুরুষের লাঞ্ছনা। এই বংশে জন্ম নিল একটি মেয়ে—সীতাবাসিনী। সীতাবাসিনীও ছোটবেলা থেকে শুনতো, তার পূর্ব-পুরুষকে পুড়িয়ে মারার কথা। শুনতো আর মনের নিভৃতে গোপন একটা বাসনাকে পরম যত্নে লালন করতো।

দেখতে দেখতে সীতাবাসিনীর দেহ ছাপিয়ে যৌবন এল। কিন্তু ভার ভার বিষণ্ণ মুখ তার। কিসের যেন যন্ত্রণা কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। তার বাপজান বতুল বলে, তোর কি হয়েছে মা?

কিছু না।

সীতাবাসিনী মাথা নীচু করে থাকে। বলতে পারে না, রাতে ঘুমোতে পারে না। চোখ বুজলেই দেখতে পায় গাছের ডালে ঝুলছে একটা মানুষ! নীচে লকলক করছে আগুন! সহস্র জিহ্বা মেলে তাকে গ্রাস করছে সেই জ্বলন্ত আগুন!

একদিন কোথাও পাওয়া গেল না সীতাবাসিনীকে। ভরা বয়সের মেয়ে। গেল কোথায়! খোঁজ—খোঁজ পড়ে গেল দিকে দিকে। পুকুরে জাল ফেলা হলো। নিমাসরাই, রোহনপুর, রতুয়া আশপাশের সমস্ত গ্রাম তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হলো। পাওয়া গেল না তাকে।

দিন তিনেক পরে একদিন গঙ্গার খেয়াঘাটের মাঝি বলল, সে সীতাবাসিনীর মতো একজনকে পার করেছে—

সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা ওপারে মুর্শিদাবাদে লোক পাঠালো। সে-ও না পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু একদিন বর্ষার রাত্রে হঠাৎ দারুণ দুর্যোগ মাথায় করে এল এক ছায়ামূর্তি!

খট্-খট্-খট্—কড়া বেজে উঠল বদ্বুল চৌধুরীর বাড়ির দরজায়! এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে আবার কে এল?

কড়-কড়—কড়াৎ! দূরে কোথায় বাজ পড়ল। আকাশের বুক চিড়ে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ! সেই উগ্র সাদা আলোয় আগন্তুকেব দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল বদ্বুল। বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দকেও ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল, কে তুমি?

বৃষ্টিতে একেবারে স্নান করে এসেছে সে। ভিজে শাড়ির আঁচল ঝুলছে মরা সাপের মতো। কিন্তু তার ভেজা ভেজা মুখখানা একেবারে পোড়া। দেখতে বীভৎস। হাত-পায়েরও জায়গায় জায়গায় ঝলসে গেছে। কান্নায় ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বলল, আমাকে চিনতে পারলে না বাজান—আমি সীতা—

অ্যাঁ! আর্তনাদ করে উঠল বদ্বুল। গোলমাল শুনে বাড়ির আর সব লোক উঠে এল। সীতাবাসিনী বলল, বাজান, আমাকে সুলতানের সেপাইরা বন্দী করে রেখেছিল। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতেও চেষ্টা করেছিল—

কেন? তুই না বলে-কয়ে বাড়ি থেকেই বা চলে গেলি কেন?

সীতাবাসিনী মাথা নীচু করে রইল। দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড করে বলল, কেন গিয়েছিলাম—কোথায় গিয়েছিলাম—

চুপ করে আছিস কেন?

এইবার কেমন আচ্ছন্নের মত উঠে দাঁড়ালো সীতাবাসিনী। চোখদুটোর কোনায় কোনায় হঠাৎ ঝিকিয়ে উঠল আগুন। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, কেন গিয়েছিলাম জান? বলেই জামার

নীচে বুকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করল একটা কাগজের মোড়ক।

কিসের মোড়ক - কি আছে ভেতরে ? মোড়ক খুলতেই চমকে উঠল প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি। যেন বাজ পড়েছে। কারো মুখে কথা নেই।

এ, তুই কি করেছিস মা! ফিস্ ফিস্ করে বলল বহুল। ভয়ে ভয়ে দরজার বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকালো। মেয়েকে অনুসরণ করে কোন সেপাই কি পাইক-বরকন্দাজ আসে নি তো!

এগুলো বাইরে ফেলে দে মা—ধনে-প্রাণে মারা যাব আমরা—

না, বাপজান—অনেক কষ্ট করে এনেছি—তুঁতগাছের এই বীজ গঙ্গার ওপারে মুর্শিদাবাদ থেকে। একটু থামল। আবার ভার-ভার গলায় বলল, জীবন তুচ্ছ করে এনেছি। বলতে বলতে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সীতাবাসিনী। মেয়ের অনুরোধে বাধ্য হয়ে বহুল তার রান্নাঘরের পিছনে তুঁতগাছের বীজ পুঁতল।

কিন্তু গ্রামে কোন কথা চাপা থাকে না। মাস দুয়েক পরে একদিন বহুল দেখল, সুবেদারের সেপাইরা ঘেরাও করে ফেলেছে বাড়ি। তারা বহু খোঁজাখুঁজি করেও তুঁতগাছ দেখতে পেল না। যাওয়ার আগে পুড়িয়ে দিয়ে গেল বাড়ি আর সীতাবাসিনীকে ধরে নিয়ে যেয়ে গারদে পুরল। শোনা যায়, সীতাবাসিনী কয়েদখানাতেই মারা যায়। জীবন দিয়ে বিলুপ্ত শিল্পে প্রাণ সঞ্জীবিত করে দিয়ে গিয়েছিল সে। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মজিবর।

সে তার বাপজানের মুখে কতবার শুনেছে সীতাবাসিনীর কথা। আরও শুনেছে তাদের দেহের শিরায় শিরায় নাকি বয়ে চলেছে রেশম-শিল্পের ভগীরথ—সেই মহীয়সী নারীর রক্ত! শোনা যায়, বমজানের চাঁদ যখন দেখা গিয়েছিল তখুনি নাকি সীতাবাসিনী গৌড়ের কারাগারে দেহ রেখেছিল। তাই—

প্রতি বছর এই পুণ্য দিনে সে এই নির্জন কবরভূমিতে আসে। বোনারচা আর রয়নাগাছের নীলাভ ছায়ায় পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে

থাকা সীতাবাসিনীর শিয়রে 'চেরাগ' জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। জ্বলন্ত প্রদীপের শিখার দিকে তাকিয়ে তার চোখদুটো জলে ভরে আসে। মনে মনে বলে, পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে যার জয়যাত্রা সেই রেশমকে তুমি ভালবেসে প্রাণ দিয়েছ। রেশমের প্রতি সেই রকম নিষ্ঠা যেন আমারও থাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

সখী হে কি দেখতে এলাম
আর কি দেখে গেলাম—

আলেকচাঁদ অধৈর্য হয়ে হঠাৎ গুন্ গুন্ করে গান জুড়ে দিয়েছে। চমকে উঠল মজিবর। কবরের চারিদিকের ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটে বাইরে এসে দেখল, গোরু-তাড়ানো লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচছে আর গাইছে আলেকচাঁদ। তার পরনে যাত্রাদলের সখীর মতো ঘাঘরা দিয়ে কাপড় পরা।

এই আলেকচাঁদ, এখানে পাকামী করে যাত্রার আসরের ছুকরীর মতো নাচা হচ্ছে—দাঁড়া—তোর মজা দেখাচ্ছি! হুঙ্কার দিয়ে উঠল মজিবর। আলেকচাঁদ লাঠি ফেলে দিয়ে দৌড় দিল। মজিবরও ছুটতে যাবে, ঠিক এমন সময়—

বাবুসাহেব! তার বাড়ির গোমস্তা ফালু এসে দাঁড়ালো। বলল, শীগগীর বাড়িতে চলুন—

কেন রে, কি হয়েছে? মা-র কি বাড়াবাড়ি হয়েছে?

না বাবুসাহেব—

তাহলে তুই তো জানিস, আমি কোথায় গিয়েছি, এখানে বিরক্ত করতে এসেছিস কেন?

ফালু মাথা নীচু করল। অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে বলল, লালমুখো দু-তিনজন সাহেব এসেছে বাবুসাহেব, রেশমের পেটী কিনতে। তাদের সঙ্গে তো কথাবার্তা—

তাই নাকি! চল্-চল্—

দ্রুতপায়ে যেতে যেতে মজিবর বলল, দাদাবাবু কোথায় রে?

সে তো বাড়িতে নেই বাবুসাহেব, একটু থেমে বলল ফালু, চিড়াইবাড়ির বন্দরের ঘাটে আজ নাকি হোসেনচাচা আসছে বাগদাদ থেকে। হয়তো—

বুঝেছি—বুঝেছি, চুপ কর। খেঁকিয়ে উঠল মজিবর। ভেতরে ভেতরে ছেলের ওপরের রাগটা গিয়ে পড়ল বেচারী ফালুর ওপর। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, সব সময় বাইরে বাইরে ঘোরে ও—উড়ু-উড়ু মন ওর—তোরা ওকে কিছুই বলিস না—তুই আর তোর মা লাই দিয়ে দিয়ে—না, তোরা আমাকে পাগল—

কি হে রেশমের ব্যাপারী, বাড়ির সামনে আসতেই হাকিম-সাহেবের উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল, আরে এসো-এসো, দেখ তোমার কাছে কাদের নিয়ে এসেছি—

রোহনপুরের ডাক্তার ওরফে হাকিমসাহেবের সঙ্গে এসেছে দুজন সাহেব। সাহেবসুবো এলে হাকিমসাহেবই দোভাষীর কাজ করে। তেহরান, বসোরা, মধ্য-এশিয়ার আরও বহু দেশে নাকি অনেককাল বসবাস করেছে। অনেকগুলো ভাষা জানে। কোন্ দূর দেশ থেকে ভাসতে ভাসতে একদিন এখানে এসে পড়েছিল। তার মনের ভেতরে যেন এক যাযাবর বাস করে। হঠাৎ তার সন্দেহ হলো, তার একমাত্র সন্তান—একমাত্র পুত্র ভিখু হয়তো পৃথিবীর দূর বন্দরে বন্দরে ঘোরা জাহাজ ঘাটের ওই লোকজন—আরবীয়, পারসিক, মূর সওদাগরগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করেই দিনের পর দিন কেমন উদাসীন আর ছন্নছড়া হয়ে উঠেছে। না! ওর সাদী দিতে হবে। বন্ধ করতে হবে চালচুলোহীন এই বিচিত্র লোকটার সঙ্গে ওর ওঠা-বসা—বন্ধ করে দিতে হবে ওর জাহাজ-ঘাটে যাওয়া। অসহ্য অস্থিরতায় তার হাতদুটো নিসপিস করে ওঠে—

কি ব্যাপার! গুদামে মাল নেই? বিক্রি করতে ইচ্ছে নেই পর্তুগীজসাহেবদের কাছে? আচমকা হাকিমসাহেবের কথায় যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল মজিবর! আচ্ছন্নের মতো টলতে টলতে গিয়ে গুদামঘরের চাবি খুলল।

॥ তিন ॥

মহানগরী গৌড়ের উপকণ্ঠে চিড়াইবাড়ি বন্দরের জাহাজঘাট।

সেই জাহাজঘাটের উদ্দেশ্যে রাজধানীর বিভিন্ন মহল্লা থেকে হাজার হাজার লোক চলেছে। লোক যাচ্ছে মোগলটুলী থেকে, যাচ্ছে পাঠানটুলী থেকে, যাচ্ছে বাঙ্গালীটুলী থেকে, যাচ্ছে বাইশবাজার থেকে। সকলের মুখে এক কথা—বাগদাদ থেকে আসছে হোসেন-চাচা—

শুধু গৌড়ের স্থানীয় সওদাগর হোসেন চৌধুরীই নয়, বিদেশ থেকে কোন সওদাগরী জাহাজ এলেই জাহাজঘাটে খুব ভীড় হয়। হুড়োহুড়ি পড়ে যায় পাইকারদের ভেতরে। জাহাজঘাটে বিদেশের বিচিত্র পণ্যসম্ভার কেনার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কৌতূহলী জনতার সমাবেশ হয় শুধু দূরদেশের সেই পণ্য একবার দু'চোখ ভরে দেখার জন্যে।

এই যে এস-এস! জনতার কলগুঞ্জনের ভেতর থেকে সরব অভ্যর্থনা শোনা গেল। জাহাজঘাটের অদূরে পারস্যের গালিচায় আবৃত আরাম-কেদারায় আধশোয়া হয়ে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে বন্দরের ইজারাদার এবং জাহাজ তৈরি কারখানার মালিক রামনারায়ণ গোস্বামী ওরফে রামু গোঁসাই। চোখদুটো নাচিয়ে টেনে টেনে বলল, কী হে ভিখু, তুমি তো আর আসই না এদিকে—

ভিখু কোন কথা বলল না। গলায় তিন থাক তুলসী কাঠের মালা। কপালে চন্দনের লবঙ্গতিলক। নাকে রসকলি। পরনে মাল-দহী রেশমের কৃষ্ণকেলী বসন। এই লোকটাকে তার ভাল লাগে না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, জাহাজঘাটে তার আনাগোনা এবং সমুদ্রগামী অর্ণবযানে ভাড়া খাটানোর জন্য মজুদ ওই 'সারেঙ' ননী, 'খারওয়া'

দাস্যু, 'তুণ্ডীল' গোবিন্দ, 'সুখানজিয়ার' গনি মিঞাদের সঙ্গে তার মাখামাখি একেবারেই পছন্দ করে না রামু গোঁসাই। কিন্তু ভণ্ড লোকটার মুখে মধু ঝরে। তাই মনের বিরক্তি চেপে গম্ভীর হয়ে বলল, আমার বন্ধুবান্ধব ওই ননী-গনিরা কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই—

এসব কথা ঠিক নয়, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই আমার কাছে আসতে তোমার ভাল লাগে না। খুক্ খুক্ করে হাসল রামু গোঁসাই। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বুড়ো মানুষ কেমন জান—পচা বাঁশের সাঁকো —কেউ সেখানে পা দেয় না—হরি-হরি বল—

হোসেনচাচা কতক্ষণ নাগাদ এসে পৌঁছবে? প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলল ভিখু।

খবর এসেছে জাহাজ বেতোড়ে পৌঁছে গেছে—এখন হুগলী নদীতে যদি জোয়ার থাকে তাহলে—

নমস্কার বাবু, এল গোবিন্দ তুণ্ডীল, ভীড় সমানে বাড়ছে। সব লোক জেটীর ওপার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে—

না-না, জেটীর ক্ষতি হয়ে যাবে—করছো কি গোবিন্দ—তুমি হলে গিয়ে খালাসীদের সর্দার, তুমি তোমার লোকজনদের নিয়ে জেটী সামলাও। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো রামু গোঁসাই। ছোট ছোট চোখদুটো সরু—আরও সরু করে ছড়িয়ে দিল দূরে গঙ্গার বুকে। সেখানে বিশাল গৈরিক জলরাশির শেষপ্রান্তে জ্বলজ্বল করছে রোদের চুমকি। দূরে কাজলকালো দিগন্তের ছায়া বুকে নিয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তরতর করে স্রোত বয়ে চলেছে। আর দুলে দুলে উঠছে লোলা, সত্বরা, দীর্ঘা, উন্নতা, সমুদ্রগামী আরও সব জাহাজগুলো। জাহাজ তৈরির সরঞ্জাম ক্ষত্রিয়-জাতীয় অর্থাৎ শাল, পিয়ালের টুকরো টুকরো কাঠ, তামার পাত ছড়িয়ে থাকা গঙ্গার বিস্তীর্ণ বালুচরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামু গোঁসাইয়ের দু'চোখে গর্বের দৃষ্টি ফুটে উঠল। চিড়াইবাড়ির এই জাহাজ তৈরির বিশাল কারখানাটার একচ্ছত্র মালিক সে। এখন

তার কাছে আসে সওদাগররা সপ্তগ্রাম থেকে, চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ কিনতে। সারাটা গৌড়বঙ্গে তাকে একডাকে চেনে।

একটা জাহাজ তৈরি করতে কি রকম খরচ পড়ে—

রামু গোঁসাইয়ের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়। যে সুখকর চিন্তার ভেতরে সে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করছিল, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো বলে বিরক্ত হলো। বলল, তুমি হলে গিয়ে রেশম কাপড়ের ব্যাপারী, মজিবরের ছেলে- তুমি এসব—

কেন, আমরা রেশম বিক্রি করি বলে কি জাহাজের কোন খবর রাখার অধিকার নেই? ভিখুর কথাগুলোর ভেতরে অভিমান ফুটে ওঠে।

হরি-হরি বল—এই কথার কি এই মানে হলো? খুক্ খুক্ করে হাসল, নৌ-বিদ্যায় সর্বজনের অধিকার বুঝলে ভিখু, দেখছো না, আমার কারখানায় নেই এমন জাত নেই, তবে—আধবোজা চোখদুটো একেবারেই বুজিয়ে ফেলল। রামু গোঁসাইয়েব চোখের জায়গাটায় শুধু দুটো কালো রেখা দেখা যেতে লাগল।

তবে কি?

বড় পাজী নেশা—সমুদ্রের নেশা, জাহাজের নেশার মতো পাজী নেশা আর নেই ভিখু। রামুর চোখে ব্যথার ছায়া ফুটে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে, কত সংসার যে উচ্ছন্নে যায়—কত—

আমি ওসব কথা শুনতে চাই না, আমাকে বলতেই হবে একটা জাহাজ তৈরি করতে কত খরচ পড়বে—

কেন, তুমি কি ট্যাপাজানী সাতুল্লাপুরের হাটে হাটে ঘুরে রেশমের কাপড় বিক্রি ছেড়ে কালাপানি পাড়ি দেবে নাকি? রামুর চোখে তাচ্ছিল্যের হাসি ঝিকমিক করে। ভিখুর ভেতরটা পুড়ে যায়।

শোন ভিখু- নৌ-বিদ্যা অতি প্রাচীনকালের বিদ্যা। একটু থামে রামু। গড়গড়ায় টান দেয়। ধোঁয়া ছেড়ে নিজের মুখখানাকে

আড়াল করে বলে, ভোজের মতে "ক্ষত্রিয় জাতীয় সুদৃঢ় অথচ খুব হাল্কা কাঠের তরণীতে সুখ-সম্পদ স্থায়ী হয়।" সমুদ্রের প্রতিটি জাহাজই এই কাঠের তৈরি, জান ?

কোথায় পাওয়া যায় এই কাঠ- কি রকম দাম ? ভিখু অধৈর্য হয়ে ওঠে। রামু কথা বলে না। মিটিমিটি হাসে আর বিড় বিড় করে কি বকে।

উত্তর দিচ্ছেন না কেন ? কি বিড় বিড় করে বকছেন ?

নাম জপ করছি বাবা ভিখু-নাম জপ করছি- ষোল নাম-বত্রিশ অক্ষর ! বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আর কি বল, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।

লোকটার মনের কোন খেই ধরতে পারে না ভিখু। আবার তাকে কি একটা বলতে যাবে, এমন সময়ে ঢোল-করতাল সহযোগে একটা গানের সুর ভেসে এল,

গৌড় কিনারা হ্যায় ভাগীবথী নদী
জাহাজসে ছানিয়া হ্যায় ধনপতি,
সব ঘাট বন্ধ কিয়া জাহাজ বোহোরাসে
নাহি আদ্‌মি পারে পানি ভরনে—

গানের সুরটা ভেসে আসছে গুদামঘরের মতো উঁচু আর বিশাল লম্বা ঘবটা থেকে। ওখানে শত শত সূত্রধর নিপুণহাতে সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি করছে। গুটি-গুটি ভিখু সেদিকে হাঁটতে লাগল। দূরে জেটীর দিকে তখন মানুষের বিশাল সমুদ্র। বোধ হয় গৌড় মহা-নগরীর কোন একজন লোকও বাড়িতে নেই।

যত বেলা বাড়ছে লোকও বাড়ছে তত। জনতার ভেতরে শুধু এক কথা—বেতোড় থেকে যদি রওনা হয়ে থাকে তাহলে এত দেরী লাগছে কেন ?

আরে ভিখু শেখ যে, এস এস। এদিকে কতদিন যে আস

নি বল তো! জাহাজের প্রধান কারিগর কুশাই হাঁতুড়ি বাটালী রেখে দিয়ে বলল, অত দূরে কেন—আমার কাছে চলে এস—

প্রধান কারিগর কুশাইয়ের কাছে যাওয়াটা কিন্তু সোজা নয়। সেই বিশাল ঘরের মেঝেতে মিস্ত্রিরা সারি সারি বসে কেউ কাঠ চাঁছছে, কেউ তক্তার গায়ে তামার পাত জুড়ছে—আবার কোথাও বা মস্ত বড় একটা শাল গাছের গুঁড়িকে বাঁশের উঁচু মাচার ওপর রাখা হয়েছে। আর ওপরে দু'জন ও নীচে দু'জন ক্রমাগত টেনে টেনে বড় করাত দিয়ে কাঠ ফাঁড়ছে। মুহূর্তের জন্য সেই বিপুল কর্মযজ্ঞের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভিখু কেমন উন্মনা হয়ে গেল। এই যে আমকাঠটা চেরা হচ্ছে—সেই কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি জাহাজ কত অজানা দূর সমুদ্র পাড়ি দেবে!

আরে এস-এস, আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? ব্যস্ত হয়ে ওঠে কুশাই। বলে, এখুনি গোঁসাই এসে গেলে আর একটি কথাও বলতে পারব না—তাকে তো চেন—

কুশাই তার সহকারীকে তামাক সাজতে বলল।

বল, তুমি আমার কি করলে ওস্তাদ? বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল ভিখু। হুঁকোয় টান দিতে দিতে বলল কুশাই, কিসের কি?

ওই যে জাহাজ—

হো-হো-হো—হেসে হেসে লুটিয়ে পড়তে লাগল কুশাই। মুহূর্তে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়ালো ভিখু। দু'গালের দুটো চোয়াল খিলের মতো এঁটে বসল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, জাহাজের কথা বললে তোমরা—তোমরা এই জাহাজ কারখানার সবাই এরকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কেন কর বলতে পার?

কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেল কুশাই। হুঁকো নামিয়ে রাখল। শুকনো মুখে বলল, তুমি আমার ছোটভাইয়েব মতো ভিখু—নৌ-বিদ্যা আমরা—

আমরা কি?

অতি প্রাচীন আর অতি পবিত্র বিদ্যা—খুব সহজে আমরা বলি না—

কোন কথা বলল না ভিখু। শুধু মুখখানা থমথম করতে লাগল। সে রেশম বিক্রেতার ছেলে বলে তার অধিকার নেই একটা জাহাজের মালিক হওয়ায়! আশ্চর্য!

তুমি মিথ্যে মন খারাপ করছ ভাই, হুঁকোটা ভিখুর হাতে দিয়ে বলল কুশাই, তুমি জাহাজ তৈরির টুকিটাকি জেনে কি করবে আমাকে বলতে পার? একটু থেমে বলল, এ বিদ্যা অপাত্রে দান করতে আমার ওস্তাদেরও নিষেধ আছে।

বলব, আমি তোমাকে সব বলব। তুমি একদিন জানতে পারবে, অপাত্রে তুমি নৌ-বিদ্যার কথা বল নি। ভিখুর দেহের সব রক্ত যেন তার মুখে এসে জমা হলো। তীব্র উত্তেজনায় তার বড় বড় চোখছুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

শোন, 'যুক্তিকল্পতরু'র মতে জাহাজ তৈরির জন্য তিনরকম কাঠ প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর শূদ্র। বুঝলে—নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে যেন তন্ময় হয়ে বলতে শুরু করল কুশাই, ব্রাহ্মণ কাঠ হলো লঘু কোমল, আর সুঘট—

আরে বাপু, সে তো অনেক-অনেকবার বলেছ, কিন্তু কাঠগুলো পাব কোথায়?

ও, তাই বল! বলেই কুশাই শ্লোক আওড়ালো—

শাল পিয়াল কাটে খরি তেতলি
কাটিল নিজের গাছ গাম্ভরি পারলি।
আম্র কাঠাল কাটয়ে বকুল
চম্পা খিরনি কাটি করিল নির্মূল॥

বুঝলে কিছু? শাল পিয়াল আম কাঠাল বকুল এমন গাছ নেই যার তক্তা লাগে না জাহাজ তৈরি করতে!

বেশ, সাঁওতাল-পরগনা কি তুমকার কোন বন না হয় ইজারা নেওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। কাঠ কাটালাম—তারপর ?

তারপর ফাঁড়াই করার কাজ চলবে। প্রায় এক লক্ষ তক্তা লাগবে একটি বাণিজ্য-তরীর জন্যে। একটু থেমে বলল কুশাই, তুমি তো মনসামঙ্গল পড় নি, চাঁদসদাগর চোদ্দটি জাহাজের জন্য তিন লক্ষ থেকে চারলক্ষ তক্তা ফাঁড়াই করিয়েছিল।

কাঠ ফাঁড়াই করে তক্তা করলেই হয়ে গেল ?

না-না, আসল কাজই তো হলো তক্তাগুলোকে লোহার পাত দিয়ে, নয় তামার পাত জোড়া দেওয়া। একটু থামল কুশাই। আবার বলল, লোহার পাত জোড়া দিলে সমুদ্রের নীচে চুম্বকের পাহাড়ে ধাক্কা লাগতে পারে।

—হরি বল বল হরি, পরমানন্দ মাধব হে—রামু গোঁসাইয়ের গলার স্বর শুনতে পাওয়া মাত্র কুশাই ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে তক্তায় পেরেক মারতে লাগল। যেন ভিখুকে চেনেই না।

রামনারায়ণ গোঁসাইয়ের হঠাৎ নজরে পড়ল ভিখু চুপচাপ বসে আছে কুশাইয়ের সামনে। এবার গলার স্বরটাকে একটু কড়া করে বলল, শেখসাহেব, এখন কাজের সময় ওদের বিরক্ত করো না—যাও —যাও—

অপমানে লাল হয়ে উঠল ভিখু শেখের মুখ। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে। মনে মনে নিজেকে সহস্রবার শাসালো - না, আর যেন গোঁসাইয়ের জাহাজ তৈরি কারখানার এ-মুখো হওয়ার ইচ্ছে না হয়—

অদ্ভুত মানুষ ! ফোটা-তিলক জপ-তপ নিয়ে বেশ ধার্মিকের মতো জীবন কাটায়। বৌ নেই, ছেলেপুলে বলতে কেউ নেই—কেউ নেই বংশে বাতি দিতে। কিন্তু অগাধ টাকা ! কে জানে—কে পাবে ওর টাকা ! গৌড়ের লোক আড়ালে-আবডালে বলে, টাকার কুমীর। আরও অনেক কথা বলে। সেসব দোষ আবার কার নেই ! কিন্তু

ওর লাখ লাখ টাকা থাক—কি ছত্রিশটা রক্ষিতা থাক, যা-ই থাক—তার কি হবে! ভিখুর চোখে হতাশার অন্ধকার নামে।

দুপুরের রোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে গঙ্গার বুকে। ভীড় আরও বেড়েছে। কেউ বলছে, বেতোড় থেকে রাজমহলের দিকে আসতে হোসেনচাচার জাহাজ হয়তো কোন চড়ায় আটকে গেছে। আবার কেউ বা বলছে—বলছে খুব অশুভ কথা। বেতোড়ের কাছে গঙ্গা গভীর। সেখানেই কোন ঝড়ের মুখে পড়েছে কিনা কে জানে? চিড়াইবাড়ির ঘাটে অপেক্ষমান জনতার গুঞ্জনে একটু একটু করে যেন বিরক্তির সুর ফুটে ওঠে।

কি হে ভিখু—তোমার জাহাজ তৈরির টুকিটাকি জানা হলো? হঠাৎ পিছন থেকে তার পিঠে হাত দিয়ে বলল ফয়েজ মিঞা।

সে সওদাগরী জাহাজে গনি মিঞার মতো সুখানজিয়ারের কাজ করে।

না রে ভাই, খুব শক্ত ঠাঁই—ব্যাটা বুড়ো পয়লা নম্বরের ঘুঘু। বিরক্ত হয়ে বলে ভিখু, জাহাজ তৈরির সুলুক সন্ধান কিছুতেই জানতে দেবে না—

তোকে ভয় করে—তোর বাবার অনেক টাকা আছে— যদি হুম করে রেশমের ব্যবসা ছেড়ে জাহাজ তৈরির কারখানা ফেঁদে বসিস! বলেই একটু গম্ভীর হয়ে বলল ফয়েজ, বড়লোকরা খুব ভীতু হয়—তাই না রে!

মানে?

যেমন দেখ বছির মণ্ডল— প্রতিদিন পাঁচ ওক্তো করে নামাজ পড়ছে—আল্লার ভয়ে একেবারে জুজু! ভয় পায় পাড়ার ছেলেদের। —কারণ কি জানিস?

কেন রে, তোর কি বসির মিঞার সঙ্গে কিছু হয়েছে?

কি হতে বাকী আছে বল্? ব্যাটা মেয়েকে প্রত্যেক বছরের জন্মদিনে একটা করে মোহর দিয়েই আবার কেড়ে নেয়। আর রাত

যখন গভীর হয় তখন এক-দুই-তিন করে মোহরগুলো গুনে গুনে মেয়ের বয়স আন্দাজ করে। একটু থামে ফয়েজ, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো অদৃশ্য বসির মণ্ডলের দিকে তাকায়। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলে, —বছরের পর বছর মোহরের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি মেয়ের বয়সও যে বাড়ছে, সেদিকে খেয়াল করে না বুড়ো একবারও। ব্যাটা খালি মেয়ের দাম চড়াচ্ছে—

তুই লায়লাকে তুলে নিয়ে চলে আয় না—

হুঁ! ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করে বলল ফয়েজ, তুমি লায়লাকে চেন না। বাপজান বলতে একেবারে গলে পড়ে মেয়ে—সে আসবে আমার সঙ্গে পালিয়ে—একটু থামল ফয়েজ। চোখদুটো বিষণ্ণ হয়ে উঠল। ভার-ভার গলায় বলল, আমি জাহাজে কাজ করি কিনা—কালাপানি পার হয়ে কখনো পেগু, কখনও সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রায় চলে যাই, তাই লায়লা—থেমে গেল ফয়েজ। তার গলায় জমে-ওঠা ব্যথার উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারল না।

ভিখু আর কোন কথা বলল না। চকিতে তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল একখানা মুখের ছবি। সেই মুখখানাও লায়লার মতই বিষণ্ণ আর অভিমানের কালো মেঘে আচ্ছন্ন। সেই মুখের পাশেই এসে দাঁড়ালো আর একটা গম্ভীর আর কঠোর মুখ। তার মনে হলো, তার বাবা শেখ মজিবরের সদা সতর্ক দৃষ্টি আর কঠিন শাসন তাকে যেন একটা মোটা রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বেঁধে রেখেছে একটা শ্বাসরোধী অন্ধকার কারাগারে। তার ইচ্ছে হলো—ইচ্ছে হলো, এক্ষুণি - এই মুহূর্তে ওই দীর্ঘা, না হলে স্বর্ণমুখীকে কি গর্ভিনীকে নিয়ে যদি দুস্তর সমুদ্রের বুকে উধাও হয়ে যেতে পারতো—

কি হে ওস্তাদ, দু'বন্ধুতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুম হয়ে কি ভাবছ?

ভিখুর পিঠে জোর একটা চাপড় মারল সারেঙ ননী।

এ কী! তুমি সুমাত্রা থেকে কবে এলে?

এই তো দিন সাতেক হলো—হোসেনচাচা এলে আবার পাড়ি দেব। একটু থেমে হঠাৎ হো-হো করে হেসে বলল, আমার ডাঙ্গায় মোটেই ভাল লাগে না—বুঝলে ওস্তাদ!

কিন্তু হোসেনচাচার জাহাজ এখনও এল না কেন বল্ তো ?

কে জানে! তার জাহাজে তো সারেঙ আছে যতীন,—সে হলো পয়লা নম্বরের ভীতু।

কেন, ভয়ের কি আছে ?

বাঃ বঙ্গোপসাগরে—আরবসাগরে যেমন, তেমনি ভাটির দিকে গঙ্গায় একেবারে গিজ গিজ করছে বোম্বেটে জলদস্যুরা! সারেঙের কাজই হলো, বিপদ বুঝতে পারলেই জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া। একটু থেমে বলল, আমি একবার সুদকওয়ানে (চট্টগ্রামে) ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের হাতে—

ভিখু—তোর এবার জাহাজঘাটে থাকা আর হয়েছে। দূরে লোকে লোকারণ্য। বালুচরের পাশ কাটিয়ে গঙ্গার পাড়ের ওপরে পাথরে বাঁধানো উঁচু রাস্তার দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল ফয়েজ, ওই দেখ্ কে আসছে!

টাট্টু ঘোড়ায় চেপে খুট্ খুট্ করে আসছে হরি সা—গৌড়ের জমির দালাল। তাব বাবাব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে এখানে এই সুখানজিয়ার, সারেঙ, তুণ্ডীলদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখলেই এক্ষুণি তার বাবার কাছে আটখানা করে লাগাবে।

টুক্ করে ভীড়ের ভেতরে মিশে গেল ভিখু। আর ফয়েজ, গনি মিঞা, ননী সারেঙ যে-যার কাজে চলে গেল।

প্রতীক্ষারত জনতা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের আকাশে আবির ছিটিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গঙ্গার জল তরল অগ্নিধারার মতো জ্বলছে। এখুনি—এখুনি আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে উঠবে দিক-দিগন্ত। তবুও হোসেনচাচার জাহাজ এল না—এল না কোন খবরও। জনতার ভেতর থেকে টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে—

গঙ্গার বুকেই দেখ, হয়তো ঝড়ে-টড়ে কোথায়—

এসব অলক্ষুণে কথা বলছ কেন ?

আরও কত রকমের বিপদ হতে পারে—হয়তো কোন—

আরে ধুর, আমি ভেবেছিলাম, বাগদাদী একটা ঘোড়া কিনব, সিক্কা টাকা পর্যন্ত ট্যাঁকে বেঁধে নিয়ে এসেছিলাম—

ওই যে·· ওই যে দেখতে পাচ্ছ—মাস্তুল দেখা যাচ্ছে—

হঠাৎ জনতার সমবেত গলার চীৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল আকাশ। কেঁপে উঠল বালুচর। চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল জেটীতে। এল রামু গোঁসাই। এল ফয়েজ, গনি মিঞা, ননী, চিড়াইবাড়ি বন্দরের জাহাজঘাটের আরও অন্যান্য কর্মীরা।

এদিকে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে। খপ করে ভিখুর একটা হাত শক্ত করে ধরল সাপের মতো নরম আর ঠাণ্ডা আর একটা হাত।

কে তুমি ?

বোরকায় আপাদমস্তক ঢাকা সেই রমণী একটাও কথা বলল না। ভিখু দেখল, কালো বোরকার নীচে যেন গোলাপী মোমের প্রলেপ দেওয়া রাঙা টুকটুকে পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। আর চোখের জায়গায় বোরকার দুই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে—দুটো চোখে যেন আগুন ঝিকমিক করছে!

আরে আশ্চর্য, কথা বলছ না কেন ?

তুমি আমার সঙ্গে এস—ভিখুর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে সে সেই জমাট ভীড় থেকে বাইরে বের করে নিয়ে এল।

না, আমি হোসেনচাচার জাহাজ না দেখে যাব না—কিছুতেই না। কিন্তু ভিখুর কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন ক্ষীণ আর দুর্বল শোনালো।

সে আর কিছু না বলে সেই রহস্যময়ীর সঙ্গে নিঃশব্দে চলতে লাগল।

॥ চার ॥

পর্তুগীজ সাহেবদুটোকে নিয়ে হাকিমসাহেব চলে গেছে অনেকক্ষণ আগে।

গুম হয়ে বসে আছে মজিবর বৈঠকখানার বারান্দায়। দূরে ধান কেটে নেওয়া ফাঁকা মাঠে কৃষ্ণা রাত্রির স্রোত বয়ে চলেছে। সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে ঘন থকথকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো, হঠাৎ সে যেন একটা গভীর অন্ধকার খাদের ভেতরে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, দূরে অন্ধকারের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে তার বুকের পাঁজরার মতো এক-একটা রেশমের শাড়ি আর একটা উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে আনন্দে নাচছে সেই পাজী, বেতমিজ, শয়তান—তার একমাত্র সন্তান! ওর রক্তের ভেতরে আছে বিষাক্ত একটা অভিশাপ! ঘর-সংসার ছেড়ে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর সেই ছন্নছাড়া জীবনের অভিশাপ! তা না হলে বারো বছরের ছেলে কখনো বিদেশী সওদাগরী জাহাজে করে পালাতে সাহস করে! ভাগ্যিস তার দোস্ত সামসুদ্দিন বদমায়েসটাকে ধরে এনেছিল।

ওগো শুনছ, একবারটি ভেতরে আসবে? চিঁ-চিঁ করে ভেতর থেকে বলল ফুলজান। ভিখুর গর্ভধারিণী। মজিবর উঠল না। যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে রইল। কি হবে যেয়ে—আর কত করবে! বছরের পর বছর কি কেউ রোগ টানতে পারে! তার একবার মনে হলো—এই বৌ আর ছেলেকে যদি খুন করে দুনিয়া থেকে একেবারে বেমালুম সরিয়ে দিয়ে কোথাও চলে যেতে পারতো—

শুনছ—আমি ডাকছি—

কি—যাচ্ছি—ক্ষিপ্ত হয়ে বলল মজিবর। খড়মে শব্দ তুলে ভেতরে গেল।

অন্ধকার ঘর। বিছানার ওপরে একটা কঙ্কাল যেন অবলীন হয়ে আছে।

নোংরা তেলচিটকে বালিশের পাশে রুক্ষ চুলের গোছা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। চোখের দুটো কালো গহ্বর থেকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুটো শিখা যেন মজিবরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

বল—কি চাও ?

খোকা কোথায় ?

জানি না—

সে কী ! সেই দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছে। আর এখনও আসে নি ? সেদিকে তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই ?

চুপ কর, ওই শয়তানটা সম্বন্ধে একটা কথা বলো না,—ও তোমার লাই পেয়ে পেয়েই—

লাই কি গো ? আমাদের একটা মাত্র ছেলে—

কি বলছ তুমি, একটা ছেলে বলে সে দিনরাত বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—বুড়ো বাপকে একটুও সাহায্য করবে না, সাত পুরুষের ব্যবসার দিকে তাকাবে না ?

ফুলজান তার প্যাঁকাটির মতো হাত দিয়ে মজিবরের হাতদুটো ধরল। অনুনয় করে বলল, ওকে কিছু বলো না গো ! পরে দেখ—ও ঠিক হয়ে যাবে।

হুঁ—আর হয়েছে ! বলেই বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল মজিবর।

আর বারান্দায় থামল না। একেবারে রাস্তায় নামল। হন্ হন্ করে চলতে লাগল মহানন্দার ধারে ধারে উঁচু বাঁধের মতো পাকা রাস্তা ধরে মহানগরী গৌড়ের দিকে। দূরে বহুদূরে আলোকোজ্জ্বল মহানগরী গৌড়ের কলরোল শোনা যাচ্ছে, আর অন্ধকার আকাশে

আছড়ে পড়েছে আলোর বন্যা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে দাঁড়ালো মজিবর। ওই রাক্ষুসে শহরের পাশ দিয়েই তরতর করে বয়ে চলেছে গঙ্গানদী—আর ওই গঙ্গার বুকের ওপর দিয়েই আসছে বাইরের ছুনিয়ার যত ধ্যান-ধ্যারণা আর চিন্তাধারা। এই নদীর জলরাশি দিয়েই হোসেন চাচার মতো সওদাগররা আসছে বাগদাদ থেকে, বসোরা থেকে, ইস্পাহান থেকে, আরও দূর দূর দেশ থেকে। যদি কোন উপায়ে সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করা যেত—অসহ্য—অসহ্য একটা অস্থিরতায় তার হাতছুটো নিসপিস করতে লাগল।

নসু আছিস নাকি—নসু—

সে কী! চাচা আপনি! ছুটে এল নসীবন। মজিবরকে দেখেই তার ভিখুর কথা মনে পড়ল। আর বুকের ভেতরটা গুড়-গুড় করে উঠল।

তোর বাপজান কোথায় রে?

মহাজনের বাড়ি থেকে বীজধান কিনতে গিয়েছে।

ও! নসীবনের দিকে তাকালো মজিবর। দীর্ঘ সুঠাম দেহ মেয়েটির। পরনে গঙ্গাজলী শাড়ি। হাসি-হাসি ছুটো চোখ। সারা মুখে ভোরের আকাশের মতো কমনীয়তা মাখানো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে নেশা ধরানোর মতো চেহারা। এই মেয়েটা কি ইচ্ছে করলে বেতমিজ ছেলেটাকে বশে আনতে পারে না?

কি ভাবছেন চাচা?

না, কিছু না। থতমত খেয়ে যায় মজিবর। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলে, ভিখু এখানে আসে না?

লজ্জার ছায়া পড়ে নসীবনের চোখে। কিছু বলে না। বলতে পারে না।

তুই মা, ওকে একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিস তো। মজিবরের কথাগুলোর ভেতরে কাতর অনুনয় ফুটে ওঠে, সংসারের কাজকম্মে একটুও মন নেই। দিনরাত জাহাজঘাটে পড়ে থাকে—

এই ক'দিন আগেই পদ্মপুকুর থেকে জোর করে সে চিড়াইবাড়ির ঘাটে চলে যায়। সে বহুবার নিষেধ করেছে—কিন্তু কানেও তোলে নি সেকথা—এসব কথা সে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু বলল না। বলতে পারল না। বাপের সঙ্গে ছেলের বিরোধ আরও বাড়বে—

কি ভাবছিস মা ?

কিছু না চাচা—

তোর বাপজান এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস আর—হঠাৎ দুহাতে বুক চেপে ধরল মজিবর। ভেতরে ভেতরে তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে যেতে বলল, আর তুই—তুই মা ওকে একটু—

বলব চাচা, বলব। নিভু-নিভু গলায় বলল নসীবন।

আমি আজ যাই কেমন ! বলেই আর দাঁড়ালো না মজিবর।

দূরে তরল অন্ধকারে অপসৃয়মান মজিবরের ঝুঁকে ঝুঁকে চলা দীর্ঘ দেহটার দিকে তাকিয়ে বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নসীবন। ভিখুর ওপর তার একটা জোর আছে। তাই এই রাত্রে বুড়োমানুষ ছুটে এসেছে তার কাছে। কিন্তু সত্যিই কি ওই উদ্দাম আর বিপুলব্যাপ্ত আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলা মানুষটার মনের কাছাকাছি সে যেতে পেরেছে, না, তার মনের কোন থৈ সে কখনো পেয়েছে ! হঠাৎ নিজেকে বড় অক্ষম আর দুর্বল বলে মনে হলো আর একটা জ্বালা—তীব্র জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল বুকের ভেতরটা।

আলো ঝলমল গৌড় মহানগরী। বৃক্ষশোভিত রাজপথের দু'পাশে সারি সারি দোকানের থাকে থাকে সাজানো বহুমূল্য পণ্যসম্ভারে আলোর দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। প্রত্যেক দোকানে সুবেশা রমণীদের রঙীন ভীড়। সুরার দোকান সংলগ্ন পানশালায় নরনারীর মত্ত উল্লাসের ফোয়ারা চলছে। রাজপথের দু'পাশে ধনী, বিত্তশালী সুবর্ণশ্রেষ্ঠীদের সুদৃশ্য প্রাসাদ থেকে গানের মধুর সুরের মূর্চ্ছনা ভেসে আসছে। মহানগরীর সেই বিপুল সমারোহের ভেতর দিয়ে নিঃসঙ্গ

আর একক মজিবর চলেছে চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটের দিকে। যেখানেই থাক—যেমন করেই হোক—ভিখুকে ধরে আনতে হবে। ওর সঙ্গে আজ তার শেষ বোঝাপড়া করতে হবে। তারপর—তারপর সে নসীবনের বাপজানকে সব কথা খুলে বলবে। সাদী দিয়ে দেবে ছেলের। নিজের হাজারো সুখী কল্পনার ভেতরে মগ্ন হয়ে সে পথ চলতে লাগল।

পার হলো মোগলটুলী; পার হয়ে গেল বাইশবাজার। দূরে চিড়াইবড়ির ঘাটের চোখধাঁধানো আলোর বন্যা চোখে পড়ল। আর কানে এল দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মতো সমবেত মানুষের কোলাহল। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই ভিখু সেখানে আছে! ঘাড় ধরে অবাধ্য ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাবে—

হেট-হেট—যাঃ দানাপানি তো খুব সাঁটাস আর কাজের সময় তোর ভীমরতি, না? দূরের অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এল কথাগুলো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মজিবর। আর একটু পরেই ছায়া ছায়া অন্ধকারের পটভূমিতে আরও নিকষ কালো এক অশ্বারোহী মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কে ওখানে? চিৎকার করে উঠল লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে।

আমি মজিবর—

কে? আমি কানে খাটো—তা জান না—কানে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠল হরি সা।

আমি শে-খ ম-জি-ব-র র্—র্—থেমে থেমে চড়া গলায় বলল মজিবর।

টাট্টুর পিঠে চড়েই তার সামনে এল হরি সা। অন্ধকারে ঝুঁকে পড়ে মজিবরের মুখের দিকে খরচোখে কি যেন দেখল কয়েক মুহূর্ত, বলল, ও হরি!—কত্তা যে! মাফ করবেন—অন্ধকারে ঠাহর করতে পারি নি—

তুমি শহরের দিকে গিয়েছিলে কি মনে করে ?

দাঁড়ান কত্তা—দাঁড়ান, টাট্টুর পিঠে বসে বসে বসেই কথা বলব নাকি আপনার সঙ্গে ? বলেই ঘোড়াটা একটু এগিয়ে নিয়ে গেল এমন এক জায়গায়, যেখানে একটা কাটা জামগাছের গুঁড়ি আছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে সেই গুঁড়ির ওপর পা দিয়ে নামল, বলল, কি করব, বেঁটে মানুষ—নামতে পারি না কত্তা—ও হ্যাঁ—শহরে গিয়েছিলাম—কেন জানেন ? আর বলেন কেন, চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটের আশ-পাশে জমির দাম যা চড়চড় করে বাড়ছে না—কি বলব—একটু থামল। বলল, আচ্ছা কত্তা, রামু গোঁসাইয়ের জাহাজের কারখানার লাগোয়া একটা জমি আছে—নেবেন ?

না, আমি শহরে জমি নেব না হরি।

কেন, আপনি রেশমের এত বড় ব্যাপারী! জাহাজঘাটে একটা বড় করে গুদাম বানাবেন কত্তা—গুদামঘর—বুঝলেন ?

গুদামঘর দিয়ে কি হবে ?

বাঃ, আপনি বলেন কি কত্তা! গুদামে সুতোর পেটী রাখবেন, কাপড়ের গাঁট রাখবেন। তারপর যখন দূর দেশে পাড়ি দেবে জাহাজ—সেই জাহাজের খোলে ভরে দেবেন আপনার রেশমের বিখ্যাত বিখ্যাত শাড়ি—মেঘডম্বুর, পরীলীলা, বাতাসজাল, নয়নসুখ, গঙ্গাজলী আর শবনম—

থাম হরি—বেশি কথা ভাল লাগে না। তুমি জেনে রাখবে, আমি কখনও জাহাজঘাটের ত্রিসীমানায় গুদাম তৈরি করব না, কখনও না।

কিন্তু ভেবে দেখবেন কত্তা, তবুও দালাল সহজে হাল ছাড়ে না। বলে, আসলজমাতুমার* অনুযায়ী, রাজমহল থেকে সকরিগলি হয়ে গৌড়ের গঙ্গার এপার পর্যন্ত এই সরকার ট্যাঁড়া পরগনাকে বলা হয় বাহান্ন পরগনা। এই এতবড় অঞ্চলটার সরকারী খাজনা কত জানেন ?

* টোডরমলের সময়ের জমির বিলিব্যবস্থা।

মজিবর কথা বলে না।

তার মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ে। হরি ভাবল, মজিবর শুনতে পাচ্ছে না তার কথা। তাই চিৎকার করে বলল, খাজনা হলো ছয়শো এক মোহর! তাহলে চিড়াইবাড়ির জমির দাম হলো গিয়ে এক কাঠার দাম মাত্র ছয় মোহর—

শোন হরি, আমি তো কিনব না শহরের জমি—তুমি কেন মিছিমিছি এতগুলো কথা খরচ করছ? একটু থামল মজিবর। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলল, গ্রাম থেকে বেশির ভাগ লোক এই মহানগরীতে চলে আসছে—গৌড়ের ধনসম্পত্তির আকর্ষণে বিদেশী সাগরপারের লোকরাও শকুনের মতো পালে পালে এসে জেঁকে বসছে।

কি বলছেন বিড়বিড় করে কত্তা, শুনতে পাচ্ছি না—আমি কানে খাটো—জানেন তো! চিৎকার করে বলল হরি সা, আপনি জমি না কিনুন, আপনার ছেলে ভিখু কিন্তু গৌড়ে জমি কিনল বলে! সে দিনরাত চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটের কাছে ঘুর-ঘুর—

চুপ কর হরি, তুমি তার নাম মুখেও এনো না। হিংস্র বাঘের মতো গর্জে উঠল মজিবর। রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

হরি সা আর একটি কথা বলল না। বাপ-ছেলের সংঘাতের কথা তার অজানা নয়। সে আবার রাস্তার ধারের সেই কাটাগাছের গুঁড়ির কাছে গেল। তার ওপর উঠে টাট্টুর পিঠে চেপে বসল। বেতের লাঠিটা উঁচিয়ে আর ঘোড়ার পেটের দুইদিকে দু পা দিয়ে লাথি মেরে বলল—চল্-চল্, এই হেট-হেট—

হরি, শোন ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়াল মজিবর। তীব্র উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সে। চোখদুটো দু'খণ্ড আগুনের মতো চকচক করছে। ভেতরে ভেতরে নিদারুণ কোন যন্ত্রণায় যেন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে সে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তুমি ভিখুকে দেখেছ?

হ্যাঁ—সে তো হোসেনচাচা আসবে বলে চিড়াইবাড়ির জেটীতে বহু লোকের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দেখলাম—

কি দেখলে—কি দেখলে, তাড়াতাড়ি বল হরি!

হরি কথা বলল না। মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

হাসছ কেন—বল না—জ্বলে উঠল মজিবর।

বোরকাপরা একটা মেয়েছেলের হাত ধরে সে বাইশবাজারের দিকে যাচ্ছে—একটু থামল হরি। সুযোগ বুঝে চিন্তার জ্বরে পুড়ে-যাওয়া মানুষটার মনে আরও বিষ ঢেলে দিল। বলল, আপনার ছেলের কথা আর বলবেন না কত্তা!

কেন?

স্ত্রীলোক সংসর্গ করলে সে ছেলে কখনো কি ভাল থাকতে পারে কত্তা? হেঁ-হেঁ-হেঁ! ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে হাসল হরি সা। বলল, আমি সেদিন দেখেছি নিজের চোখে—

কি, কি দেখেছ হরি, বল—আমার একমাত্র ছেলে—ডুবন্ত মানুষের মতো বলল মজিবর। তার হাঁটু দুটো অবশ হয়ে এল, দুর্বল—ভীষণ দুর্বল মনে হলো নিজেকে।

আপনি নিমাসরাই ছেড়ে আসতে চান না। গ্রামকে ভালবাসেন—ভালবাসেন রেশম-শিল্পকে—দিনে পাঁচওক্তো নামাজ পড়েন—

বাজে কথা না বলে, তুমি আর কার সঙ্গে তাকে দেখেছ—কোথায় দেখেছ—

এবার হরি টাট্টুকে আরও কাছে নিয়ে এল। এল দুরভিসন্ধির মূর্তির মতো। মিটি মিটি হাসল। গলা নামিয়ে তার কানে ঢেলে দিল কতগুলো ভয়ঙ্কর কথা। আর দাঁড়ালো না সে। টাট্টু হাঁকিয়ে চলে গেল।

বাজপড়া ঠুঁটো তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে রইল মজিবর।

তার মনে হলো, নিজের ওপরে তার আর কোন বশ নেই। ভারী, খুব ভারী একটা অনড় পাথরের মতো তার দেহটা যেন একটা গভীর

অন্ধকার খাদের ভেতরে নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অদূরে আলোকোজ্জ্বল গৌড় মহানগরীর সারি সারি প্রাসাদশীর্ষ, চিড়াইবাড়ির ঘাটের সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলগুলো যেন এক-একটা অতিকায় দৈত্যের মতো তার দিকে গুটি-গুটি এগিয়ে আসছে। ঘন অন্ধকারে তারা যেন সাদা সাদা দাঁত মেলে খলখল করে হাসছে আর নিঃশব্দে বলছে—তোর ছেলেকে খেয়েছি, এইবার তোকে—তোর সাতপুরুষের রেশমের ব্যবসাকে আমরা গ্রাস করব। তোকে একেবারে নিঃস্ব করে দেব—তুই যখের মতো অতীতের ধ্যান-ধারণা আর জীবনধারাকে সতর্ক পাহারায় আগলে রাখতে চাস তো—তার শাস্তি তুই পাবি—তোকে পেতে হবে—

কি হে, 'ভূত' নাকি তুমি,—হা-হা-হা! হাকিমসাহেব সামনে এসে দাঁড়ালো, এই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছ—গৌড়বঙ্গের রেশমের সওদাগর—হঠাৎ থেমে গেল হাকিমসাহেবের উচ্ছ্বাস। মজিবরের শুকনো কালো মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। বলল, এ কী, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে? দেখি—তোমার হাতটা—

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো মজিবর।

ঠিক এই সময়—এই সময় যখন গৌড়ের আকাশে তারার দীপালি জ্বলছিল, যখন মহানগরীর আলোকোজ্জ্বল শত শত প্রাসাদ-শ্রেণীর ছায়া বুকে নিয়ে দুলছিল গঙ্গার জল আর যখন হোসেন-চাচাকে অভ্যর্থনা করার জন্য হাজার হাজার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তখন ভিখু চুপ করে বসে ছিল একটা অন্ধকার ঘরে। কিন্তু ঘরের মূল্যবান ও দামী আসবাবপত্র অন্ধকারেও ঝকমক করছিল। মেহগিনি কাঠের সুদৃশ্য নকশাকাটা পালঙ্কের মাথায় সামুদ্রিক মুক্তা জ্বলজ্বল করছে। শ্বেত-পাথরের তৈরি ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে মণিমুক্তা আর প্রবালখচিত কৃত্রিম লতাপাতা ফুল শোভা পাচ্ছে। যবদ্বীপের রৌপ্যাধার থেকে সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়া উঠছে

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। দেওয়াল-আলমারিতে থাকে থাকে নানাবর্ণের ঝিনুক ঝিকমিক করছে। আর একদিকে দেওয়াল জুড়ে বেলজিয়ান কাঁচের আয়নায় তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঘরের ছায়া পড়েছে। তার ভেতরে প্রেতচ্ছায়ার মতো তার নিজের অবয়ব দেখতে পেল ভিখু। তার নিজেকে প্রেতলোকের অশরীরী ছায়ার মতই মনে হলো। কেন —কেন এখানে এল তার কথায়? কেন নসীবন তাকে ভালবাসে, কেন চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটের সেই বিচিত্র মেয়েটি তার সঙ্গসুখ কামনা করে? মেয়েরা তার ভেতরে কি পায়—কি দেখতে পায়? কেন তারা পিছন থেকে বারে বারে রাশ টেনে ধরে বুঝতে পারে না? যদি এমন কোথাও চলে যেতে পারতো—অনেক—অনেক দূরে কোথাও, যেখানে ধু-ধু করবে দিগ্‌বিস্তীর্ণ সমুদ্র কি দিগন্তবিশারী প্রান্তর—যেখানে লোকালয় নেই—ঘরের মায়া নেই, নসীবন নেই, চিড়াইবাড়ির রহস্যময়ী মেয়েটি নেই—নেই এই বোরকাপরা সুন্দরী জুলিয়া বিবি!

ঝুন্—ঝুন্—ঝুন্—সেই বিশাল প্রাসাদের কোন জায়গা থেকে নূপুর নিক্বনের ধ্বনি ভেসে এল। ভিখুর শরীরের ভেতরটা সিরসির করে উঠল। আসছে—আসছে জুলিয়া বিবি! জাহাজঘাটের ভীড়ের ভেতর থেকে ডেকে এনে কি বলতে চায় সে এই নির্জন নিরালা বাড়িতে! তার সঙ্গে কি-ই বা এমন সম্পর্ক! নসীবনের দূরসম্বন্ধের কি রকম পিসী হয়। কিন্তু তার সঙ্গে—

ঝুন্—ঝুন্—ঝুন্···নূপুরের শব্দ ক্রমশ কাছে আসছে!

ভিখুর মাথার ভেতরে আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে। সমস্ত শরীরটা চিন্‌চিন্ করে জ্বলে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারছে।

কি গো শেখের পো! অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছ! কলকল করে বলে উঠল জুলিয়া। কার্নিশে টাঙ্গানো ঝাড়-লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দিতেই ভিখুর চোখদুটো ধাঁধিয়ে গেল।

দীর্ঘ উদ্ধত দেহ পেঁচিয়ে পরেছে শবনম শাড়ি। শিশিরের মতো স্বচ্ছ সেই শাড়ির আড়ালে তার সুপুষ্ট নিতম্বের ছায়াময় লোভানিতে যেন কোন আমন্ত্রণের ইসারা। গলায় গজমোতির হার, কানে কর্ণপুর, নাকে মুক্তাবলী, দু'হাতে দুটো টাড়বালা। কানাড়ি ছাঁদে বেঁধেছে মস্ত কালো গম্বুজের মতো খোঁপা। তার ভেতরে হাসছে বেলফুলের শ্বেত শুভ্র একটা কুঁড়ি। সুর্মাটানা কালো ডাগর দুটো চোখের খরদৃষ্টি ভিখুর দেবদারুর মতো ঋজু দীর্ঘ দেহে একবার বুলিয়ে নিয়ে বলল, ভাবছ, কেন তোমাকে ডেকেছি—না? বলতে বলতে তার কাছে ঘন হয়ে বসল জুলিয়া। অস্বস্তিতে পুড়ে যাচ্ছে ভিখুর মনটা। খুব ক্লান্ত আর ক্লিষ্ট গলায় অস্ফুটস্বরে সে বলল, হ্যাঁ—এতক্ষণ হয়তো হোসেনচাচা এসে গেছে—আমি তাকে—

খবরদার! সেই বেতমিজ কাফেরের নাম মুখে আনবে না তুমি। বিষাক্ত সাপিনীর মতো দুলে উঠল জুলিয়ার দীর্ঘ তনু। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, দেখছ, সে আমাকে কি সুখে রেখেছে—

কেন, তোমার গা-ভরা এত দামী দামী গয়না, ঘরে থরে থরে সাজানো কত বিদেশী জিনিস—

ভিখুর ছেলেমানুষী সরলতা দেখে হেসে ফেলল জুলিয়া। ভিখুর বুকে সস্নেহে হাত দিয়ে বলল, নম্নুর সঙ্গে সাদী হোক, তখন বুঝবে মেয়েমানুষের মন শুধু গয়নায় আর জিনিসে ভরে না, বুঝলে? একটু থামল জুলিয়া। ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল চোখে, বলল, দেখ মাসের পর মাস মানুষটা সমুদ্রে ভেসে ভেসে বেড়ায়—আর আমি এখানে ঘরের কড়িকাঠ গুনি। কি হবে—কি হবে আমার টাকা-পয়সা দিয়ে বলতে পার?

ভিখু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়। তার কথা বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না তার মনের জ্বালাটা কেন?

শেখের পো—যেন অনেক, অনেক দূর থেকে বলল জুলিয়া, তুমি নম্নুকে ভালবাস?

ভিখু মাথা নীচু করে। কি বলবে—কি বললে শোভন হবে বুঝতে পারে না।

খুব বেশি ভালবাসলে দেখবে একা একা থাকা কত কঠিন শেখের পো! এখানে এই ঘরে এক-একটা রাত আসে যেন দৈত্যের মতো। আমার বুকের ওপরে চেপে বসে। আমাকে—তীব্র ব্যথায় তার গলাটা ধরে এল। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। মনের ভেতরের দুঃসহ যন্ত্রণাই যেন কণা কণা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল তার দুই গাল বেয়ে।

তুমি কাঁদছো!

না—ও কিছু না। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিজেকে একটু সংযত করে বলল, শোন, তোমাকে যে জন্য ডেকে নিয়ে এসেছি—তুমি আমাদের নসুর স্বামী হতে যাচ্ছ! তাই তোমাকে বলছি—খবরদার তোমাদের বিখ্যাত সওদাগর হোসেনচাচাব ভক্ত হয়ো না, কখনো কালাপানি পার হয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যাবে না, বুঝলে? থেমে গেল জুলিয়া। ভিখুর একমাথা কোঁকড়ানো নরম চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, সমুদ্রপারের দেশে দেশে ঘুরলে তোমাব আর ঘরে মন বসবে না। শুনেছি, বিদেশী মেয়েরা মায়াবিনী—তারা—

ধুর, কি বলছ এসব! হেসে ফেলল ভিখু।

শোন, হেস না শেখের পো—হেস না। ভেবে দেখ তোমাদের হোসেনচাচার কি দশা হয়েছে, কি হাল হয়েছে আমার। হঠাৎ থামল জুলিয়া।

নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে বলল, আজ সকাল থেকে চিড়াইবাড়ির জেটীতে অজস্র মানুষের ভীড়। তাদের মুখে ওই কাফের আর পাষণ্ডটার জয়গান শুনে আমার কি মনে হলো জান?

কি—

মনে হলো, যেন আমাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। কফিনে পুরে আমার লাশটাকে সেই কবরের অন্ধকারে নামানোর আগে যেন

হাজার কণ্ঠে কোরাণ পাঠ হচ্ছে। দিকে দিকে আল্লাহের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—

তোমার মাথা খারাপ—

আমি আর বাড়িতে স্থির থাকতে পারলাম না। ভিখুর কথা যেন শুনতেই পেল না, উত্তেজিত হয়ে ঝেঁকে ঝেঁকে বলে চলল জুলিয়া, ছুটে বেরিয়ে গেলাম চিড়াইবাড়ির ঘাটের দিকে। ইচ্ছে হলো—ইচ্ছে হলো মানুষগুলোর টুঁটি টিপে ধরে একেবারে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই —ভীড়ের ভেতরে হঠাৎ তোমাকে— তোমার মতো সরল আর নিষ্পাপ একটা ছেলেকে দেখেই ধক করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা।

একটু থামল জুলিয়া। তীব্র উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল। ভিখুর হাতদুটো জড়িয়ে ধরল। বলল, তোমাদের সওদাগরের মুখে শুনেছি আমি—তোমারও তার মতো বিদেশে যেয়ে বাণিজ্য করার শখ।—নিস্তব্ধ ঘরের ভেতরে জুলিয়ার কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মতো শোনালো। ভিখুর বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো। অস্ফুটস্বরে বলল, লক্ষ্মীটি—নসুকে ফেলে কখনো যেও না - কখনো যেও না— বল যাবে না! বলতে বলতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল জুলিয়া। পরম আদরে সাপের মতো দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল আর ধীরে ধীরে তাকে বুকের কাছে আকর্ষণ করতে লাগল। জুলিয়ার দু'চোখে ধক ধক করছে আগুন—কামনার আগুন। ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়ছে। তার সারা শরীরের শিরায় শিরায় তরঙ্গিত হয়ে চলেছে তীব্র উত্তেজনা। ভিখুর খাড়া নাকে, ধারালো মুখে আর চওড়া বুকে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যেন কোন ফুলের গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছে। আর অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে বলে চলেছে, বল—তুমি নসুকে আমার মতো কষ্ট দেবে না! জান, একটি রাতেও আমি ঘুমোতে পারি না। লোকে জানে, আমার ঘরে সাত সমুদ্রের প্রবাল আর মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি—আমার কত ঐশ্বর্য। কিন্তু আমি—

তুমি এ রকম করছ কেন, আমি তো যাই নি! অনেক কষ্টে এতক্ষণে এই ক'টি কথা বলল ভিখু। তার গলা শুকিয়ে কাঠ। তার চব্বিশ বছরের উদ্দাম যৌবনের রক্তে গুরু গুরু ঝড় যেন ভেঙে পড়ছে। তার সারাদেহের রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুনের ফুল্‌কি ছিটিয়ে দিয়েছে। অস্ফুটস্বরে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও— এখুনি তোমার বাড়ির কে এসে পড়বে—

জুলিয়া কোন কথা বলল না। কিন্তু আরো জোরে তাকে জাপটে ধরল। আর বদ্ধ উন্মাদিনীর মতো তার সুগন্ধী তেলমাখা নরম চুলে ভরা মাথাটা ভিখুর বুকে ঘষতে ঘষতে বলল, কোথায় যাবে —আর একটু থাক না শেখের পো! তুমি কী—তুমি! একটু থামল, ভিখুর উত্তেজিত রাঙা টকটকে মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমি কী সুন্দর—কী সুন্দর—

আল্লাহ্ আকবর—

জয় হোসেনচাচার জয়!

জয় মা ভগবতী—

চিড়াইবাড়ির ঘাট থেকে আকাশ কাঁপানো জয়ধ্বনি শোনা গেল। মুহূর্তের ভেতরে জুলিয়ার বাহুবন্ধন থেকে এক ঝট্‌কা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় নামল ভিখু। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল চিড়াই-বাড়ির ঘাটের দিকে। তখনো দরদর করে ঘাম ঝরছে তার। আর—

শিলীভূত একটা মূর্তির মতো বসে রইল জুলিয়া। বসে রইল সেই নির্জন ঘরে।

একক। নিঃসঙ্গ।

জয় হোসেনচাচার জয়!

সেই উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে সে মর্মান্তিক আক্রোশে খুলে ফেলল কানাড়ী ছাঁদে বাঁধা বিশাল খোপা। ছুঁড়ে ফেলে দিল বেলফুলের কুঁড়ি। খুলে ফেলল কর্ণহার, মুক্তাবলী আর টাড়বালা।

সাজসজ্জা খুলে বিছানায় শুয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। আর সেই কান্নার গুমরানো শব্দ নিস্তব্ধ ঘরের বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। আর···

চিড়াইবাড়ি ঘাট থেকে বাগদাদ-ফেরত তার স্বামীরই জয়ধ্বনির আওয়াজ আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল সেই কান্নার শব্দ-মুখর সেই অভিশপ্ত ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে।

॥ পাঁচ ॥

জাহাজ আসছে—

গঙ্গার বুকে ঢেউ তুলে দুলে দুলে হোসেনচাচার জাহাজ আসছে। অন্ধকার গঙ্গার বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপবে আলো ঝলমলে সেই বিশাল বজরাকে মনে হচ্ছে যেন আলোকোজ্জ্বল একটা বিরাট সৌধ। জলে তার উল্টো ছায়া পড়েছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে রাশি বাশি আলোর মালা পরানো সেই জলযানের ছায়া। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, বুঝি অন্ধকারে কালো জলের ভেতরে যেন কতগুলি আগুনের ফুল থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তলিয়ে যাচ্ছে।

ওই যে—ওই যে হোসেনচাচাকে দেখা যাচ্ছে!

আরে ধুব—কাকে না কাকে দেখছ—কোন মাঝি-মাল্লা—

না-না—ওই তো পীরময়গম্বরের মতো আলখাল্লাপবা। বুক অবধি লুটিয়ে পড়া কালো কুচকুচে দাড়ি!

এটা হোসেনচাচার জাহাজই নয়—সে তো তিনমাস্তুলের জাহাজ সত্ত্বরা নিয়ে বাগদাদ গিয়েছিল।

কি বলছ, তিনমাস্তুল থাকলে বুঝি সাদা রঙের জাহাজ হয়?

তুমি একটি মুখ্যু—মহামুখ্যু—দেখছ না—ভাল করে দেখ—চার-চারটি মাস্তুল আছে। তাই তার বঙ সাদা—

তাহলে তুমি বলছ সত্ত্বরা নয়?

না— ওটা স্বর্ণমুখী, সমুদ্র পাড়ি দিতে স্বর্ণমুখীর জুড়ি নেই।

জনতার টুকরো টুকরো কথা আর মৃদুগুঞ্জনকে ছাপিয়ে রামু গোঁসাইয়ের চড়াগলার আওয়াজ গম গম কবে উঠল, এই জেটীর সামনে কেউ থেক না—সবাই পাড়ে উঠে এস—ওখানে জাহাজ ভিড়বে—এই ন—নী—আমাদের 'খারওয়া' দাসু কোথায় গেল—

সারেঙ ননী ছুটল খারওয়াকে ডাকতে। জমাট ভীড়ের ভেতর থেকে খারওয়া দাম্বুকে ডেকে নিয়ে এল। দাঁত খিঁচিয়ে উঠল রামু গোঁসাই, কি কর তুমি, কাজের সময় যাও কোথায়—

আমি তো ডিঙ্গিতে চড়ে গঙ্গার ভেতরে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখতে গিয়েছিলাম হুজুর--সেটাও তো আমার মানে খারওয়ার কাজ—

কি দেখলে, কোথাও চড়া-টড়া পড়ে নেই তো ?

না হুজুর—

এইবার চাচার জাহাজ খুব যত্ন করে নোঙর করাও দেখি - তাহলে বুঝব তুমি ওস্তাদ খারওয়া।

ভাল কবে নোঙর করানো যাবে না হুজুর।

কেন ? জপের মালায় শক্ত কবে হাত চেপে ধরল রামু। আর পাকা ভ্রু জোড়া সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো হয়ে গেল।

হুজুর—চাচার জাহাজ স্বর্ণমুখীর সঙ্গে মাল ঢোলাইকরা বজরা আসছে চারটে।

চারটে ! এত কি মাল নিয়ে আসছে চাচা ?

একটা তো দেখলাম আরবী ঘোড়ায় বোঝাই !

আচ্ছা—তুই শীগগীর তুণ্ডীল গোবিন্দ, সুখেনজীয়ার গনি মিঞা, মৌলিম--যে যেখানে আছে ডেকে নিয়ে আয়—যা –যা শীগ্গীর—

হোসেনচাচা কড়া লোক। একটু এদিক-ওদিক হলেই জেটী ভাড়া দেবে না। বহুদর্শী সারেঙ ননী বলল, এ সেই আর একবার পেগু থেকে আসার সময় তো চিড়াইবাড়ির ঘাটে নোঙরই ফেলল না —চলে গেল ভাটিতে রাজমহল ঘাটে।

ওসব অলুক্ষুণে কথা বলছিস কেন ননী ? খেঁকিয়ে উঠল জাহাজ-ঘাটের মালিক, আমরা খাটব। পয়সা গুনে নেব। একটু থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমার বাবা পয়সা চাই। একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হরি-হরি পরমানন্দ মাধব হে—আরে ঐ তো

পয়সা দিয়ে কি করবেন গোঁসাইজী—হা-হা-হা—পাড়ের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল হাকিমসাহেব, আরও বেশি টাকা হলে যে ভগবানের নাম নিতেই ভুলে যাবেন—জানেন তো কৃপণরা ভগবান মানে না—পরকাল মানে না—

না—মা, বলছেন কি হাকিমসাহেব, পরমানন্দ মাধবকে ভুললে চলবে কেন? পয়সা রোজগার করাটা আমার নেশা—স্রেফ নেশা।

ছলাৎ-ছলাৎ-ছলাৎ—

গঙ্গায় ঢেউ উঠছে জোরে জোরে। জেটীর গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সেই ঢেউ। জাহাজ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে পাড়ের দিকে। জনতার ভেতরে উত্তেজনা বাড়ছে।

হোসেনসাহেব বাগদাদী সওদাগুলো কবে বিক্রি-বাটা করবে বল তো?

দাঁড়াও না বাপু, লোকটা এখনও পা-ই দিল না মাটিতে—

চার-চারটে মালটানা জাহাজ—

তাহলেই বোঝ কম জিনিস আনে নি হোসেনচাচা—

জনতার অবিশ্রান্ত কলরবের ভেতরেও হাকিমসাহেবের কথা শোনা যায়, আরে হোসেন ভাইয়ের মতো সওদাগররাই হলো গিয়ে সাংস্কৃতিক দূত—বুঝলে?

হ্যাঁ; হোসেনচাচার এই অভ্যর্থনাটা রাজকীয় অভ্যর্থনা হওয়া উচিত।

এখানকার—মানে গৌড়বঙ্গের সরকার কী রকম উদাসীন দেখেছ, নবাবের তরফ থেকে কেউ জাহাজঘাটে আসে নি। হাকিমসাহেবের আক্ষেপোক্তি শোনা যায়—অথচ ভাস্কো-ডি-গামাকে পাঠিয়েছিল পর্তুগালের রাজা ডমজোয়ান নিজে।

হাকিমসাহেবের কথা শেষ হতে না-হতেই জনতার ভেতরে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ল। কী ব্যাপার! লোকের মুখে মুখে গুঞ্জন উঠল। খান-ই-জাহান শা তার কোতোয়াল মুনিম খাঁকে পাঠিয়েছে—

উপস্থিত জনতা মুখ ফিরিয়ে দেখল। পাড়ের ওপরে সাদা আরবী ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে আছে মুনিম খাঁ। ছুটে গেল রামু গোঁসাই। ননী সারেঙ কোথা থেকে একটা কুরশী নিয়ে এল। সুখানজীয়ার* নিয়ে এল গড়গড়া। সসম্মানে জেটীর ওপরে বসানো হলো মুনিম খাঁকে। গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক শব্দ তুলে অম্বুরী তামাকের সুগন্ধী ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুনিম খাঁ বলল, হোসেন সওদাগর এবার কোথা থেকে আসছে ?

বাগদাদ থেকে। হাতজোড় করে রামু গোঁসাই বলল।

বাগদাদ আবাব কোথায় ? একটু থেমে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল মুনিম। একটু যেন বিরক্ত হয়েই বিড়বিড় করে বলল, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, পেগু এসব ছেড়ে কোথায় সব আজেবাজে জায়গায় যে যায় কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা খরচ করে—

হাকিমসাহেব আর থাকতে পারল না। উত্তেজিত হয়ে এক টিপ নস্যি নিয়ে এল। হাঁটু পর্যন্ত পরা সাঁওতালী কাপডটা কোমরে কষে বেঁধে নিয়ে গুটি-গুটি এগিয়ে এল মুনিম খাঁর কাছে। বলল, বাগদাদ হলো মধ্য-এশিয়ার সবচাইতে বড় ব্যবসাকেন্দ্র, কোতোয়াল সাহেব। এই বাগদাদের ওপর দিয়ে আমাদের দেশের সওদাগররা তাদের পণ্য নিয়ে চলে যায় সুদূর রাশিয়ার ভল্গা নদীর উপত্যকায় খাজার আর বুলজাব শহরে।

তাই নাকি ? চোখ বুজে তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে মুনিম।

জানেন, ফৌজদার সাহেব, আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয়শো বছর আগে ইবন ফাদহলান নামে এক ঐতিহাসিক বাগদাদে মার্ভে বুখারায় গিয়েছিলেন—ভল্গার বন্দর বড় শহর বুলজার পর্যন্ত গিয়ে দেখেছেন, সেখানে আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা—

কাকে বলছেন হাকিমসাহেব ? ফৌজদার সাহেবের দিকে

* 'হাল ফিরানো ও ঘুরানো ওদের কাজ', "মধ্যযুগে বাঙ্গালা"—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাকিয়ে দেখুন ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফিস ফিস করে বলল রামু-গোঁসাই। কুরশীর হাতলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে মুনিম খাঁ। মুখের দু'পাশ দিয়ে লালা ঝরছে। ব্যাটা সকাল বেলাতেই নেশা করে এসেছে। অস্ফুটস্বরে হাকিমসাহেব বলল।

জেটীর কাছে এসে পড়েছে জাহাজ। জেটীর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়ে পড়ছে প্রবল ঢেউ। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে হোসেন চাচা—

জয় হোসেনচাচার জয়!

আকাশ বিদীর্ণ করে জয়ধ্বনি উঠল। খাবওয়া দাস্থ, ননী সারেঙ, গোবিন্দ তুণ্ডীল জেটীর ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ালো সতর্ক সৈন্যের মতো। 'জঙ্গলা' এসে লাগা মাত্র তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে নোঙর করার যাবতীয় কাজ শুরু করবে।

এই মা·· ঝি, তোমরা সব তোমাদের নৌকো হাঁটাও। হঠাৎ বাজখাই গলায় চীৎকার কবে উঠল রামুগোঁসাই চার-চারটে মালটানা জাহাজ নিয়ে আসছে চাচা—

সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট নৌকোর মাঝিরা যে-যার নৌকো নিয়ে জেটীর থেকে অনেকদূরে চলে গেল। জনতার ভেতরে উত্তেজনার তরঙ্গ বয়ে চলেছে! আর কতক্ষণ—আর কতক্ষণ লাগবে জাহাজ জেটীতে ভিড়তে! তারা ভেতরে ভেতরে অধীব হয়ে উঠেছে।

ওই দেখ—ওই জাহাজটায় ভর্তি আরবী ঘোড়া দেখা যাচ্ছে—

আঃ, একটা ঘোড়া কিনতে পারলেই হয়—

ঘোড়া হলেই আরবের হবে নাকি? হাকিমসাহেব বলে। তাদের অজ্ঞতায় হাসে বহুদর্শী হাকিমসাহেব।

তাহলে ওগুলো কোথাকার ঘোড়া হাকিমসাহেব?

ভল্লা নদীর নাম শুনেছ কখনো?

সামাল—সামাল—এসে পড়েছে জাহাজ—

জয় হোসেনচাচার জয়!!

হর—হর মহাদেব !

আল্লাহ্ আকবর—

জেটীতে এসে দাঁড়ালো স্বর্ণমুখী।

ঠিক সেইসময় ভীড় ঠেলে একেবারে সামনে এল ভিখু। ছুটে আসার পরিশ্রমে, উত্তেজনায় সে তখন হাঁপাচ্ছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে। তার মনে হলো, কালনাগিনীর কবল থেকে সে যেন মুক্ত হয়ে এসেছে অবারিত আলো ও বাতাসে ভরা পৃথিবীতে !

হোসেনচাচা নামল।

প্রায় সাত ফিট লম্বা। তেমনি দোহরা গড়ন। দুধে-আলতা মেশানো গায়ের রঙ। মেহেদি মাখা লালচে দাড়িগুলো ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। মাথায় ফেজ টুপী। খরগোশের কানের মতো বড় বড় ছুটো কানের পিঠে বসরাই আতরে ভেজানো তুলো গোঁজা।

আদাব—আদাব ! রামুগোঁসাইকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরল হোসেনচাচা।

হাকিমসাহেব আদাব ! শক্ত করে তার হাতদুটো ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, কত করে বললাম, আপনি আমার সঙ্গে—

কেন ,অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বুঝি !

গৌড়ের সওদাগরদের ভেতরে আমিই তো প্রথম অতদূরে বাগদাদে গেলাম, গিয়ে দেখি সেখানে ভল্লা-কাস্পিয়ান উপত্যকার পণ্য আর রুশীয় ব্যবসায়ীদের একেবারে ছড়াছড়ি।

না—না হাকিমসাহেব, এখন কথা নয়, এখন কথা নয়। রামুগোঁসাই বলল, অতদূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে হোসেনচাচা, হেঁকে বলল কুলীদের, এই জাহাজের মাল আগে খালাস কর—

কি রে শেখের পো ? তুই এখানে। হঠাৎ ভীড়ের ভেতরে ভিখুর দিকে নজর পড়ল হোসেনের, মজিবর জানে, তুই এসেছিস ?

বাগদাদে আর কি কি দেখলেন চাচা ?

বলব রে—বলব—সব বলব। দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসে

হোসেন। দূরে গঙ্গার ওপরে কুয়াশাময় দিগন্তের ওপারে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ক্রুয়িম্স্কির কথা রাখতে পারলাম না।

ক্রুয়িম্স্কি কে?

আরে রাশিয়ার সওদাগরদের সঙ্গে বাগদাদে এসেছিল এক রুশীয় পণ্ডিত। আমাদের, মানে ভারতের ইতিহাস তাঁর একেবারে নখদর্পণে।

ও ক্রুয়িম্স্কি! বুঝতে পেরেছি, ভারত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল সেই ভদ্রলোক! আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিয়ে উঠল হাকিমসাহেব, ক্রুয়িমস্কির মতো মহৎ লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনার নসীব তো চমৎকার!

কেন?

আরে জানেন না, ক্রুয়িম্স্কির মতো পণ্ডিতরাই তো প্রমাণ করেছেন, রাশিয়ার ধর্মীয় উপাখ্যানে, রূপকথায় ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি আর ধ্যান-ধারণার প্রচুর প্রভাব আছে।

মাল-টাল বিক্রি-টিক্রি হবে? না কি আমরা চলে যাব? অধৈর্য জনতার ভেতব থেকে চিৎকার ওঠে।

না—না, জাহাজঘাটে বিক্রি করার মতো কোন মাল নেই। হোসেন হেঁকে বলল।

ননী, গণি, ফয়েজ, গোবিন্দ—বামুর্গোসাই চিৎকার করে বলে, তোরা মাল খালাস করার কাজে হাত দিচ্ছিস না কেন শুনি?

চাচার মুখে বাগদাদী গল্প শুনছি।

না—না, আজ কিছু নয়-আজ বিশ্রাম। হেসে হেসে সবাইকে শুনিয়ে হোসেনচাচা বলল, আসছে কাল সন্ধ্যায় আমার বাড়ির বৈঠকখানায় আসর বসাব—যার যার খুশি এস।

জনতা অনড়।

একজনও যায় না। তারা বিদেশী বিচিত্র পণ্যের আশায় দীর্ঘ

প্রতীক্ষা করেছে। কিনতে না পারুক একবার—অন্তত একবার চোখে দেখে যাবে।

মাল খালাসের কাজ শুরু হলো।

চার-চারটে বড় বড় মালবাহী জাহাজের পাটাতনের ওপর দিয়ে কুলীরা এক-একটা বড় বাক্স টেনে নিয়ে পাড়ে নামছে। কোন কোন কাঠের বাক্স এত বড় যে, ধরাধরি করে নামাতে চার-পাঁচজন কুলী মিলে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

এই বাক্সটার ভেতরে কি আছে?

রাশিয়ার ফার, মানে পশম।

আর ওটার ভেতরে?

ফ্ল্যাক্স।

মানে?

এক ধরনের নীল রঙের ফুল গাছ। এই গাছের ডালপালা থেকে ফিবার, মানে কাপড় তৈরির সুতো হয়।

আরে আরে, কাঁচের বড় বড় জারের ভেতরে ওগুলো কি?

দেখে বুঝতে পারছো না, মধু—রাশিয়ার মধু।

বড় বড় খাঁচার ভেতরে ওগুলো কি হোসেনচাচা?

কাস্পিয়ান উপত্যকার এক ধরনের শিকারী পাখি।

আরও কত রকমের বিচিত্র পণ্য—সামুদ্রিক ঘোড়ার দাঁত, হলদে রঙের জীবাশ্ম, সাইবেরিয়ার কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, তলোয়ার, তীরের ফলা আরও কত কি!

জনতার চোখে মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি।

এইবার—এইবার শেষ মালটানা জাহাজটির মাল খালাস করা হবে!

জাহাজটির নাম মন্থরা।

মন্থরা যেন শান্ত নিস্তব্ধ একটা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঢেউয়ের দোলায় দোলায় একটু একটু দুলছে শুধু।

এই মন্থরার মাল নামাতে দেরী করছে কেন? ভিখু প্রশ্ন করে ননীকে। ননী কথা বলে না। মিষ্টি মিষ্টি হাসে।

কি আছে এর ভেতরে? ভিখুর চোখদুটো কৌতূহলে জোনাকীর মতো জ্বলে। তার ইচ্ছে করছে এখুনি—এখুনি জাহাজে উঠে নিজের চোখে দেখে আসে, কি পণ্য আছে এর ভেতরে? ইচ্ছে করছে, এখুনি এই মুহূর্তে হোসেনচাচার কাছে বসে বিদেশে বাণিজ্যের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে। গৌড়ের এই গঙ্গায় জাহাজ ভাসিয়ে প্রথম কোন্ সমুদ্র পার হয়—

মোট কত চাচা? রামু হোসেনের কানের কাছে গুজ গুজ করে। হোসেন কথা বলে না। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাসে। আর রসিয়ে রসিয়ে বলে, একেবারে তাজা তাজা আর সরেস মালও—

তাই নাকি!

হোসেনসাহেব গুটি-গুটি এগিয়ে গেল মন্থরার কাছে। চোখদুটো ছোট করে তাকালো ডেকের দিকে। তারপর বিচিত্র একটা আওয়াজ করে অদ্ভুত একটা ভাষায় ডাকল, এই ও—

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল পিল পিল করে একদল জোয়ান বয়সেব মেয়ে-পুরুষ। তুষারের মতো সাদা তাদের গায়ের রঙ। চোখে কাস্পিয়ানের নীলিমা। তাদের প্রত্যেকের দেহে অটুট স্বাস্থ্যের তরঙ্গ যেন পেশীতে পেশীতে স্তব্ধ হয়ে আছে।

এরা কারা?

কেন, গৌড়ের নবাবের দরবারে কাফ্রী খোজা দেখ নি? নবাবকে ইয়া বড় পাখা নিয়ে বাতাস করছে—এরা সেইরকম ক্রীতদাস।

ভিখু দৌড়ে সামনে গেল। আশ্চর্য! মানুষগুলো যেন শ্বেতপাথরে তৈরি এক-একটা মূর্তি। ওদের চোখের পলক পড়ছে না। নীল চোখে কেমন নির্বিকার পাথরের মতো দৃষ্টি।

কী রকম দাম পড়বে ওই খাপসুরৎ লেড়কীটার, চাচাজী?

গৌড়ের স্থায়ী অধিবাসী, আরব দেশীয় বণিক চম্বন আলীর গোমস্তা ডলু মিঞা ভীড় ঠেলে ঠেলে মত্তহস্তীর মতো এগিয়ে এল।

দর-দাম এখন তোমাকে বলব না ডলু। একটু থামল হোসেন। দাড়ির আড়ালে অর্থপূর্ণ হাসির আভাস দেখা গেল, বলল, তোমার মালিককে বলে দিও, ওই লেড়কীকে তার কাছে বিক্রি করব না।

ভিখুর সারা শরীরে উত্তেজনার তরঙ্গ বয়ে চলেছে। এই সাদা সাদা রঙের মানুষগুলো কত দূর দেশ থেকে এসেছে—কত দামে আর কার কাছেই বা বিক্রি করবে! আর কত হরেক রকমের জিনিস নিয়ে এসেছে। কত দূর দেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে। হোসেনচাচাকে তার হিংসে হয়।

আমার জাহাজঘাটের 'গুদাম' খুলে দেব চাচা?

কেন?

এরা থাকবে কোথায়—এই ক্রীতদাসরা?

আমি ওদের নিজের বাড়িতেই রাখব—একটু থেমে হোসেন বলল, আজ বিশ্রাম করব, আগামীকাল সন্ধ্যার পর আমার বাড়িতে আসবেন অনুগ্রহ করে হাকিমসাহেব, গোঁসাইজীও আসবেন—

কেন?

আমার এবারের বাগদাদ সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বলব।

আমিও যাব কিন্তু হোসেন চাচা—ভিখু ব্যাকুল হয়ে বলল।

আরে—আরে—তুই ভীড় ঠেলে কোথায় যাচ্ছিস? জনতার জমাটে ভীড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ হৈ-হৈ উঠল। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে বলল, তুই মেয়েছেলে মানুষ। ষাঁড়ের মতো গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে কোথায় আসছিস?

যেখানে হোসেনচাচাকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রামুগোঁসাই, হাকিমসাহেব, ডলু মিঞা, ভিখু, গৌড়ের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়ালো আলেকচাঁদ।

ভিখুর হাত ধরে বলল, বাবু, আপনি শীগগীর বাড়ি চলুন—দাদাবাবু—

কেন রে? কি হয়েছে?

চুপ করে থাকে আলেকচাঁদ। পরনের যাত্রাদলের নর্তকীর মতো ঘাঘরাটা টেনে-টুনে ঠিক করতে থাকে।

নিশ্চয়ই বাপজান ডাকছে—না? শক্ত হয়ে যায় ভিখুর মুখখানা। কেটে কেটে বলল, যা, বলে দে আমি এখন যাব না—যেতে পারব না।

তোমার মা-র বাড়াবাড়ি হয়েছে দাদাবাবু!

অ্যাঁ! তাই নাকি?

ভিখু আর কথা বাড়ালো না। চিররুগ্না মা-র শুকনো হাড় বের-করা মুখখানা মনের ভেতরে ভেসে উঠল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

পিছনে পড়ে রইল চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাট। পড়ে রইল ঘাটের ওপরে রাশি রাশি বাক্স—বাগদাদী পণ্যের পসরা; পড়ে রইল হোসেনচাচা, হাকিমসাহেব,—যাদের মুখে সুদূর ভল্গা-কাস্পিয়ান উপত্যকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী তার কাছে বাগদাদী পসরার চেয়েও অনেক—অনেক বেশি রোমাঞ্চকর!

জেটী থেকে পাড়ে উঠে আসতে আসতে নিমাসরাইতে নিজের বাড়ির ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল ভিখুর। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, শ্বাসরোধী অন্ধকার একটা কবরে বন্দী হতে চলেছে। তবুও যায়, যেতে হয়। আম্মাকে সে ভালোবাসে। সে জানে—সে আম্মার হাড়-জিরজিরে বুকের ভেতরে প্রাণের ধুকধুকির মতো! তাই—

যায়। কিন্তু পা আর যেন চলে না। চিড়াইবাড়ির জাহাজ-ঘাটের আকাশ-বাতাস, গঙ্গার জলের কলোল্লাস সব—সব যেন অবুঝ আর উদ্দাম প্রেয়সীর মতো তাকে নিবিড় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরতে চায়।

ধীরে ধীরে পা ফেলে যেই ঘন থকথকে আচ্ছন্ন জাহাজঘাটের কালো কালো বড় পাথরে বাঁধানো রাস্তায় উঠল ভিখু, তখুনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

অদূরে একটা দীর্ঘ কালো ছায়াদেহ।

কে ওখানে?

তোমাকে সারাদিন ধরে খুঁজছি—শীগগীর বাড়ি চল—

চারিদিকের নিস্তব্ধতার ভেতরে ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল মজিবরের গলার স্বর।

॥ ছয় ॥

মহানন্দা।

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে মহানন্দা ভোঁতা ছুরির মতো ঝিকমিক করছে। আকাশে জ্বলছে তারার দীপালি। উঁচু পাড়ের ওপরে একটা শিলীভূত মূর্তির মতো বসে আছে ভিখু।

নদীর ওপর দিয়ে হু-হু করে বয়ে আসছে জোলো হাওয়া, জলে উঠছে কলরোল। ভিখুর মনের ভেতরেও চলছে তীব্র একটা আলোড়ন।

একমাসের ভেতরে নসীবনকে সাদী করে ঘর-সংসার এবং ব্যবসার কাজে মন না দিলে তাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। তার বাপজান মজিবরের কঠোর আর কর্কশ কথাগুলো তার কানের কাছে বাজতে লাগল। তার আম্মা সেই রুগ্ন শরীর নিয়েও উঠে বসেছিল—উঠে বসে-ছিল বাপ-ছেলের প্রচণ্ড বচসা শুনে। চিঁ চিঁ করে বলেছিল, খোকা, তুই তো ছোটকাল থেকেই নসুকে ভালবাসিস—সাদী করে ফেল বাবা—তাহলেই ঘরে তোর মন বসবে—তোর বাপজানও খুশি—

চুপ কর তুমি, গর্জে উঠেছিল বাপজান, আমাকে খুশি করার কথা বলছো কেন? ওর নিজের ভবিষ্যৎ নেই? একটু থেমে বলেছিল, ও ভেবেছে কি—ও কি হাকিমসাহেব, হোসেন, ওই বাউণ্ডুগুলোর মতো বারোঘাটের জল খেয়ে খেয়ে বেড়াবে, জাতজন্মো খুইয়ে আবার এসে এই বাড়ির ভিটেতে পা দেবে—তীব্র ঘৃণার ধিক্কার জ্বলছিল বাপজানের চোখে।

বিদেশে বাণিজ্য করতে গেলে জাত যায়! আশ্চর্য! শ্রীমন্ত সওদাগর, চাঁদসওদাগরের কি জাত গিয়েছিল, ধর্ম খুইয়েছিল তারা? হাকিমসাহেবের মুখে শুনেছে, হাজার হাজার বছর আগে এ দেশের সওদাগররা যেমন গিয়েছিল যবদ্বীপে, গিয়েছিল সুমাত্রায়, তেমনি

গিয়েছিল পারস্যোপসাগর পাড়ি দিয়ে বসোরায়। সেখান থেকে স্থলপথে বাগদাদ হয়ে একেবারে সেই সুদূর উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বাকুতে গিয়েছিল রাশিয়ার আস্ত্রাখানে।

বুঝলে ভিখু, আস্ত্রাখানে তো আমি অনেকদিন ছিলাম—আমি নিজে দেখেছি, সেখানকার পথে-ঘাটে হিন্দু সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের দল ; বাকুতে দেখেছি, হিন্দুদের অগ্নিদেবতার মন্দির। হাকিমসাহেবের কথাগুলো তার মনের অন্ধকারে এক-একটা ফুলের মতো ফুটে উঠতে থাকে। সেই কাস্পিয়ান-ভল্গার দেশের আরও কত বিচিত্র কথাই যে বলেন তিনি। সেসব কথা সে বোঝে না। চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না। পারবে কি করে! সেই কবে মাদ্রাসায় মৌলভীর কাছে কিছুদিন পড়েছিল। মৌলভী যে কি ছাই মাথা-মুণ্ডু পড়াতো! লোকটা পয়লা নম্বরের কূপমণ্ডুক। হাকিমসাহেব যেমন দূর বিদেশের কত কথা বলে ; সে লোকটা সেসব কল্পনাও করতে পারতো না। একদিন তার সঙ্গে ঝগড়া করেই বাপজানের ভয়ে এক বিদেশী সওদাগরী জাহাজ চেপে পালাতে চেষ্টা করেছিল সে। বেতোড়ের কাছে যেতেই তার বাপজানের দোস্ত সামসুদ্দিন জোর করে ধরে নিয়ে এল গৌড়ে। বাপজানও আর মাদ্রাসায় পাঠালো না। ব্যবসার জোয়াল চাপিয়ে দিল কাঁধে। তার মুখের ভেতরে তেতো জল কাটতে লাগল। বিদ্বেষে আর বিরক্তিতে তার মনটা বারুদের স্তূপের মতো হয়ে উঠল মনের ভেতরের পুঞ্জীভূত ঘৃণাটা ঝেড়ে ফেলার জন্যেই বোধ হয় সে হঠাৎ ফতুয়ার পকেট থেকে এক টুকরো ময়লা কাগজ বের করল।

কাস্পিয়ান উপত্যকার দেশের কথা তার মাথায় ঢোকে না বলে একদিন হাকিমসাহেব তাকে লিখে দিয়েছিল, বলেছিল, ভিখু, তুমি ব্যবসায়ীর ছেলে, ব্যবসার কথা দিয়েই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, কোন স্মরণাতীত কাল থেকেই বুখারার সওদাগররা, সেখানকার ভারতীয় বণিকরা এ দেশের পণ্য নিয়ে উটের পিঠে চেপে কাজাকস্তানের স্তেপভূমি পার হয়ে চলে যেত আস্ত্রাখানে। আবার কখনো কখনো

বুখারা থেকে তারা যেত কাসগড়ে, যেত সোজা পশ্চিমে পূর্ব তুর্কী-স্থানে—

আচ্ছা, রাশিয়ার বণিকরা আসত না ভারতে ?

আসত না আবার ? আবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে হাকিমসাহেব। শক্ত করে খাগের কলম আর কষের কালি দিয়ে এঁকে দিয়েছিল, এই দেখ তারা আসত—এই দেখছো কাজান, এই শহরটা হলো একেবারে ভল্গা নদীর ওপরে, তারা এই কাজান থেকে সোজা পূর্বদিকে টবলস্কে, টবলস্ক থেকে কাজাকস্তানের স্তেপভূমি পেরিয়ে চলে আসত বুখারায়, বুখারা থেকে কাবুলে। আর কাবুলে, কান্দাহারে, ইস্পাহানে গেলেই দেখতে পাবে সরাইখানায় একসঙ্গে হৈ-হল্লা করে দিন কাটাচ্ছে রাশিয়া আর ভারতের সওদাগরা।

আমি কি কখনো সেসব দেশে যেতে পারব হাকিম-সাহেব ?

পারবে—পারবে। কয়েক মুহূর্ত দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে বলেছিল, আচ্ছা, আমি তোমার যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করব।

আপনি !—করবেন—আমি—হাকিমসাহেবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বলেছিল, আমি সারাজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

দাদাবাবু, আপনাকে দিদিমণি ডাকছে। অন্ধকারে নসীবনের বাড়ির চাকর এসে দাঁড়ালো।

ভিখুর চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, তুমি যাও, যাচ্ছি—

নসীবনের বাড়িতে যাবে বলেই সে এসেছে। ওর সঙ্গে কতগুলো জরুরী কথা আছে। ওকে সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দেবে। হয় রাজী হবে, না হলে সে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেওয়ানা হয়ে চলে যাবে যেদিকে দু'চোখ যায়। এইবার—এইবার সে পরিষ্কার বুঝতে পারবে,

তার বাল্যসখী নসু তাকে কতটা ভালবাসে। ভেতরে ভেতরে নিদারুণ একটা অস্বস্তিতে জ্বলে যেতে লাগল সে। উঠে দাঁড়ালো আর চিৎকার করে ডাকল—হেই—ও—মা—ঝি—ই—ই—

খেয়াঘাটের নৌকো এল। ওপারে গিয়ে নসীবনের বাড়ির দবজায় দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেল ভিখু!

এ কী! এ কাকে দেখছে? অপরূপ সাজে সেজেছে নসীবন। পেঁচিয়ে পরেছে হাল্কা নীলরঙের নয়নসুখ শাড়ি। নাকে ঝিকমিক করছে সোনার ফুল। কানে দুলছে মুক্তোর দুল। আর পেলব বাহুদুটোতে শোভা পাচ্ছে সোনার কঙ্কণ। প্রায় স্বচ্ছ নয়নসুখ শাড়ির আড়ালে রূপোর চুমকি বসানো সবুজ রঙেব কাঁচুলির বন্ধনে আবদ্ধ সুডৌল বুকের আভাস পাওয়া যায়।

এত সাজের ঘটা কেন?

তুমি আসবে বলে। জলতরঙ্গের মতো তীক্ষ্ণ মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে হেসে উঠল নসীবন। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল সে। বলল, এতদিন আস নি যে বড়!

কথা বলল না ভিখু। তীব্র একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল তার মনে। কি বলবে - কি বলবে সে! হোসেন-চাচা বাগদাদ থেকে এসেছে—নিয়ে এসেছে সুদূর রাশিয়াব বিচিত্র পণ্য-সম্ভার! এসব কথা বললে মোটেই খুশি হবে না নসীবন।

কি ভাবছো? তীব্র অভিমান ঘনিয়ে এল তার দু'চোখে। কান্নায় ভাব গলায় বলল, আমাব কাছে এলেই বুঝি কথা ফুরিয়ে যায়?

নসু—ধরা-ধরা গলায় যেন অনেক—অনেকদূর থেকে ডাকল ভিখু। ধীরপায়ে নসীবনের কাছে এল। তার বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো। ফিস ফিস করে বলল, চল্ একবার বাইরে যাবি। রাশি রাশি বড় পলুর খোসা, সুতো কাটার তকলি ছড়ানো

উঠোনের চারিদিকে তাকিয়ে সে বলল, বাড়িতে দিঞ্জির ভেতরে দাঁড়িয়ে আমার কথাই বলতে ভাল লাগে না—

তুমি একথা বলবে জানি – চল—

ওরা সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে এল মহানন্দার ধারে। আকাশের তারার ঝাঁক আর রাশি রাশি নক্ষত্রের ছায়া বুকে নিয়ে দোল খাচ্ছে মহানন্দার জল।

তোমার কাছে আসতে আমার বড্ড ভয় করে!

ভয়!—কেন?

হয়তো এখুনি তোমার খেয়াল উঠবে, আর হুট করে আমাকে নিয়ে ছুটবে জাহাজঘাটে, কি জাহাজ তৈরির কাবখানায়, না হলে—

ভিখু এবার কোন কথা বলল না।

অন্ধকারে দেখতে পেল না নসীবন, ভিখুর মুখখানা শক্ত হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে বলল, তুই কুয়োব ব্যাঙ। যাকে বলে কূপমণ্ডুক, তাই তোর দু'চোখের বিষ! ওই জাহাজঘাটের মেহনতী মানুষগুলো—

তোমাকে একটা কথা বলব! ভিখুর খুব কাছে ঘন হয়ে বসল নসীবন। তরল অন্ধকারে তার চোখদুটো নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। শির শির করে উঠল ভিখুর বুকের ভেতরটা। এই নির্জন আব জনমানবহীন নদীর ধারে এই ভর সন্ধ্যায় তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছে—কি দেখে নসীবন! তাকে কি, তাকে কি কখনো—

ইস, তুমি যে কী অযত্ন করছো শরীবের! কান্নার আভাসে নসীবনের চোখদুটো থম থম করে। আরও কাছে সরে এসে হঠাৎ ভিখুর গালে একটা ফুসকুড়ি খুঁটে দিয়ে বলল, শঙ্খের গুঁড়ো মাখতে পার না—গালে এসব কি বেরিয়েছে! বলেই ভিখুর চওড়া বুকে মাথা রাখল সে। নিবিড় আদরে তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, জান, তোমার বাপজান এসেছিল—

কেন? মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল ভিখু।

অমনি বাবুর গোঁসা হয়েছিল!

না না, বল কেন এসেছিল তোমার কাছে?

তুমি বাইরে বাইরে ঘোর—দিনরাত জাহাজঘাটায় পড়ে থাক—

তার তুই কি করবি?

কোন কথা বলল না নসীবন। ভিখুর বুকে পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, পারি গো—পারি। আমি তোমার ব্যাপারে সব করতে পারি। একটু থামল সে, তীব্র একটা ব্যথা পাক দিয়ে উঠতে লাগল তার গলার কাছে। ফিসফিস করে বলল, আমি যে তোমাকে—বলেই উন্মত্ত একটা আবেগে ভিখুর মুখের ওপরে তার মুখখানা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল ভিখুর স্নায়ুতে স্নায়ুতে। তার মনে হলো—মনে হলো তার সমস্ত সত্তাকে, তার সমস্ত চেতনাকে আলোড়িত করে প্রচণ্ড বেগে ভয়ঙ্কর একটা ঝড় আসছে! রক্তের ভেতরে আগুন ধরে গেছে! নসীবন কেমন নিস্তেজ আর বিবশ একটা তরুলতার মতো তার যৌবনপুষ্ট দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছে ভিখুর শরীরে ওপরে আর গুন্ গুন্ করে বলছে, বল—আমি যা করতে নিষেধ করব—তা তুমি করবে না—করবে না—করতে পার না—

পারব নসু—পারব, তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সব করতে পারব। বলেই চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিল তার মুখাবয়ব। হঠাৎ নিজেকে সংযত করে একটু সরে বসল নসীবন। চারদিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো।

অন্ধকার নদীর বুকে সারি সারি যেন আগুনের ফুলের মতো কতগুলো আলো জ্বলছে—জেলেদের নৌকার আলো। আরও দূরে, বহুদূরে এক-এক টুকরো অন্ধকার ছায়ার মতো ধীর গতিতে চলেছে এক-একটা বজরা! দাঁড়ের শব্দ উঠেছে ঝপ-ঝপ ঝপ—

যেন বহুদূর থেকে বলল নসীবন, আচ্ছা, আমি যদি তোমার কাছ থেকে কোনদিন দূরে—অনেক দূরে চলে যাই, তাহলে তোমার দুঃখ হবে ?

বলিস কি নসু—কষ্ট হবে না ! একটু থেমে বেশ জোর দিয়ে বলল, আর তোকে দূরে চলে যেতে দিচ্ছে কে ?

তোমার ইচ্ছে কি বল তো ?

ভিখু তার কথা বুঝতে পারে না। ক্ষীণ আলোয় যেমন করে পুঁথি পড়ে তেমনি করে নসীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বুঝতে পারছো না, তুমি ঘর-সংসারের দিকে কবে মন দেবে ? কবে তোমাব বাপজানের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনা করবে ? উত্তেজিত হয়ে ঝোঁকে ঝোঁকে বলে চলেছে নসীবন, বাপজান বুড়ো হয়েছে—আর তুমি—

আচ্ছা শোন্, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস—না রে ! ভিখু যেন তার কথাগুলো শুনতেই পায় নি, বলল, আমার জন্য তুই সব করতে পারিস ?

তুমি বলছো কি ! তোমাকে ভালবাসি কি না—তা তুমি বুঝতে পার না !

শোন্ নসু—সাদী ঘব-সংসার সবাই করে—তাব ভেতরে নতুনত্ব কিছু নেই—

তাহলে তুমি আবার নতুন কি করতে চাও—

আমার কি ইচ্ছে করে জানিস নসু ?

কি ?

আমার ইচ্ছে করে···ইচ্ছে করে ব্যবসা করতে।

ব্যবসায়ীর ছেলে, ব্যবসা করতে ইচ্ছে করবেই তো। কলকল করে বলে উঠল নসীবন।

কিন্তু এই ট্যাপাজানী আর নিমাসরাই সাদুল্ল্যাপুর আর বাইশবাজার হাটে হাটে রেশম বিক্রি করা নয়—আমার ইচ্ছে করে

রামু গোঁসাইয়ের কাছে থেকে কয়েকটা জাহাজ কিনে নিয়ে চলে যাই হোসেনচাচার মতো বাগদাদে। বাগদাদ থেকে আরও—আরও দূরে তাব্রিজে বুলজারে, ভল্গা আর কাস্পিয়ানের দেশে। স্বপ্ন নেমে আসে ভিখুর চোখে। একটু থামে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখদুটো দূরে—বহুদূরে অন্ধকার মহানন্দার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, তুই আমার সঙ্গে যাবি নসু—আমরা ভল্গা-কাস্পিয়ান ছাড়িয়ে চলে যাব আরও উত্তরে, যেখানে বরফ পড়ে। নদীনালা—সাগর—সব সব—

আমি যাই—অনেক রাত হয়েছে। উঠে দাঁড়ালো নসীবন।

যেই দেশ ছেড়ে বাইরে যাওয়ার কথা বলেছি—অমনি রেগে গেলি নসু! তার হাতদুটো ধরে বলল, তোকে আমি ভালবাসি—ভীষণ ভালবাসি রে।

তাহলে তুমি আমার কথা শুনছো না কেন? কেন তুমি কালাপানি পেরিয়ে বিদেশে যেতে চাচ্ছ? কেন তুমি প্রত্যেকের মনে এত দুঃখ—বলতে বলতে নসীবনের চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। আর চোখের জলটাকে আড়াল কবার জন্যেই সে মুখ ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল।

নসু-ন-সু—শুনে যা—রাগ করিস না—ন-সু-উ-উ-উ ভিখুর হাঁকটা মহানন্দার ওপার থেকে শাঁ-শাঁ বাতাসে ভর করে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

ঘন অন্ধকারে একটা প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ভিখু।

নদীর ঢেউগুলো কলকল করে যেন তাকে উপহাস করতে লাগল আর তার চোখের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা করে চলল তার ভবিষ্যতের ছবিগুলো। তার মনের ভেতরে মজিবরের মুখ, নসীবনের মুখ ভেসে উঠল। সেই দুটো মুখের ছবি দেখতে দেখতে একটা অতিকায় ঘাতকের ভয়ঙ্কর মুখের মতো হয়ে গেল। সেই ঘাতকের হাতে চকচক করছে তীক্ষ্ণ ধারালো একটা অস্ত্র। সেই শানিত কৃপাণ তার স্বপ্নকে তার বাসনাটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে

ফেলবে! হঠাৎ তার মনে হলো, তার স্বপ্ন নেই, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই—একেবারে নিঃস্ব আর রিক্ত সে! নিতান্ত একটা দেউলিয়া মানুষের মতো বিশাল পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে!

নিঃসঙ্গ!

একক!

॥ সাত ॥

হোসেনচাচার বৈঠকখানার হলঘরে সভা বসেছে।

স্বর্ণ-খচিত বহুমূল্য বস্ত্রের আবরণ দেওয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে মাঝখানে বসেছে বাগদাদ থেকে সন্ত-ফেরত গৌড়ের বিখ্যাত সওদাগর হোসেন চৌধুরী। কানে গুঁজেছে আতর ভেজানো তুলো। বাতাসে ভুর-ভুর করছে তীব্র সুগন্ধ। তার বাঁদিকে বসেছে বহুদর্শী হাকিম-সাহেব। ডানদিকে বসে রয়েছে চিড়াইবাড়ির জাহাজ কারখানার মালিক রামু গোঁসাই। তার পরেব সারিতেই বসে রয়েছে গৌড়ের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠীরা। তার এক কোণে চুপ কবে বসে আছে গৌড়ের মহাবিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক ত্রিলোচন চক্রবর্তী।

নিস্তব্ধ ঘর।

বাগদাদী ধূপ আর বসোরাই আতরের মিষ্টি গন্ধে আমোদিত সেই স্তব্ধ বিশাল হলঘর কোন পীরেব দবগার মতো পবিত্র মনে হচ্ছে। প্রত্যেকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে হোসেনসাহেবের চিন্তা ভারাক্রান্ত মুখের দিকে। বেশ বুঝতে পারা যায় কোথায় কোথায় গিয়েছে, কি দেখেছে ঠিক কোথায় থেকে শুরু করবে সেইসব তথ্যই মনের ভেতরে ডুব দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। আর দেরী না করে হোসেনচাচা বলতে শুরু করল, শুনুন ভাইসব, গৌড়ের গঙ্গা থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে মান্নার উপসাগর পেরিয়ে মালাবার আর কঙ্কণ উপকূল ধবে বারিগাজাতে পৌঁছতেই মাস চাবেক লেগে গেল—

পশ্চিমঘাট দিয়ে যাওয়ার সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাসের প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টিতে পড়েন নি তো চাচা? ভূগোলের পণ্ডিত ত্রিলোচন এগিয়ে এসে উদ্দীপ্ত হয়ে বলে, জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি এই বাতাস

ভারত মহাসাগর থেকে আরবসাগরের দিকে যাওয়ার সময় যেই মালাবার উপকূলের পাহাড়ে—

আমরা ভূগোলের কচকচি শুনতে আসি নি।

না, পণ্ডিতমশায়, খোদাতালার দয়ায় ঝড়দুর্যোগে পড়ি নি।

তারপব কি বারিগাজা থেকে সোজা পারস্যোপসাগবে রওনা হলেন ?

হাকিমসাহেব তাড়া দেয়।

হ্যাঁ, বাবিগাজা থেকে পাবস্যোপসাগব খুব বেশি দূরে নয়। দেখতে দেখতে এসে পড়লাম ওমান প্রণালীর মুখে। দূরে আববেব মরুভূমি থেকে হু-হু করে আগুনের হল্‌কার মতো গরম বাতাস আমাদের জাহাজের ওপরে আছড়ে পড়তে লাগল।

হবেই তো, পৃথিবীর ভেতরে সবচেয়ে বেশি উত্তাপ যেখানে সেই জেকোবাবাদ শহর যে খুব কাছে—

আরে এই ভূগোলের পণ্ডিত তো আচ্ছা মুস্কিলে ফেলল দেখছি !

ওমান থেকে আমি হর্মুজ প্রণালী পার হলাম। তারপরে পারস্যোপসাগরের ঢেউ কেটে কেটে সোজা পশ্চিমমুখো গিয়ে নোঙর করলাম আবাদান বন্দরে। সেই প্রথম পারস্যের মাটিতে পা দিলাম। নতুন দেশ, নতুন মাটি, নতুন মানুষ। ভারতীয় বণিক দেখে আমাকে ঘিবে ধবল পথচারীরা—

ধরবেই তো, পারস্যের সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়িক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পর থেকেই। হাকিমসাহেব উপস্থিত সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, জেনকিনসন সাহেব নিজে দেখেছেন, বুখারার বাজারে ভারতীয় সওদাগবরা রীতিমত দাসদাসী কিনছে, কিনছে রাশিয়ান ঘোড়া আর পারস্যের রেশম।

জেনকিনসনটা আবার কে ?

জেনকিনসন সাহেবের* নাম শোনেন নি ? শ্রেষ্ঠীদের সমিতির মুখ-পাত্র সুবর্ণশ্রেষ্ঠী ধনকুমারের অজ্ঞতায় ম্লান হাসল হাকিমসাহেব। আবার চোখ বুঁজে বলতে শুরু করল, ইংরাজদের এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে রাশিয়ার ভেতর দিয়ে মধ্য-এশিয়ায় এসেছিলেন ভারতে আসার পথ খুঁজতে। তিনি পারস্যের এবং রাশিয়ার সীমানায় আস্ত্রাখান এবং বুখারা পর্যন্ত এসেছিলেন। জেনকিনসন নাকি তাঁব বিবরণে বলেছেন, গাঙ্গেয় ভূমির এবং বাংলার সওদাগররা নিয়মিত মধ্য-এশিয়ার এই ব্যবসাকেন্দ্র বুখারায় আসত।

আমরা ছাইভস্ম কিছুই বুঝতে পারছি না হাকিমসাহেব।

জেনকিনসন কেন, তিনি তো আমার এখানে আসার মাত্র কয়েক বছর আগে বুখারায় এসেছিলেন, হাকিমসাহেব তার প্রশ্নে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, আমি নিজে দেখেছি তেহরানের বাজারে ভারতীয় যাদুকর ধনেশ পাখীর কঙ্কাল, পোষা একটা ময়না আর কিছু বেশ্যামৃত্তিকা নিয়ে বেশ ব্যবসা ফেঁদে বসেছে; ইস্পাহানের এক শাহের বাড়ির ঘড়ি মেরামত করছে রুশীয় এক কারিগর। একটু থেমে সাবেকদিনেব স্মৃতি হাতড়ে হাতডে আস্তে আস্তে আবার বলল হাকিমসাহেব, তাব্রিজের বাজারে দেখেছি, ভল্গা-কাস্পিয়ান উপত্যকার ওপার থেকে রাশিয়ার সওদাগররা নিয়ে এসেছে হাজার হাজার ঘোড়া। কী অপূর্ব স্বাস্থ্য তাদের! যেমন নধর গড়ন—

বুঝলেন হাকিমসাহেব, হাকিমসাহেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হোসেনচাচা বলতে শুরু করল, তাব্রিজের বাজারে দাঁড়িয়ে আমারও তো মনে হয়েছিল, আর কোন সওদা না করে শুধু কয়েক শো ঘোড়াই কিনে ফেলি! একটু থামল হোসেনচাচা, আবার আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল, আমি ঘোড়াব ব্যাপারীদের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম—ওরা ঘোড়া নিয়ে এসেছে সেই ভল্গার ওপারের

* Jenkinson, An Early Voyages and Travels to Russia and Persia, by AJ and other Englishmen.

স্তেপ অঞ্চল থেকে। রুশীয় সওদাগররা আবার এগুলো কেনে তাতারদের কাছে থেকে।

ভিখু এক কোণে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। তার চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা থম থম করছে। কোথায় ভল্গা—কোথায় কাস্পিয়ান—কোথায় স্তেপভূমি - কত দূরে! সেখানকার আকাশ কি রকম -- কি রকম সেখানকার মাটি আর মানুষ! বহু—বহু দূরের অজানা সেইসব দেশের কতগুকলো কাল্পনিক ছবি যেন শোভাযাত্রা করে চলতে লাগল তার মনের ভেতরে। তার ইচ্ছে হয়—ইচ্ছে হয় হাকিমসাহেব আর হোসেনচাচাকে নিয়ে সারাদিন বসে বসে সে ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশের মানুষদের কথা শোনে।

আজ থেকে নয়, একাদশ শতাব্দী থেকেই তাতার সীমান্তে রুশী বেনিয়াদের ডেরা ছিল। হাকিমসাহেব উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, তাদের দালালরা সেখানে স্থায়িভাবে থাকতো। তারা তাতারদের কাছ থেকে ঘোড়া কিনে রাখতো।

ঘোড়ার ব্যবসাটা ওঁরা কেউ একা করতো না। পাঁচ-ছয়জন মিলে যৌথভাবে—

সাধারণত কতগুলো করে ঘোড়া কিনতো?

ছয় হাজার সাত হাজার ঘোড়া কিনে রাখতো—

বিক্রি করতে পারতো?

বলছেন কি! হাকিমসাহেব উত্তেজিত হয়ে বলল, তারা জোগান দিয়ে শেষ করতে পারতো না। রুশী ব্যাপারীরা ঘোড়া নিয়ে চলে আসতো কাস্পিয়ানের দক্ষিণ পাড়ে। সেখানে খোরাসান থেকে, মধ্য-এশিয়ার নানা দেশ থেকে, হিন্দুস্থান থেকে সওদাগররা যেত। তাদের কাছে—বিশেষ করে আমাদের অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ব্যাপারীদের কাছেই বিক্রি করতো তারা সবচেয়ে বেশি ঘোড়া। উত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের কাছে স্তেপ অঞ্চলের হৃষ্টপুষ্ট তেজীয়ান ঘোড়ার খুব চাহিদা ছিল।

—যাঃ বাবা, শুনতে এলাম ইউফ্রেতিস আর তাইগ্রিসের দেশ ইরাকের কথা—

পণ্ডিতমশায়, হোসেনচাচা কি বাগদাদে পাখির মতো উড়ে গিয়েছে ? গৌড়ের সুবর্ণশ্রেষ্ঠী সমিতির সম্পাদক ধনকুমার বিরক্ত হয়ে বলল, পারস্যের ভেতর দিয়েই তো যেতে হয়েছে তাকে—তাই পারস্যের আবাদান, তাব্রিজের কথা—

আচ্ছা, আমি আর কিছু বলবো না। হাকিমসাহেব বলল, হোসেনচাচা, আপনার এবারের বাণিজ্যের অভিজ্ঞতাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন তো, আমাকে আবার আরবটুলীতে রোগী দেখতে যেতে হবে—

হ্যাঁ, বলুন হোসেনচাচা, বলুন। আবাদানে নেমে তাব্রিজে গেলেন। তারপর --রামু গোঁসাই খেই ধরিয়ে দিল।

তাব্রিজ থেকে এক কাফেলার (ক্যারাভান) সঙ্গে জুটে গেলাম— তারা বাগদাদ যাচ্ছিল—

কোন্ পথ দিয়ে বাগদাদে গেলেন ?

সে এক দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ। আমরা তাব্রিজ থেকে প্রথমে গেলাম উর্মিহ্ হ্রদে—সেখানে এক সরাইখানায় এসে উঠলাম—

আচ্ছা চাচা - আপনি আবাদান থেকে তো পারস্যোপসাগর পাড়ি দিয়েই কুয়েতে ওই যে যেখানে—-

পণ্ডিতমশায়, আমি অত খরচপত্তর করে গিয়েছি ব্যবসা করতে —বড় বড় বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলোতে আগে যাবো না ? তাব্রিজে না গেলে মধ্য-এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই তো হতো না। আর—

আর তাব্রিজ কি একটা যে-সে জায়গা নাকি - আজারবাই-জানের রাজধানী। হাকিমসাহেব বলল, সেখানে শুধু ঘোড়া নাকি—এত ভাল গালিচা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। চামড়া, রুপো, তুলো, আফিং আরও বহু জিনিস সস্তায় পাওয়া যায়।

চাচা, আপনি বলুন—উমিহ্ হ্রদের সরাইখানা থেকে কোথায় গেলেন ?

এলাম বুকানে, তারপরে এথিলা হয়ে, মারিবান হয়ে তাইগ্রিস নদীর তীরে পৌঁছলাম—সেখান থেকে 'ধাও' নামে এক ধরনের নৌকো করে এলাম বাগদাদে। পথে কত রকমের লোকের সঙ্গে যে আলাপ হলো—কেউ তাতার, কেউ তাজিকী, কেউ ইহুদী, কেউ খ্রীস্টান। তারা কেউ দাসদাসী বিক্রি করছে—কেউ করছে পশম, রেশম, কেউ করছে কাঠের তৈরি নানারকমের কারুকার্য-করা পাত্র—কারো কাছে আছে শীলমাছের দাঁত—

বাগদাদে কি দেখলেন বলুন ?

বাগদাদ খুব পুরানো দিনের শহর। তাইগ্রিস নদীর ধারে বিরাট বন্দর। যেদিকে তাকাও মসজিদ আর গীর্জার চূড়ো। বাগদাদের বাজারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশের সওদাগরদের মহল্লা।

আমি একদিন রুশীয়দের মহল্লার দিকে গেলাম। ওরা বেশির-ভাগই ঘোড়ার কারবারী—তাদের একজনের তাঁবুতে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম।

কেন ?

আপনাকে আক্রমণ করল ? ওদের ভেতরে কেউ কেউ কিন্তু কশাকস—ডাকাতি, রাহাজানি ওদের পেশা। ওরা চাষবাস করে না। শুধু ভল্গার উত্তরের দেশ থেকে মেয়েপুরুষ ধরে ধরে এনে ইরাকে ইরাণে, আফগানিস্তানের মুসলমান রাজাদের কাছে বিক্রি করে চড়া দামে।

আমীর খসরু বলেছেন, বাগদাদের রাজ-চিকিৎসক হাকিম পানাউল্লার কাছেই বেশ কয়েকটা শ্লোভাক মেয়ে—অর্থাৎ কয়েকটা ক্রীতদাসী ছিল।

এতগুলো মেয়ে দিয়ে পানাউল্লা কি করতো ?

সাদা সাদা রঙের আর বরফের মতো ঠাণ্ডা মেজাজের মেয়ে-গুলোকে খরগোসের বদলে নানা গবেষণার নমুনা হিসেবে ব্যবহার করতো।

আরে রুশীয় সওদাগরদের তাঁবুতে ঢুকে চাচা কি দেখলেন, সেটা আগে ওঁকে বলতে দিন না হাকিমসাহেব -

আমি তাঁর তাঁবুতে পা দিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, তাঁবুর গায়ে টাঙানো একটা ছবি। ছবিটা আমাদেরই দেশের এক মহাপুরুষের। সেই পরিচিত সৌম্য মূর্তি--

নিশ্চয়ই গৌতম বুদ্ধের* ছবি, হাকিমসাহেবের চোখদুটো চিকচিক করে উঠল।

হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, ভগবান বুদ্ধের চারিদিকে মার-এর দৌরাত্ম্যের সেইসব ভয়ঙ্কর ছবি! সেই ঝড়-দুর্যোগের ভেতরে চুল এলো করে কালো কুৎসিত ডাইনী মেয়েরা নাচছে। আকাশ থেকে বাজ ছুঁড়ছে—

বুঝতে পেরেছি, আপনি যেটা দেখছেন, ওটা ছবি নয়, আমার মনে হয় ছবিটা রাশিয়ার কোন গীর্জার ছবি। এই ছবিকে ওরা 'ইকন' বলে।

সেটা আবার কি?

ওই যে ক্রুয়িম্স্কির কথা বলেছিলাম না, তিনি এবং তাঁর মতো আরও ভাবত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কয়জন রুজেন, ক্র্যাচকোভস্কিদের উদ্যোগেই বুদ্ধ জাতকের বিভিন্ন কাহিনীর ছবির এই ইকন চালু হয়েছিল। একটু থেমে পরম পরিতৃপ্তিতে চোখ বুঁজে বলল হাকিম-সাহেব, আপনারা তো দেখেন নি সেসব ছবি, শুধু আমাদের দেশ নয়, পারস্য এবং মধ্য-এশিয়ার সঙ্গেও যে রাশিয়ার বহু যুগের সম্বন্ধ ছিল তারও আভাস আছে আরও অনেক ইকনের ছবিতে।

* পি এম কেম্প রচিত "ভারত-রুশ"—পৃষ্ঠা ৯।

পারস্য-টারস্কের কথা ছাড়ুন, আমাদের দেশের সঙ্গে রাশিয়ার সম্বন্ধের কথা বলুন হাকিমসাহেব। ত্রিলোচনের চোখত্নটো আগ্রহে জ্বলজ্বল করে।

বলছি—বলছি, বহুযুগ আগে আমাদের সঙ্গে যে রাশিয়ার যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় লেখা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা বই।

তার নাম?

'সোনার দেশ ভারতবর্ষের গল্প'।

তাই একদিন তাইগ্রিস নদীর ধারে বিকেলে বেড়াতে গিয়েছি, হাকিমসাহেবকে বাধা দিয়ে হোসেনচাচা বলল, হঠাৎ দেখি রুশীয় বেনিয়ারা খেজুরগাছের এক বাগানে গানের আসর বসিয়েছে। আমাকে দেখেই তো খুব সমাদর করে তাদের মাঝখানে বসালো, বলল, শুনুন, আপনাদের দেশ ভারত নিয়ে গান বেঁধেছি। বলেই শুরু করল গান। বেজে উঠল বিচিত্র সব বাজনা। গানের কথাগুলো আমার কিছু কিছু মনে আছে—

শোন-শোন সে এক সোনার দেশের ইতিকথা
সেখানকার রাস্তাঘাট বাড়িঘর সোনা দিয়ে গাঁথা॥
তাদের সুদৃশ্য প্রাসাদগুলো যেন মর্মর পাথরের শ্বেতহস্তী।
সেখানকার আকাশে বাতাসে শুধু সুখশান্তি আর স্বস্তি।
শোন-শোন ভাইসব সে এক সোনার দেশের ইতিকথা—

ও, আরে আশ্চর্য তো! 'সোনার দেশ ভারতবর্ষের গল্প' বইখানাতেই তো আছে বলে মনে হচ্ছে এই কথাগুলো।

থাক, থাক হাকিমসাহেব, এখানে এসব কথা কেউ বুঝবে না। হোসেনচাচা তাকে হাত তুলে থামতে বলল। বিস্ময়ের কুয়াশায় ভিখুর চোখত্নটো ছটফট করে। বলল, কিন্তু আমাদের দেশের ঐশ্বর্যের আর সমৃদ্ধির কথা জানল কি করে রাশিয়ার লোক? উৎসাহে উদ্দীপনায় তার মুখখানা জ্বলজ্বল করে।

আরে সে অনেক কথা। একটু থামল হাকিমসাহেব। চোখ-দুটোয় কেমন একটা সুদূর দৃষ্টি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে যেন অনেক—অনেকদূর থেকে বলল, বুঝলে ভিখু, তুমি যদি কখনও ভল্গা আর কাস্পিয়ানের ওপারে কোন গ্রামে যাও, কিংবা যদি যাও সেই বরফে ঢাকা সাইবেরিয়ার গভীর বনে, তাহলে সেখানকার কৃষক এবং কাঠুরের মুখে একটা অদ্ভুত গান শুনতে পাবে—

কী গান ?

সেটা রাশিয়ার লোকসঙ্গীত বলতে পার—তার কথাগুলো তো তুমি এইমাত্র হোসেনচাচার মুখে শুনলে।

কী আশ্চর্য !

সে এক মজার কথা—রাশিয়ার সেই প্রাচীন লোকগাথার নায়ক হলো ডিউক স্টেপানোভিচ* নামে এক বিত্তশালী বিদেশী বীর। সে ভারত থেকে বেড়িয়ে ফিরে গিয়েছিল রাশিয়ায়। সে গিয়ে বলেছিল আমাদের দেশের অঢেল ঐশ্বর্যের কথা।

আর কি কি বলেছিল হাকিমসাহেব ? ভিখু উৎসাহে উঠে দাঁড়ায়।

বলেছিল ভারতেব বড় বড় নগরের রাজপথে পথে রাজকীয় আর নানারঙের পোশাকে সেজে রাজপুরুষরা ও বীররা তাদের যাদু ঘোড়ার (ম্যাজিক হর্সের) পিঠে চড়ে চলেছে। তাদের চওড়া ও বলিষ্ঠ কাঁধে ঝুলছে তূণ - সেই তূণের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে আরবের মরুপাখি ফোয়েনিক্সের পালক লাগানো ঝাঁক ঝাঁক তীক্ষ্ণ তীর ! একটু থামল হাকিমসাহেব। মাথা নীচু করে বলল, সব দেশের লোকগাথার ভেতরে যেমন একটু অতিরঞ্জন থাকে, তেমনি এখানেও আছে। আর তা ছাড়া যুগ-যুগান্তর ধরে বিভিন্ন কবির নানা-রকমের রঙীন কল্পনা মিশে মিশে সেই ডিউক স্টেপানোভিচের

* পি. এম. কেম্প রচিত "ভারত-রুশ"—পৃষ্ঠা ১-৩ ।

ছড়াকে আরো বেশি কাব্যমণ্ডিত আর অতিরঞ্জিত করে তুলেছে।

আর কি আছে তাতে তাই বলুন হাকিমসাহেব ?

বলেছে ভারতের বিভিন্ন শহরের রাস্তাগুলো দামী সুগন্ধী চন্দন কাঠ দিয়ে মোড়া। রাস্তা ধরে হাঁটলে বাতাসে চন্দনের সুগন্ধ পাওয়া যায়। আবার কোন কোন রাস্তা মাখনের মতো নরম কাপড়ে ঢাকা। রাস্তা ধরে পথিকরা চলেছে। তার আগে ঝাড়ুদাররা রাস্তা ঝাড়ু দিতে দিতে চলেছে। পথের দু'পাশে দেবদারুবীথি। তার ডালে ডালে ঝুলছে সোনার ফুল। সেই দেবদারুর সারির পরেই সুবর্ণবিপণি —মানে সোনার দোকান—সেখানে থরে থরে সাজানো আছে বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার। থামল হাকিমসাহেব, একটু পরে আবার বলল, ভারতের বিপুল প্রশংসার পাশাপাশি আবার রাশিয়ার নিন্দাও আছে সেই লোকগাথায়।

কি রকম ?

কীয়েভের (রাশিয়ার একটা প্রাচীন শহর) রাজপথে এত ধুলো যে, পথ চলা যায় না। রাজপুরুষদের সবুজরঙের চামড়ার জুতো নোংরা হয়ে যায়।

আশ্চর্য তো, কশাকদের দেশ সম্বন্ধে এত নিন্দা ? ভিখুর চোখ বিস্ময়ে ছটফট করে

শুধু কি তাই ? লোকগাথার কবি বলছেন, রাশিয়ার রাজপুরুষদের খাওয়ার টেবিলে যে 'ভদ্‌কা' তা অখাদ্য পানীয়, পাঁউরুটিতে দুর্গন্ধ। কিন্তু স্টেপানোভিচ বলেছে, তার মা তাকে যে সুমিষ্ট আর নরম কেক খেতে দেয়—সেই উৎকৃষ্ট কেক থেকে ভুরভুর করে বেরোয় সিরাজীর তীব্র সুগন্ধ।

এখনও বাগদাদের রুশীয় বেনিয়াপল্লীর ব্যবসায়ীদের কথাবার্তায় দেখেছি আমাদের দেশের সমৃদ্ধির সম্বন্ধে ওদের অবিশ্বাস্য ধারণা।

হোসেনচাচা বলল, একদিন গণচারোভ নামে ঘোড়ার এক ব্যাপারীর তাঁবুতে গিয়েছি—

আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল? ভিখু যেন গিলছে।

হ্যাঁ—আমি তার কাছ থেকেই তা পাঁচশো ঘোড়া কিনেছিলাম। একটু থেমে বলল চাচা, আর কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী একলা এতগুলো ঘোড়া কেনে না সচরাচর। তাই আমাকে খুব খাতিরযত্ন করতো গণচারোভ। তার ওখানে গেলেই ভদ্‌কা খাওয়াতো—খাওয়াতো দুম্বার মাংস, ভেড়ির দুধ—

আচ্ছা, খাওয়া-দাওয়ার কথা পরে হবে, ঘোড়ার ব্যবসাটা কিভাবে করতো?

আমি আগেই বলেছি ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসায়ীকে ওরা ঘোড়া বিক্রি করতো না। চার, পাঁচ কি ছয়জন রুশীয় ঘোড়ার ব্যাপারী যৌথভাবে প্রায় ছয়হাজার কি সাতহাজার ঘোড়া সংগ্রহ করে বিক্রি করতো কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছে। তারপর কোন কাফেলার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে গোর্মুজ প্রণালীতে। সেখান থেকে আরবসাগরের তটভূমি ধরে একেবারে সেই ঘোড়ার পাল চলে যেত পাঞ্জাবের মুলতানে।

আচ্ছা, গণচারোভের তাঁবুতে গিয়ে কি হলো তাই বলুন হোসেনচাচা! রামু গোঁসাই অধৈর্য হয়ে ওঠে।

ও হ্যাঁ, হঠাৎ কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল গণচারোভ, আচ্ছা, আপনাদের দেশের ধোপা-নাপিত পর্যন্ত নাকি সোনার চুমকি বসানো মখমলের জামাকাপড় পরে আর ঘোড়া গোরু যে পাত্রে জল খায়—সেগুলো সব নাকি সোনার তৈরি। একটু থেমে মাথা চুলকোতে লাগল হোসেনচাচা।

পুরানো কথা মনে করার চেষ্টা করে বলল, ও হ্যাঁ—বলেছিল, আপনাদের দেশে নাকি চাকর-খানসামারা শুধু দামী জামাকাপড় পরে বসে বসে পাশা খেলে?

হো-হো করে হেসে উঠল উপস্থিত প্রত্যেকে। হাসির ঝড় বয়ে গেল সভায়। হোসেনচাচা বলল, আমিও গণচারোভের কথা শুনে এইরকম করেই হেসে উঠেছিলাম।

আমাদের দেশের ধনসম্পত্তির প্রাচুর্য সম্বন্ধে ওদের এই অবিশ্বাস্য ধারণার কারণও কিন্তু সেই ডিউক স্টেপানোভিচের প্রাচীন লোকগাথা—হাকিমসাহেব আবার বলে উঠল, ল্যাটিনভাষায় প্রথম লিখেছিল প্রিস্টার জন, তারপর ভারতের ঐশ্বর্যের বিবরণের এই গ্রন্থখানা স্লাভো-সাবিয়ান ভাষায় (শ্লোভাক ভাষা) অনুবাদ করা হয়। তারপর যুগে যুগে কত রুশীয় কবির নিজস্ব কল্পনার রঙ চড়েছে তাতে, কত অনুবাদকের রূপান্তরের ভেতর দিয়ে কত শতাব্দী পার হয়ে গেছে।

স্টেপানেভিচের ছড়া ছাড়া আর কিছুব সূত্রে রুশীয়রা আমাদেব দেশের কথা জানতে পারে?

হ্যাঁ, ইবন খুরদাধবিহ* নামে এক মুসলমান ঐতিহাসিকের বইতে পাওয়া যায়। রুশীয় ব্যবসায়ীরা নবম ও দশম শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়ার রুক্ষ ন্যাড়া পাহাড় আর উষর প্রান্তর পেরিয়ে চীনে বাণিজ্য করতে যেত। আবার যেত আফগানিস্তানের বলাখ শহরে- সেখান থেকে বুর্জিলা গিরিপথ পেরিয়ে পৌঁছত ভারতে—হঠাৎ থেমে গেল হাকিমসাহেব। কেন যেন তার চোখমুখে তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। হঠাৎ হোসেনচাচাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, বাগদাদে কি তাব্রিজে গাছ-গাছড়ার ওষুধের খোঁজে ঘুরছে এমন কোন রুশীয় চিকিৎসককে দেখেছেন?

না হাকিমসাহেব—

আমি একজনকে জানি যে টবোলস্ক থেকে বুখারা হয়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে তিব্বতে যায়। তিব্বতী পুরোহিতদের (চিকিৎসক) কাছে বনৌষধি খুঁজে বেড়ায়—

* পি. এম. কেম্প রচিত "ভারত-রুশ"—পৃষ্ঠা ৬৪।

ইস – অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল ভিখুর মুখ থেকে। ভেতরে ভেতরে যেন তীব্র যন্ত্রণায় পুড়ে যেতে লাগল।

কি শেখের পো –তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে কি? হোসেনচাচা ভিখুর যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। হেসে বলল, খিদে পেয়েছে বুঝি?

উঠে দাঁড়ালো হোসেনচাচা। কিন্তু মুখে হতাশার ছায়া নামল। তার অন্তঃপুরের চিত্রটা তাকে পীড়িত করে তুলল। হয়তো তার এই সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ির কোন অন্ধকারে কোণে মুখ গুঁজে বসে আছে জুলিয়া! সে দেশের মাটিতে পা দেওয়ার পর একটা কথাও বলে নি—একটা কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত করে নি। অতএব—

হাঁক দিল—ব—ছি—র—

তার খাস খানসামা বছির এল। তাকে ইঙ্গিত করতেই সে ভেতরে গেল।

চারিদিক নিস্তব্ধ।

কয়েকমুহূর্ত পরে বছির ফিরে এল। তার সঙ্গে এল পাঁচজন সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী দাসী। তাদের প্রত্যেকের হাতে পিতলের তৈরি বড় বড় এক-একটা পরাত। তার কোনটার ভেতরে নারকেলের রাশি রাশি নাড়ু, কোনটার ভেতরে চিনিকলা, ফেনী ক্ষীর, খণ্ডখই, আবার একজনের হাতে এক কাঁদি মজে যাওয়া মর্তমান আর পরাতে পরাতে মনোহরা, মতিচুর আর খাসামৃত খণ্ড—

মহাশয়রা সামান্য একটু জলযোগ করুন। হাতজোড় করে বলল, হোসেনচাচা। ভিখুর মুখের দিকে ইঙ্গিত করে আস্তে আস্তে বলল, শেখের পো-ও খাও—তোমার খিদে লেগেছে—

বলছেন কি চাচা, ভিখু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। দাঁতে দাঁত চেপে ধীরে বলল, সব সময় আপনারা আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। কে বলেছে আমার খিদে পেয়েছে? তীব্র উত্তেজনায় তার শরীরের সব

রক্ত যেন মুখে এসে জমা হয়েছে, আপনি আর হাকিমসাহেব দেখে এসেছেন বাগদাদ, আবাদান, তাব্রিজ—কত দূরের সেইসব দেশ ঘুরে এসেছেন—কত মানুষ দেখে এসেছেন—আমার ইচ্ছে করছে এখুনি—এখুনি ছুটে যাই মধ্য-এশিয়ার ওইসব দেশ পার হয়ে সেই ভল্গা আর কাস্পিয়ানের দেশে।

পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে হে—মরিবার তরে। কে একজন শ্লোক কাটল। আর সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

সে কী! আপনারা বিদ্রূপ করছেন কেন? হাসছেন কেন? আমি কি—ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে ভিখুর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। দারুণ যন্ত্রণায় থর থর করে কাঁপতে লাগল। তীব্র অস্ফুট স্বরে বলল, আমি কি—আমি কি হোসেনচাচার মতো বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতে পারি না? বলতে বলতে তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

খট্‌-খট্‌-চাচার চারমহলা বাড়ির দোতলার অলিন্দ থেকে জাফরিটা সরে গেল। এইখান থেকে নীচে বৈঠকখানার হলঘরটা দেখা যায়। সেখানে জুলিয়াবিবির প্রতিমার মতো সুডৌল মুখখানা উঁকি দিল।

কিন্তু তার দুটো কালো ডাগর চোখে তীব্র আক্রোশ ঝরছে।

আর একটিও কথা না বলে আগুনে পোড়া একটা সাপের মতো যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বেরিয়ে গেল ভিখু।

হলঘরে তখনও হাসির হুল্লোড় চলেছে। তার মনে হলো, কারা যেন একসঙ্গে তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে অনেকগুলো পেতলের বাসনে আঁচড় কাটছে। আর বাতাসে ভেসে এল মর্মান্তিক বিদ্রূপের কথাগুলো—ট্যাপাজানীর হাটের রেশমের ব্যাপারীর ব্যাটা যাবে কাস্পিয়ানের দেশে হে—

আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। তুমি দুঃখ পেও না। খপ করে তার একখানা হাত ধরে ফেলল সেই রহস্যময়ী সুন্দরী তরুণী। ডালিমের দানার মতো দুটো ঠোঁটে ঝিলিমিলি হাসি ফুটিয়ে বলল, আমি চাচার হলঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে সব শুনেছি।

ভিখু কোন কথা বলল না। তার মাথার ভেতরে তখনও আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে। আর তার চেতনার ভেতরে নিদারুণ একটা যন্ত্রণা তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। তবুও মুখ তুলে তাকালো সেই অপরিচিত সুন্দরীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে। তার মনে হলো— যেদিন বাগদাদ থেকে হোসেনচাচার এখানে এসে পৌঁছনোর কথা ছিল, সেইদিন এই রমণী তাকে চিড়াইবাড়ির বন্দরের ঘাটে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু কে এই তরুণী?

কেন চাচার বাড়ির বৈঠকখানায় আড়ি পেতে সব শোনার আগ্রহ, কিন্তু কেন ভেতরে যেয়ে চাচার সঙ্গে দেখা করে না? কেন তার কাছে বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসে--কিসের আকর্ষণে? কি চায় তার কাছে? কে এই মহিলা? পরনে মেঘ-ডম্বুর নীলাভ শাড়ি, কোমর বেড় করে ঘাঘর কিঙ্কিনী, গলায় দুলছে মুক্তোপ্রবালের মণিময় হার, দেখেশুনে মনে হয় খুব বড় ঘরের—

কি গো, ভিরমী খেয়ে যাবে মনে হচ্ছে! কি দেখছো অমন করে, কে তুমি?

পরে সব জানতে পারবে। চল গঙ্গার ধারে—একটু বসি।

পরমস্নেহে ভিখুর শক্ত হাতটা নিজের নরম হাতের ভেতরে টেনে নিয়ে ধীরপায়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে হাঁটতে লাগল। ভিখুর দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারা। দুটো চোখে কেমন সুদূর আর স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠল সেই রহস্যময়ীর সুর্মাটানা দুটো চোখে। যেন বহু বহু দূর থেকে অস্ফুট স্বরে বলল, দূর সমুদ্রপারের দেশে

বাণিজ্য করতে যাওয়ার তোমার খুব ইচ্ছা—না? বলেই ভিখুর হাতটা আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল।

ভিখু কথা বলল না। কে এই সুন্দরী? কি—কি বলতে চায় সে? তার মনের ভেতরে ভেসে উঠতে লাগল এক-একটা মুখের ছবি, নসীবন, জুলিয়াবিবি। নসীবন চায় তাকে সংসারী করতে আর জুলিয়াবিবি তার ঘা-খাওয়া জীবনের অবদমিত কামনার আগুনে তাকে পুড়িয়ে মারতে চায়! হঠাৎ তার মনে হলো মনে হলো—মেয়েরা পুরুষের জীবনের দুর্বার গতিকে বিশ্বাস করে না। ওরা শুধু পায়ে বেড়ি পরিয়ে সংসারের কয়েদখানায় বন্দী করে রাখতে চায়। কিন্তু এই মেয়েটি তো—

সে কি গো, বোবা হয়ে গেলে শেখের পো—তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে এলাম। কেমন ভার-ভার শোনালো সেই অপরিচিত সুন্দরীর গলার স্বর। ভিখু বলল, কে তুমি—কি তোমার পরিচয় সে-সব আগে বল—

সেই রহস্যময়ীর ডালিমের দানার মতো ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটল। আর সুর্মাটানা দুটো বড় বড় চোখে চাপা কান্না থম থম করতে লাগল। দূরে গঙ্গার বিশাল জলরাশির দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমি—দূর সমুদ্র পার হয়ে যারা বিদেশে বাণিজ্য করতে যায় তাদের এত খোঁজখবর রাখ—আর আমাকে চেন না?

মানে—তুমিও কি সওদাগর—

বাতাসে গঙ্গার একটানা কলোল্লাসকেও ছাপিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল সে। ভিখুর হাত দুটো নিজের নরম সুডোল হাতের ভেতরে টেনে নিয়ে বলল, তুমি—তুমি বড্ড ছেলেমানুষ শেখের পো—

মস্করা করো না বলছি, কে তুমি বল?

আমার পরিচয় জানলে তোমার হয়তো ভাল লাগবে না।

বিষাদের ছায়া ভেসে উঠল তার সুন্দর মুখে। আবার থেমে থেমে অস্ফুট স্বরে বলল, হয়তো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

দূরে চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটের আলোর তীব্র রশ্মি একটা সরলরেখার মতো প্রসারিত হয়ে গিয়েছে অন্ধকার গঙ্গার বুকে। জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই আলো ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে দূরে অন্ধকারে। নিকষকালো ছায়ার এক-একটা টুকরোর মতো এক-একটা নৌকো সেই আলোকিত রেখার মাঝখানে এসেই আবার যেন কোন্ সুদূর আর অন্ধকারময় রহস্যের রাজ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভিখুর মনে হলো—

মনে হলো তার পাশের এই সম্পূর্ণ অপরিচিত রমণীও যেন কোন অজানা রহস্যের রাজ্য থেকে তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। কৌতূহলে জ্বলে যাচ্ছে তার মনের ভেতরটা। কিন্তু একটুও বিরক্তি আসছে না—কোন বিতৃষ্ণার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে না তার মন। তবে কি সে সুন্দরী বলে? নসীবন, জুলিয়াবিবিও তো সুন্দরী—না, খাপসুরৎ চেহারার মেয়েদের ওপরে তার কোন আকর্ষণ নেই। তবে—

শোন, আমি যেই হই তোমার বিদেশে যেয়ে বাণিজ্য করার ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারি।

সে কী!—কেমন করে? ভিখুর চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

দেখ কালাপানি পেরিয়ে দূর দেশে যাওয়ার ব্যাপারে প্রথম সমস্যা হলো জাহাজ। তুমি সরাসরি জাহাজ কিনতে পারবে?

আমার টাকা কোথায়? ব্যবসার পুঁজিপাটা সব—সব বাপজানের হাতে। বাক্সের চাবিটা পর্যন্ত বুড়ো ট্যাঁকে করে ঘোরে।

তুমি এখনও নাবালক, খুক্ করে হাসল সে। আবার বেশ পাকা বৈষয়িক লোকের মতো ভেবে-চিন্তে বলতে শুরু করল, দেখ, গৌড়ের বন্দরে বহু বিদেশী বণিক, যেমন ধর, মূররা (আফ্রিকার

বণিক), পর্তুগীজ সাহেবরা বাণিজ্য করতে আসে। তারাও মাঝে মাঝে পুরানো জাহাজ বিক্রি করে। একটু দর-কষাকষি করলে বেশ সস্তায়ও মিলতে পারে।

আশ্চর্য! তুমি মেয়েমানুষ—জাহাজ-টাহাজের এত ভেতরের কথা জানলে কি করে!

জানি গো জানি শেখের পো, ভিখুর চিবুকটা জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে হেসে উঠল সে, জাহাজ সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জানি—একটু থেমে আবার উদাস গলায় বলল, সমুদ্দুরের বুকে জাহাজে জাহাজে আমার জীবনের অনেকদিন কেটেছে গো—একটু থেমে আবার বলল, আর দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, তোমার যদি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকে তাহলে তুমি গঙ্গার ওপারে রাজমহলের বন ইজারা নাও, কাঠ কাটাও। তারপরে জাহাজ তৈরির পাকা কারিগর ওই কুশাইকে দিয়ে হয় যুক্তিকল্পতরুর*, না হয় শিল্পসংহিতাব নির্দেশ অনুযায়ী তোমার মনের মতো করে জাহাজ বানাও।

একটাও কথা বলে না ভিখু। তার চোখে শুধু অগাধ বিস্ময়। জাহাজ সম্বন্ধে এই অপরিচিত স্ত্রীলোকটির জ্ঞানের বহরটা জরীপ করার জন্যই প্রশ্ন করে, কুশাইয়ের মুখে যুক্তিকল্পতরুর কথা শুনেছি, কিন্তু শিল্পসংহিতার মতে কি রকম জাহাজ হওয়া উচিত!

ফিক করে হেসে ফেলল সে। ভিখুর হাতের ওপর আলতো করে হাত রেখে বলল, আমাকে কি তুমি কুশাই ওস্তাদ ঠাওরালে না কি গো? একটু থেমে আবার বলল, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ—আমি কি অতশত জানি? তবে সমুদ্দুরে আর বন্দরে ঘুরে ঘুরে জেনেছি, শিল্পসংহিতায় না কি জাহাজে রঙ করার নির্দেশ আছে।

কি রকম?

চার মাস্তুলের জাহাজের রঙ হবে সাদা; তিন মাস্তুলের হবে লাল, দুই মাস্তুলের হলুদ—

*মধ্যযুগে বাঙ্গালা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ.—৩২৯

বাব্বা! অনেক কিছু জ্ঞান দেখছি। আবার একটু যেন নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল ভিখু, কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ হয়ে বন্দরে বন্দরে ঘোর কেন—সেকথাটা তো বলছ না—

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল সে, তার হাসির আকস্মিক শব্দটা চারিদিকের নিস্তব্ধতার ভেতরে একটা চাবুকের মতো লিকলিক করে উঠল। বলল, একদিন তুমি জানতে পারবে সব। বলতে বলতে ভিখুর ধারালো সুন্দর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর দেখতে দেখতে তার চোখে কেমন একটা মুগ্ধ তন্ময়তা থমথম করতে লাগল।

কি দেখছ অমন করে?

শোন, যেমন করেই হোক তোমাকে কালাপানি পেরিয়ে বিদেশে যেতে হবে—হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সে, বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করব আমি তোমার সঙ্গে যাব সেই দূর দেশে। তার কণ্ঠস্বরের ওপরে যেন তার বশ নেই। তীব্র উত্তেজনায় যেন ঝেঁকে ঝেঁকে বলছে কথাগুলো। দেখ, যাওয়ার পথে অনেক—অনেক বাধা আসবে, তোমার মা-বাবা বাড়ি-ঘর-সংসার, তোমার পরিচিত পরিবেশ তোমাকে পিছুটান দেবে—গৌড়ের সওদাগররা, যারা সমুদ্র পেরিয়ে দূর দেশে বাণিজ্য করতে যায়, যেমন হোসেনচাচা, সুবর্ণশ্রেষ্ঠী ধনকুমার, মুক্তো ব্যবসায়ী রিয়াজ আলী, আফগান-পাঠান-মূররা তোমাকে প্রচণ্ড বাধা দেবে।

ওরা যেখানে যেখানে যায়, আমি যদি সেখানে না যাই? ভিখুর বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজছে। তার দেহের শিরায় শিরায় যেন উত্তেজনার স্রোত তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। দূরে তমসাস্তীর্ণ গঙ্গার বুকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, হোসেনচাচা গিয়েছে বাগদাদ পর্যন্ত, আমি—আমি যাব বাগদাদ ছাড়িয়ে আরও—আরও উত্তরে, তাব্রিজে। যাব বুখারা পেরিয়ে তাকিস্তান হয়ে কাস্পিয়ান সাগরের ওপারের সেই অজানা দেশে। বলতে বলতে তার চোখদুটো কেমন সুদূর আর স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা কাণ্ড

করে বসল সেই রহস্যময়ী। ভিখুর চওড়া বুকে তার ঘন চুলে ভরা মাথাটা ঘষতে লাগল জোরে জোরে। আর নরম মোমের মতো দুটো হাত দিয়ে পরম আদরে তাকে জড়িয়ে ধরে যেন অনেক -- অনেক দূর থেকে ফিসফিস করে বলল, পারবে—তুমি পারবে যেতে—আমি যেমন করে পারি তোমাকে জাহাজ জোগাড় করে দেব।

তুমি যেই হও না কেন, আর পাঁচটা মেয়েছেলের মতো সমুদ্রযাত্রার নামে রেগে ওঠো না। ভিখু তার নরম সুগন্ধী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল।

আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে তোমার আবার আলাপ-পরিচয় আছে নাকি ? হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সে। ভিখু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না - না, তেমন কিছু নয়, হোসেনচাচার বিবি—

সর্বনাশ করেছো—জুলিয়ার সঙ্গে খবরদার মেলামেশা করবে না। যেন তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সে। বলল, জুলিয়া সাংঘাতিক মেয়েমানুষ ! একটু থামল সে। ভিখুর মনে হলো এই অপরিচিত অথচ তার শুভাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীলোকটির মনের ভেতরে কি নিয়ে যেন নাড়াচাড়া চলছে। রহস্যময়ী আবার বলল, তোমার মতো উদ্যোগী পুরুষ যদি সমুদ্র-বাণিজ্যে না যায়, তবে যাবে কে ? তোমাকে তো বলেছি বাধা আসবে অনেক, কিন্তু কোনরকম বাধাকে বাধা বলে মনে করবে না।

এত কথা বললে, কিন্তু তোমার পরিচয়টা বললে না—

ব্যস্ত হচ্ছো কেন, পরে—পরে জানতে পারবে। অবশ্য আমার আসল পরিচয় জানতে পারলে হয়তো আমার কোন সাহায্যই আর নেবে না। কিন্তু সেসব পরের কথা।

কিন্তু আমার সমুদ্র-বাণিজ্যে তোমার এত আগ্রহ কেন ?

কিছু বলল না সে। নিঃশব্দ পায়ে কাছে এল। ভিখুর বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো। তার পেশীবহুল দুটো কাঁধের ওপর হাত দুটো রেখে বলল, বুঝতে পারছো না, কেন এত আগ্রহ ?

বিস্ময়ের কুয়াশায় ভিখুর চোখদুটো ছটফট করে। অস্ফুটস্বরে বলল, সেই ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে যেতে যে সাহায্য করবে সে অবশ্য আমার আপনার লোক—

হ্যাঁ, এই কথাটিই সার জেন। শোন, তুমি তৈরি হও, এখন বৈশাখমাস। গ্রীষ্মকাল। দেখতে দেখতে বর্ষা আসবে, কেটেও যাবে। শরৎকালেই আমাদেব সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। বলতে বলতে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। আবার বলল, শোন, গৌড়ের মসনদে এখন খন-ই-জাহান—ঐ যে গো যার নাম হোসেনকুলী বেগ, তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছেন রাজা টোডরমল্ল। আসলে তিনিই চালাচ্ছেন সব কিছু। আমার মনে হয় কাস্পিয়ানের দেশে যাব বললে তারা কিছু সরকারী সাহায্য করতে পারে, তারপরে বিদেশী জাহাজের সওদাগরের কাছে খোঁজখবর করতে হবে। বলতে বলতে সে দূরের অন্ধকার রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল।

চিৎকার করে বলল ভিখু, আবার কখন কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে—এ—

পরশুদিন এইসময় রামুগোঁসাইয়ের জাহাজ তৈরির কারখানায় আসবে—তুমি—গঙ্গার হু-হু বাতাসে তার কথাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর—

মোহাচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইল ভিখু। তার মনে হলো, নিশির ডাকে সে যেন গভীব রাত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। আর ওই অপরিচিত রহস্যময়ী স্ত্রীলোকটি তাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে চলেছে অনেক—অনেক দূরের কোন অজানা দেশে।

॥ আট ॥

দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। বাঁকা হয়ে রোদ পড়েছে মহানন্দার জলে। নিমাসরাইয়ের রেশমের কাটুনীরা ঘরে ঘরে রেশমের সুতো কাটছে। এক গামলা ঈষদুষ্ণ জলে কয়েকটি রেশমের গুটি ভাসছে। একজন উবু হয়ে বসে কাঠি দিয়ে নেড়ে চলেছে ধীরে ধীরে। দেখতে দেখতে পলুর গায়ে সুতোর মুখ উঁকি দিচ্ছে। অমনি আর একজন সেই সুতো ধরে আস্তে আস্তে টানছে আর তকলির সঙ্গে পাকিয়ে চলেছে। কোন বাড়িতে খটা-খট্ শব্দ তুলে তাঁত চলছে আর তৈরি হচ্ছে রেশমের সুদৃশ্য শাড়ি আর মটকা, গরদ ইত্যাদি আরও কত রকমের অপূর্ব বস্ত্রসম্ভার। আবার কেউ দীর্ঘ মাঠে কাঠি পুঁতে সিল্কের সুতো রোদে শুকোতে দিচ্ছে। নিমসরাইয়ের জীবনের স্রোত যখন উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে, ঠিক তখন মজিবরের নির্জন বাড়িতে বিপর্যয় নেমে এল।

খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে উঠে বসল ফুলজান। দু'হাতে জোরে জোরে বুকটা ডলতে লাগল। আর চিঁ চিঁ করে ডাকল, কৈ, কেউ আছো না কি গো ? কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আবার কাশির তোড় এল। আবার কাশির সঙ্গে উঠে এল তাজা রক্ত! ফুলজান ভয় পেল না। আজকাল প্রায়ই ওঠে। কিন্তু রক্ত ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। তার জীর্ণ শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাকল, এই আ-লে-ক—

যাই মা—গোয়ালঘর থেকে সাড়া দিল আলেকচাঁদ। গোরুর জাবনা মেখে দিয়ে ছুটে এল সে। কিন্তু ফুলজান তাকে দেখতে পেল না। শুধু মনে হলো চারিদিকের ঘন অন্ধকারে যেন একটা ছায়ামূর্তি সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই ভয়ার্ত গলায়

চিংকার করে উঠল, একী মা, এত রক্ত—! সেই ময়লা তেলচিটে বিছানাটার দিকে তাকিয়ে আলেকচাঁদ চমকে উঠল। ফুলজানের হাড় জিরজিরে দেহটা একেবারে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে। তার ঘোলাটে চোখদুটোর দৃষ্টি ঊর্ধ্বে। থেকে থেকে হিক্কে উঠছে। অনেক কষ্টে অস্ফুটস্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, তোর দাদাবাবু কোথায়?

দাদাবাবু কোথায় গিয়েছে সেই ভোরে উঠে জানি না মা। তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে আলেকচাঁদ বলল, মালিক গেছে সাহেবদের কুঠিতে রেশম বিক্রি করতে। ফালুও নেই - সে গিয়েছে মালিকের সঙ্গে।

আলেক, তুই এদের ডেকে নিয়ে আয়। যেন অনেক—অনেকদূর থেকে বলল ফুলজান, আমি আর বেশিক্ষণ নেই বে—বলতে বলতেই বুক ঠেলে আবাব কাশির বেগ এল, আর গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। আলেক সঙ্গে সঙ্গে তক্তাপোষের নীচে থেকে গামলাটা বের করে মুখের সামনে ধরল আর মুহূর্তের ভেতবে তাজা রক্তে ভরা দলা দলা কফে ভরে গেল পাত্রটা। আর একদণ্ডও দেরি না করে আলেক ছুটল রেশমকুঠির দিকে।

ঠিক এইসময় ভিখু চিড়াইবাড়িব জাহাজঘাট ছাড়িয়ে গঙ্গার আরও উজানে গোঘাটা বন্দরের দিকে ধীরপায়ে হেঁটে চলেছে। গঙ্গার সাঁ-সাঁ বাতাসে সেই অপরিচিত স্ত্রীলোকটির উদ্দীপ্ত কথাগুলো কানের কাছে বাজছিল, তোমার মতো উদ্যোগী পুরুষ সমুদ্রে যাবে না তো কে যাবে…পারবে –পারবে, তুমি নিশ্চয়ই পারবে—

কিন্তু কেমন করে পারবে? কেমন করে সম্ভব হবে তার বিদেশ-যাত্রা? কে তাকে দেবে জাহাজ? যেতে যেতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিখু। দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে। চিড়াইবাড়ি থেকে কিছু দূরে গোঘাটা বন্দরের ঘাটের ওপরে এক টুকরো ফাঁকা জমিতে রাশি রাশি মুক্তো শুকোতে

দেওয়া হয়েছে। ঠিক তার সামনে সুদৃশ্য সোনালী ঝালরে আবৃত আরাম কেদারায় বসে আছে এক মূরবণিক। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে সোনার চুমকি বসানো টকটকে লালরঙের আলখাল্লা ঝকমক করছে। মাথায় রূপালী জরিতে জড়ানো ঘন নীল রঙের পাগড়ি। তার দু'পাশে দুটো যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে বড় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে চলেছে বণিককে। মেয়ে দুটো যেমন সুশ্রী তেমনি স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু হলে কি হবে, দুটো মেয়ের পিঠেই মস্ত বড় এক-একটা কুঁজ! মনে পড়ল, চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটের সারেঙ ননীর কাছে শুনেছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার এই মুসলমান সওদাগরদের বিশ্বাস, কুব্জাপৃষ্ঠা রমণীর সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তাই তাদেরকেই পেয়ারের খাস দাসী করে রাখে। কিন্তু সে যা-ই হোক লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুব খোশমেজাজে আছে—যাবে নাকি, বলবে জাহাজের কথা! অস্বস্তিতে তার মাথার ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। কিন্তু তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেই প্রশ্ন করল মূরবণিক, কি চাই তোমার?

না—কিছু না, এই এমনি—

তুমি কি মুক্তো কিনবে? না কি খুব খাপসুরৎ লেড়কী কেনার মতলবে ঘুরছো? ভিখুকে কিছু বলার অবসর না দিয়েই সেই বিদেশী সওদাগর বলতে লাগল, যদি কাফ্রী মেয়ে নিতে চাও, একেবারে পেটা লোহার মতো মজবুত স্বাস্থ্য বুঝলে, ঘর গেরস্থালীর সব কাজ জানে, দাম মাত্র বিশ সিক্কা রূপিয়া। আব যদি দেশী মেয়ে—

না-না, দাসদাসী কিনতে আসি নি আমি।

তাহলে খোলসা করে বলেই ফেল না বাবা, এত সঙ্কোচ কিসের? হঠাৎ থেমে গেল সওদাগর। অদূরে তার সুদৃশ্য বিশাল প্রাসাদের মতো বাসগৃহের দিকে তাকিয়ে হেঁকে ডাকল—মি-কা- ডো—ডে-ভি-ড—

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ছুটো কাফ্রী। বণিক বলল, দেখছো না মেহমান এসেছে আমার কাছে। গলাটা একটু খাটো করে আবার বলল, দেখছো কেমন খাপসুরৎ চেহারা—খানদানী ঘরের ছেলে—যাও-যাও, শীগগীর যাও, ওকে তামাক খাওয়াও—

দৌড়ে প্রাসাদে যেয়ে একটা গড়গড়া নিয়ে এল তাদের একজন। সোনালী জরিতে মোড়া তার দীর্ঘ লাল নল।

তামাকের মিষ্টি গন্ধে ভুর ভুর করছে চারিদিক। সেই মূরবণিক হাসতে হাসতে বলল, পর্তুগীজদেব কাছ থেকে কেনা তামাক—এস বস, খাও এক ছিলিম—

না, তামাক আমি খাই না—

সে কী! ধূমপানে অরুচি! তাহলে খাবে কিছু, আখরোট-পেস্তা-বাদাম—

না-না, কিছুই খাব না। ম্লান হেসে বলল ভিখু, আপনার এই আদরযত্নের জন্য ধন্যবাদ—

মাথা নীচু করে বসে রইল ভিখু। ডানপায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল। কয়েকবার ঢোক গিলে সে বলল, আপনার কি পুরানো জাহাজ-টাহাজ আছে দু-একটা ?

জাহাজ! জাহাজ দিয়ে তুমি কি করবে গো ? হো-হো করে হেসে উঠল মূরবণিক। কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল ভিখু। হাসির রেশ টেনে টেনে বলল সওদাগর, তোমার কি জাহাজে চড়ার শখ হয়েছে ?

না-না, আমি রেশম ব্যবসায়ী মজিবর মিঞার ছেলে। আমি মালদহের রেশম নিয়ে দূর দেশে যেয়ে বাণিজ্য করতে চাই।

বেশ তো, তুমি চল না আমার সঙ্গে মালাক্কায়।

আপনি মালাক্কায় যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ, সেখান থেকে যাব সুমাত্রায়, যবদ্বীপে, আবার ফেরার সময় সুবর্ণভূমি হয়ে চলে যাব করোমণ্ডল উপকূলের দিকে।

কোন কথা বলল না ভিখু। কেমন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই মূরবণিকের হাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানার দিকে।

কি ভাবছো—যাবে ?

না-না, আপনার সঙ্গে না। আমি একাই যাব—যাব ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে—

হুঁ - হোসেনচাচা আর হাকিমসাহেবের কাছে বুঝি রাশিয়ার সওদাগরদের গল্প শুনেছো ? একটু থেমে আবার বলল সেই মূর সওদাগর, হাকিমসাহেবের কাছেই জানতে পেরেছি খোরাসানে, কিয়েভে আর কাস্পিয়ানের তীরের দেশগুলোতে নাকি আমাদের দেশের রেশম, কাঁচের বাসনপত্র, চীনামাটির কাপড়িশ সোনার গহনা, মশলা, সুগন্ধী দ্রব্য, মূল্যবান পাথর, বনৌষধি এবং বিভিন্ন ওষুধের খুব চাহিদা আছে।

আমি ঠিক করেছি আমি যাব শুধু মালদহের রেশম নিয়ে।

ভালো, খুব ভালো, তোফা তোফা। কিন্তু ভাই, আমার তো মাত্র তিনখানা জাহাজ, তার দুটো কোলান্দিয়া আর একটা সঙ্গারা প্যাটার্ণের।

বাব্বা ! আপনার দু-দুটো কোলান্দিয়া জাহাজ ! মানে যাদের খোলটা একটা মাত্র তক্তা দিয়ে তৈরি—

হ্যাঁ, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চাটগাঁয়ের মিস্ত্রীকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলাম—বিক্রি তো করতে পারব না--

আচ্ছা, তাহলে আর সময় নষ্ট করে কি হবে! উঠে দাঁড়ালো ভিখু। তার হতাশার কালিমাখা মুখখানার দিকে তাকিয়ে মূরবণিক বলল, তুমি এক কাজ কর—ভেনিস থেকে এক বিদেশী সওদাগর এসেছে কাল রাত্রে, চিড়াইবাড়ির ঘাটে নোঙর করেছে—

তাঁর সঙ্গে অনেক জাহাজ আছে ?

শুনলাম তো অনেকগুলো জাহাজের এক বিশাল বহর নিয়ে নাকি এসেছে।

তীব্র আনন্দে ভিখুর বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। যদি মাত্র একটা জাহাজও তাকে সাহেব বিক্রি করতে পারে—তার দেহের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। সে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল চিড়াইবাড়ির দিকে। দূর থেকে হেঁকে বলল মূর সওদাগর, যদি রাশিয়ায় যেতে পার—তাহলে বল—তোমাকে কিছু দাসদাসী আর কয়েকশো ঘোড়া আনতে দেব—বু-ঝো-ছো—ও-ও—শাঁ শাঁ বাতাসে তার শেষের কথাগুলো দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

গঙ্গার ধারে শান-বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ায় চেপে চলেছে আরবীয় এবং পারসিক সওদাগররা, পাল্কি করে যাচ্ছে আবিসিনিয়ার বণিকরা। গঙ্গার বুকে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বিদেশী সওদাগরদেরই কত বিচিত্র বর্ণাঢ্য বাণিজ্যতরী! হা আল্লা···একটা, মাত্র একটা জাহাজ সে জোগাড় করতে পারবে না। তার মুখে তিতে জল কাটে। বিস্বাদ বিবক্তিতে ছেয়ে যায় তার মন।

এই হটো—হটো সব, হট যাও—বিশাল আরবী ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো উড়িয়ে আর খট্ খট্ শব্দ তুলে যেন একটা ঝড় ছুটে এসেছে।

কী ব্যাপার! থমকে দাঁড়ালো ভিখু। দেখল, গঙ্গার ধারে গৌড়ের সেই বিখ্যাত বন্দর চিড়াইবাড়ির জনবহুল রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। যে যেদিকে পারছে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। খট্-খট্-খট্ শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে সেই উন্মত্ত ঝড়—কিন্তু শেষরক্ষা আর হলো না। এসে পড়ল লালমুখো এক অশ্বারোহী। হাতের মুঠোয় খোলা তলোয়াবেব সোনার পাতবসানো বাঁট, গায়ের স্বর্ণখচিত দেশী বাফতার কোট আর গলার বহুমূল্য পাথরের কণ্ঠহারেই ভিখু বুঝতে পারল, লোকটা পর্তুগীজ বণিক। সে শুনেছে, ওরা বাংলাদেশের-ধান চাল রেশম আর মসলিন সুমাত্রা, মালাক্কা আরও বহু দূর দেশে বিক্রি করে এত টাকা করেছে যে, চট্টগ্রামে, সপ্তগ্রামে ওদের কুঠির দেওয়ালগুলো পর্যন্ত সোনা দিয়ে তৈরি। ঘোড়ার পিঠে চেপেই যাকে হাতের কাছে পাচ্ছে তাকেই চাবুক মারছে—

শঙ্করমাছের লেজের তৈরি চাবুকের ঘায়ে তার পিঠ কেটে দরদর করে রক্ত ঝরছে ; কেউ মুখ থুবড়ে পড়ছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লোকটার ! শুধু এই সাহেবটি নয় - ওদের জাতের প্রায় প্রত্যেকটি লোকই এইরকম অত্যাচার করে আনন্দ পায়। তাই গৌড়ের মানুষ আড়ালে আবডালে পর্তুগীজ সাহেবদের বলে, লালমুখো যমদূত।

আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর ভেনিসীয় জাহাজের বহরের সামনে এসে দাঁড়ালো ভিখু। জাহাজের কেবিনে কেবিনে লোক গমগম করছে। প্রত্যেকে হাসি-হাসি মুখে কাজ করছে কিন্তু এদের মালিক কে -- কার সঙ্গে কথা বলবে, কি ভাষায় বলবে, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারল না। অনেক -- অনেকগুলো মনোক্‌জিল আর ডাঙ্গো ধবনের বিশাল বাণিজ্যতবী। হঠাৎ অশুভ একটা আশঙ্কা তার মনের ভেতর সাপের মতো ফুঁসে উঠল। এই বিদেশী বণিক তাকে অনুগ্রহ দেখাবে কেন ?

কি হে রেশমের ব্যাপারী, তুমি এখানে! ভেনিসের সেই সওদাগরী জাহাজগুলোর ভেতর থেকে হাকিমসাহেবের উল্লসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল হাতছানি দিয়ে ডাকল, এস, এসে পড়ো—

তবু ভিখু দাঁড়িয়ে রইল।

আরে ভাবছো কি, ভেনিসেব সাহেবেব মুখে যদি দেশ-দেশান্তরের গল্প শুনতে চাও তাহলে চলে এস।

ভিখু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজেব দোতলায় চলে এল। দেখল, মেঝের ওপবে এক সুদৃশ্য গালিচা বিছানো হয়েছে। মাঝখানে বসে রয়েছে সৌম্যদর্শন, শান্ত চেহারার এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। পর্তুগীজদের মতই দুধে-আলতায় মেশনো গায়ের রঙ। তেমনি খাড়া নাক। আর নীল দুটো বড় বড় চোখ। আর সেই দুটো চোখে কি নিবিড় প্রশান্ত দৃষ্টি। ভিখুর মনে হলো, ব্যবসা-বাণিজ্য নয়— ধর্মপ্রচার করতে এসেছে সাহেব। তাকে লক্ষ্য করে ভেনিসের সওদাগরকে কি যেন অদ্ভুত একটা ভাষায় বলল হাকিমসাহেব। সঙ্গে

সঙ্গে সহাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করল সেই বিদেশী সওদাগর। ভিখু বেশ আশান্বিত হয়ে বসল।

বলাবাহুল্য গৌড়ে ইউরোপ থেকে কেউ এলেই হাকিমসাহেব দোভাষীর কাজ করে। হাকিমসাহেব, ভেনিস থেকে আগত সেই বণিক এবং ভিখুর ভেতরে যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তার ভেতরে অনেক অবান্তর এবং অসংলগ্ন প্রসঙ্গ -- সেসব বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু এখানে লেখা হলো।

ভেনিসের সওদাগরের নাম—মাস্টার সাজার ম্যাকেঞ্জি। পেশায় ভেনিস দেশীয় ব্যবসায়ী, কিন্তু আসলে পরিব্রাজক। দেশে ফিরে গিয়ে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখবেন। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এদেশের আচার-আচরণ ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জেনে নিচ্ছেন।

করোমণ্ডল উপকূল পাড়ি দিয়ে উড়িষ্যা থেকে সপ্তগ্রাম বন্দর হয়ে ম্যাকেঞ্জি গৌড়ে এসেছেন। বঙ্গোপসাগর থেকে গঙ্গায় পৌঁছনোর পর থেকেই তিনি ঘাটে ঘাটে বজরা থামিয়ে গ্রামের ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত দেখে এসেছেন। আশ্চর্য রকমের উর্বরা এদেশের মাটি! যতদূর চোখ যায়, মাঠে মাটে অপর্যাপ্ত পাকা ধানের ঐশ্বর্যে ভূমি-লক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু ধান নয়। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু আরও নানা রকমের সুস্বাদু ফলেরও অভাব নেই। আর মসলিন ও রেশমের সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভারের তো তুলনা নেই। মোটের ওপর কৃষিজাত ও কার্পাস-রেশমজাত পণ্যে এদেশ খুবই সমৃদ্ধ। কিন্তু একটা কারণে ম্যাকেঞ্জি খুবই অবাক হয়েছিল—

কারণটা কি?

'বেঙ্গলা' অর্থাৎ বাঙলাদেশের বন্দরে বন্দরে হাটে-বাজারে ব্যবসা করছে অবাঙালীরা! আফগান কি পাঠান পাইকারদের কাছে থেকে রেশম কি মসলিন, জটামাংসী (সুগন্ধী দ্রব্য), মশলা কিনছে আবিসিনিয়া, পারস্য এবং আরবের সওদাগররা। পর্তুগীজ ও মূররা তো জাঁকিয়ে বসেছে চট্টগ্রামে, সপ্তগ্রামে, গৌড়ে; একটু থেমে

ভেনিসের বণিক ম্যাকেঞ্জি। তার রাঙা মুখে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল। ভিখু আর হাকিমসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, বাঙালীরা কি ব্যবসা করে না? সপ্তগ্রামের বন্দরে দেখেছি প্রায় একশো মাইল জুড়ে বিদেশী সওদাগরদের জাহাজের ভীড়—

ইমা-নি-বা-তিল* (কুসংস্কার), হাকিমসাহেব উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে শুরু করল, কালাপানি পার হলে এদেশের লোকের জাত যায়। তাকে একঘরে করে। 'সারগিন' (গোবর) খাইয়ে মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করায়।

কী! উত্তেজনায় সাহেবের নীলাভ দুটো বড় বড় চোখ দপ দপ করতে লাগল। দ্রুতহাতে মোটা খাতায় খস খস করে কি লিখে ফেলল। হয়তো হাকিমসাহেবের কথাগুলোই লিখে রাখল। ভিখু নিঃশব্দে বসে দেখছে। তাদের আলোচনার অর্ধেকও বুঝতে পারছে না। কিন্তু সেই অস্বস্তির চেয়েও অনেক অনেক তীব্র তার সেই বাসনাটা। পিঁপড়ের মতো কুট কুট করে কামড়ে চলেছে। সাহেব কি তার একটা জাহাজ কম দামে তাকে দেবে—হাকিমসাহেব কি তার হয়ে বলবে?

ফ্রেডারিক যেই খাতায় লেখা শেষ করল, অমনি হাকিম-সাহেব বলল, অথচ জানেন, বাঙালীর সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের। তা নাহলে, ইউফ্রেতিস নদীর ধারে প্রায় তিন হাজার বছর আগের সেই ব্যাবিলনের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে বাংলাদেশের শালকাঠের বরগা যায় কি করে? একটু থেমে আবার বলে, কেমন করে পাওয়া যায় খ্রীস্টের জন্মের বহু—বহু আগে রোমের ধনী বিলাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদের ভেতরে মসলিনের নাম?

ফ্রেডারিক কথা বলে না। হাকিমসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায়

*পার্শী।

বিস্ময়ে তার নীল চোখদুটো অগাধ হয়ে ওঠে। ভিখু ক্রমশঃ হতাশ হয়ে ওঠে। তার মনে হয় না এই জমাট আলোচনা ছেড়ে হাকিম-সাহেব তার প্রসঙ্গ সাহেবের কাছে তুলবে। ফ্রেডারিক উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল, বাঙালীদের সেই বহির্বাণিজ্যটা নষ্ট হলো কি করে, অনুগ্রহ করে একটু বলবেন ?

শুনেছি সেনবংশের রাজা বল্লাল সেন এই সর্বনাশটা করেছিলেন। তিনিই হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। যাক, এসব ইতিহাসের কচকচি।

একটু থেমে ভিখুর করুণ ম্লানমুখের দিকে তাকিয়ে বলল, যেমন ধরুন এই ছেলেটি, ওর বাবা শেখ মজিবর একজন রেশমের সওদাগর। কিন্তু কিছুতেই ব্যবসা করতে ছেলেকে বিদেশে যেতে দেবে না।

কেন ?

ওই যে বল্লালী আদেশ, সমুদ্রপারের দেশে গেলেই জাত যাবে। বাইরের দুনিয়ার কোন দেশের খোঁজখবর এরা রাখবে না—রাখতে চায় না। নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডির ভেতরে কূপমণ্ডুকের মতো—

ও কোথায় যেতে চায় ? একটু থেমে ফ্রেডারিক বলল, ওর বাসনাটা কি শুনি, যদি আমি কোন সাহায্য করতে পারি !

ভিখু শেখের যাওয়ার ইচ্ছাটা বোধহয় রাশিয়ার দিকে, তাই না হে ? ভিখুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল হাকিমসাহেব।

রাশিয়া ! সে কী—রাশিয়াতে যেতে চায় কেন ?

আর বলেন কেন, এই তো সেদিন এখানকার এক সওদাগর বাগদাদ থেকে ফিরেছেন কিনা। সেখানে তিনি অনেক রুশীয় ব্যবসায়ী দেখেছেন—তাঁর মুখে তাদের গল্প শুনেই—

গৌড়ের সেই সওদাগর বাগদাদে রুশীয় বণিক দেখেছেন, কিন্তু ভারতীয় সওদাগর দেখেছেন কি ? একটু থেমে বলল, রাশিয়ার সঙ্গে আপনাদের কি কোন ব্যবসায়িক সম্বন্ধ আছে ?

বলেন কি মশায়—মোগল যুগের অনেক আগে থেকেই রাশিয়ার

বণিকেরা মধ্য-এশিয়ায় আসতো, একটু থেমে বলল হাকিমসাহেব, ঐতিহাসিক ইবন খুর্দাধ্‌বিহ তো পরিষ্কার বলেইছেন, নবম ও দশম শতাব্দীতেই রাশিয়ার সওদাগররা মধ্যপ্রাচ্য হয়ে চীন, বলাখ এবং ভারতে পর্যন্ত চলে আসতো।

আপনি তো দেখছি ভারত ও রুশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন।

ফ্রেডারিকের কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ না করে হাকিমসাহেব বলল, আমি কাবুলে, বাগদাদে, খোরাসান এমন কি তাব্রিজ এবং রাশিয়ার সীমান্ত আস্ত্রাখানে পর্যন্ত নিজে গিয়েছি যে।

কেন—ব্যবসা ?

না—না, সে আমি নিজেই জানি না। ইরাক, পারস্যের দেশ-দেশান্তরে কেন ঘুরেছি—আমার কথা ছেড়ে দিন। তাড়াতাড়ি কেন যেন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইল হাকিমসাহেব। কেমন ভার ভার হয়ে উঠল মুখখানা। আর চোখের পাতায় যেন নেমে এল দূর অতীতের কোন বেদনাদীর্ণ স্মৃতি। ধীরে ধীরে বলল, আমার কি মনে হয় জানেন, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোতে এদেশের ব্যবসায়ীরা যত বেশি গিয়েছে তার চেয়ে অনেক কম গিয়েছে তার ঘরের কাছের ওই ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে।

অদ্ভুত—এর কারণ কি ?

কারণ আবার কি, পাহাড় মরুভূমি পেরিয়ে দূর দুর্গম রাস্তা, কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, মহামতি বাবরও অনুভব করেছিলেন মধ্য-এশিয়া তথা রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের দেশের যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা। তাই তিনি কাবুল কান্দাহার থেকে একেবারে খোরাসান পর্যন্ত উটের দীর্ঘ এক 'ক্যাফেলা' পাঠিয়েছিলেন।

আপনি ঠিকই বলেছেন হাকিমসাহেব। নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বলল ভেনিসের সওদাগর, মধ্য-এশিয়া থেকে রাশিয়ার ভল্গা উপত্যকা পর্যন্ত নিশ্চয়ই একটা বাণিজ্যপথ ছিল, সেই পথটাই ভাল করে অনুসন্ধান করা উচিত।

সেইজন্যেই আমি এই ভিখু শেখকে পাঠাতে চাইছি, কিন্তু ওর বাপজান কিছুতেই রাজী নয়।

তাই নাকি! কেন?

একমাত্র ছেলে। ওর বাপজান ওকে শুধু স্থানীয় হাটে-বাজারে পাঠাবে রেশমের সুতো আর কাপড় বিক্রির জন্য।

আচ্ছা—আমি ওকে কি করে সাহায্য করতে পারি হাকিম-সাহেব?

কি হে ভিখু? কি ধরনের সাহায্য চাও? হাকিমসাহেব ভিখুকে প্রশ্ন করল।

ভিখু কোন কথা বলল না। অদূরে গঙ্গার বুকে ফ্রেডারিকের বাণিজ্যতরীর বহরের দিকে তাকিয়ে রইল। হাকিমসাহেব তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, ও বোধহয় একটা জাহাজ—

জাহাজ! সে কি করে সম্ভব? আমার সঙ্গে যে ভেনিস থেকে আরও অনেক ব্যবসায়ী এসেছে। মাঝিমাল্লা সব মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো—একটু থামল ফ্রেডারিক। চিন্তা করতে লাগল। গঙ্গার বাতাসে ফরফর করে উড়ে গেল তার লেখার খাতার কয়েকটা পাতা। এমন সময় কেবিনের ভেতরে পেয়ালা পিরিচের টুং-টাং আওয়াজ শোনা গেল।

তিনটি সুদর্শনা তরুণী মেয়ে বেরিয়ে গেল। তাদের পরনে খাটো জাফরাণ রঙের ঘাগরা, গায়ে লালরঙের জামা, তার চুড়িদার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত। মাথায় কপাল চেপে নীল রুমালের ফেট, তার নীচে লালচে মুখ। তাদের সর্বাঙ্গে কেমন একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। তারা নিঃশব্দে এসে তিনটি প্লেট নামিয়ে রাখল। কোন ডিশে কয়েকটা কমলালেবু, কিছু আপেল, পেস্তা, বাদাম, আখরোট—

এরা কারা? এতসব কি!

একটু জলযোগ করুন হাকিমসাহেব, এ সবই আপনাদের দেশী ফল—

মেয়ে তিনটি কে ? এরা তো আপনাদের দেশী মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না !

ওই তিনটিই হতভাগী ক্রীতদাসী ! জাঞ্জিবার বন্দরে মিশরের এক সওদাগরের কাছে থেকে কিনেছিলাম।

ও জাঞ্জিবার ! সে তো দাসদাসীর মস্তবড় হাট ! হাকিমসাহেব বলল, আমি দেখেছি দাসদাসীর ব্যাপারীরা সমুদ্রের ধারে বালুচরে ছোট ছোট ছাউনী করে কুকুর-শেয়ালের মতো গাদা করে রেখেছে।*

মিশরের সেই সওদাগর আবিসিনিয়ার এক সওদাগরের কাছে বিক্রি করছিল ওদের, ফ্রেডারিক বলল, সেই মিশরীয় ব্যাপারীর পা দুটো ধরে ওদের দারুণ কান্নাকাটি ; কিছুতেই সেই আবিসিনিয়ার সওদাগরের কাছে যাবে না। সে নাকি খুব অত্যাচারী ! একটু থেমে আবার ভার-ভার গলায় বলল, তার আর দুটো ক্রীতদাসী মেয়েকে স্রেফ বেত মারতে মারতেই খুন করে ফেলেছিল।

আমার কি হবে হাকিমসাহেব ? ভিখু তার নিজের প্রসঙ্গটা তুলতে চেষ্টা করে। হাকিমসাহেব ফ্রেডারিককে বলল, কোন একটি জাহাজও যদি জোগাড় করে দিতে পারেন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেটির জন্য—

দেখি, আমার নওয়ারার মৌলিমকে (জলের মাপ, নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে যিনি জাহাজ চালাতেন) একটু বলি। বলেই ফ্রেডারিক হাঁকল, জি-ও ভ্যা-নি—

বলুন—

আমাদের নওয়ারায় মোট কত জাহাজ আছে ?

পনেরটা।

সবগুলোর অবস্থা ভাল ?

না, একটা জাহাজ মেরামত করতে হবে—তাতে অনেক খরচও

*লেখকের 'দাসদাসীর হাট' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

পড়বে—একটু থেমে জিওভ্যানি বলল, আমরা তো বেঙ্গল থেকে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাচ্ছি। আমাদের পুরনো ইতালীয়ান জাহাজটা বিক্রি করে প্রশান্ত মহাসাগরের পক্ষে উপযুক্ত 'কোলান্দিয়া-ফন্টা' জাহাজ এখান থেকে কিনতে পারি।

খুব ভাল বলেছো। ধন্যবাদ—

কোলান্দিয়াফন্টা আমাদের এখানে রামুগোঁসাইয়ের জাহাজের কারখানায় তৈরি হয়, হাকিমসাহেব খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, যদি কেনেন, তাহলে গোঁসাইকে বলে—

কিন্তু পুরনো ওই বিদেশী জাহাজটার দাম কত পড়বে? ভিখু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

আহা, আমি তো ব্যবসায়ী নই। আমি তোমার সঙ্গে ব্যবসা করব না। ফ্রেডারিক ভিখুর পিঠ চাপড়ে বলল, জিওভ্যানির সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে খুব কম দামে দিয়ে দেব হে—বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা যখন তোমার।

ব্যস্—ভিখু, তুমি টাকার জোগাড় কর—হাকিমসাহেবের চোখদুটো খুশিতে ঝকমক করছে। আবার ফ্রেডারিক আর জিওভ্যানির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা আমার সঙ্গে কাল সকালে একবার রামুগোঁসাইয়ের জাহাজ তৈরির কারখানায় চলুন। একটু থেমে আবার গুন্ গুন্ করে বলল, আপনারা এখান থেকে কোলান্দিয়া কেনার সিদ্ধান্ত করে কি ভালো যে করেছেন—

কেন?

আপনার পূর্বগামীরা মার্কোপোলো, নিকোলাই কন্টিও তো এই জাহাজেই পাড়ি দিয়েছিলেন মালাক্কায়।

হাকিমসাহেব কি বলছে, কি বলছে ভেনিসের সওদাগর ম্যাকেঞ্জি ফ্রেডারিক! কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ভিখু। তার বুকের ভেতরে যেন অদৃশ্য সেতারের রাগিণী বেজে চলেছে। সে যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতো যখন নেমে এল

ভেনিসের জাহাজ থেকে, তখন চিড়াইবাড়ি বন্দরের জাহাজে জাহাজে আলো জ্বলে উঠেছে। সন্ধ্যার ধূপছায়া অন্ধকারে গঙ্গার জলরাশি একটা ভোঁতা ছুরির মতো ঝকমক করছে। দূরে গৌড় মহানগরীর সারি সারি প্রাসাদ-শীর্ষের আলোগুলো চারিদিকের অন্ধকারের ভেতরে আগুনের ফুলের মতো ফুটে রয়েছে। ভিখুর মাথার ভেতরে আছড়ে পড়ছে রক্তের উচ্ছ্বাস। কি করবে - কি করলে ভালো হবে —কি করা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারল না সে। একবার মনে হলো এখুনি এই মুহূর্তে ছুটে কুশাই কারিগরকে ডেকে এনে ভেনিসের ভাঙা জাহাজটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দেশী মুদ্রায় দাম কত হতে পারে জিজ্ঞাসা করে। আবার মনে হলো, না, সবচেয়ে আগে টাকা—কিছু টাকার জোগাড় করা উচিত। কত—কতই আর হতে পারে—তিনশো-চারশো কি পাঁচশো সিক্কা টাকা। এত টাকা সে কোথায় পাবে! একটা কপর্দকও তার হাতে দেয় না বাবা। তার মনের ভেতরে মজিবরের গম্ভীর আর কঠিন মুখখানার পাশাপাশি আরও দুটি মুখের ছবি ভেসে উঠল।

রোগজীর্ণ পাণ্ডুর একটা মুখাবয়বে ঝরছে অনাবিল স্নেহ।

শিশিরে ভেজা তাজা স্থলপদ্মের মতো আর একটা মুখে নিবিড় প্রীতি।

ফুলজান।

নসীবন।

দেশী-বিদেশী ব্যাপারী সওদাগরদের পায়ের শব্দে মুখর সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার মনে হলো শুধু তাদের দু'জনের কথা। তার মা রোগা মানুষ। তাদের সংসারে তার অস্তিত্বটাই অবাঞ্ছিত আর অস্বস্তিকর। বলাবাহুল্য তার কাছে নগদ টাকাকড়ি থাকে না; কিন্তু অনেক গহনাগাটি আছে। সে চাইলে মা তাকে না দিয়ে পারবে না। অবশ্যই আসল উদ্দেশ্যটা গোপন করতে হবে। গোপন করতে হবে নসীবনকেও। জাহাজ কেনার কথা শুনলেই মারমুখী হয়ে উঠবে।

কিন্তু সে জানে তার হাতে টাকা আছে অনেক। সে পলু বিক্রি করে, বিক্রি করে রেশমের সুতো। ওর বাবা আলমসাহেব মেয়ের ওপর সংসার চালানোর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে চাষবাস দেখে। অতএব ধান বিক্রির টাকা, চাকর-বাকরদের মাইনে, সংসার খরচের টাকাকড়ি সব থাকে নসীবনের হাতে। কিন্তু কি—কি বলবে তাকে। যাকে ভালোবাসা যায় তাকে মিথ্যে বলতে মন চায় না —এসব ভাবতে ভাবতে নসীবনের বাড়ির সামনে সজনে গাছের নীচে এসেই থমকে দাঁড়ালো সে। দাঁড়াতে হলো।

কী ব্যাপার! গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা আছে বাইশবাজারের কাজী আমীর খাঁর আরবী ঘোড়া! গুর গুর করে উঠল তার বুকের ভেতরটা! নিশ্চয়ই পলুপালনের বিরোধী শেখ নুরুদ্দিন ধর্মান্ধ আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাজীকে নালিশ করেছে। তাই আমীর খাঁ নিজে এসেছে। হয়তো সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদাও এসেছে, আর তারা ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে তল্লাশি চালাচ্ছে। হয়তো ওদের টিনের আটচালা ঘরের বাঁশের খুঁটি ধরে পাথুরে একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে নসীবন। ওর বুকের ভেতরে প্রাণের ধুকধুকির মতো যে পলুগুলোকে সে কত যত্নে মহানন্দার জলে ধুয়ে নিয়ে আসে; তারপরে একটা বেলেমাটির হাঁড়ির নীচে কিছু পেঁজা তুলো দিয়ে ছড়িয়ে রাখে। মশারীর কাপড়ের এক-একটা থলির ভেতরে দু'ছটাক ওজনের পলুর ডিম বেঁধে যে তুলো বিছানো হাঁড়ির ভেতরে রাখে সেই পলুর হাঁড়িই হয়তো আছড়ে ভাঙছে রেশমের দুশমনরা। নসীবনের কান্না ভার-ভার করুণ মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অসহ্য আর তীব্র একটা অস্থিরতায় তার হাতদুটো নিসপিস করে। কিন্তু নসীবনের পক্ষ নিয়ে কাজীর সঙ্গে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামবে কি করে? আমীর খাঁ হয়তো আলমসাহেবকেই বলবে, মজিবরের ছেলে তোমাদের ভেতরে নাক গলায় কেন? ওর অত জ্বালা কিসের? তখন আর এক বিপদ বাধবে। তাই সে

কিছুই করল না—করতে পারল না। শুধু সজনে গাছের নীচের সেই জমাট অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে এল ওদের সেই টিনের আটচালার জানালার নীচে। সেই খোলা জানালা দিয়ে সেজবাতির মৃদু আলোয় তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঘরের ভেতরে তাকিয়ে বিস্মিত হলো সে। কোথায় কাজী! কোথায় পাইক-বরকন্দাজ! কেউ নেই। বাড়ির মানুষগুলো গেল কোথায়! এবার তার কানে এলো আলমসাহেবের কথাগুলো: দেখ, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মেয়ের মনের গতিবিধি তো আমি জানি—

কী ব্যাপার? কাকে বলছে কথাগুলো! উত্তেজনায় ভেঙে পড়ছে তার বুকের ভেতরটা।

কার ওপর তার ঝোঁক?

আবার কার ওপর? রেশমের ব্যাপারী মজিবরের ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটার ওপর—সেই ছেলেটা দিনরাত চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটে ঘুর-ঘুর করে। সংসারের কাজকম্মে একটুও মন নেই—

সে আমি জানি, সাদীর আগে একটু এদিক-ওদিক থাকতে পারে, মেয়েদের—সেসব আমি—

না—না, খুব ছোটবেলা থেকে ওদের আশনাই—একটু বিব্রত আর কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলে আলমসাহেব, মজিবর মিঞারও খুব ইচ্ছা—

আপনার কি ইচ্ছা বলুন? এবারে কণ্ঠস্বরের ভেতরে বেশ উত্তাপের রেশ পাওয়া যায়। ভিখুর মাথার ভেতরে আগুনের চাকার আবর্তনটা যেন আরও দ্রুত হতে থাকে। মালদহী সিল্কের নীল লুঙ্গি আর বাফতার চুরিদার পাঞ্জাবি পরা কাজীর ছেলে দবির খাঁর নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারাটার দিকে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো তাকিয়ে রইল। আলমসাহেব নিভু-নিভু গলায় বলল, তুমি হলে গিয়ে আমাদের এলাকার কাজী আমীর খাঁ সাহেবের ছেলে। তোমার হাতে মেয়ে দিতে পারলে আমি খুশি হব। কিন্তু—

আবার কিন্তু কি? আমি করব সাদী, মেয়ে আপনার—আপনার যখন অমত নেই—

দবির, তুমি আমার ছেলের মতো, মেহেরবাণী করে তুমি আমাকে কিছুদিন সময় দাও।

আচ্ছা, তাই হবে। ডাকুন আপনার মেয়েকে, দেখা করে যাই—

নসু -ও নসু—কোথায় গেলি মা—বৃদ্ধের করুণ কণ্ঠস্বরটা চারিদিকের প্রগাঢ় স্তব্ধতার ভেতরে কাতর কান্নার মতো শোনালো। আর খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দবির খাঁ। উত্তেজনায় তার মাংসল দেহটা থরথর কাঁপতে লাগল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, দেখুন, মজিবরের ব্যাটাকে সাদী করার ব্যাপারে আপনারও আস্কারা আছে।

না—না বাপজান, হাজার হোক মেয়ে তো—এখন ডাগর হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণায় ভয়ে দু'হাতে বুক চেপে ধরে ব্যাকুল হয়ে বলে, তাই ওর সাদীর কথাবার্তায় থাকতে শরম পায়।

ঠিক আছে - এখন যাচ্ছি—আমি দু'একদিনের ভেতরেই আবার আসছি। জুতোয় মসমস শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাইশবাজারের কাজীর ছেলে দবির খাঁ। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো নিজেকে মিশিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভিখু। দবিরের ঘোড়ার খুরের শব্দ যখন দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল তখনও বৃদ্ধের আকুল ডাক শোনা যেতে লাগল, নসু রে—ও নসু—কোথায় গেলি—মা—আল্লার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই দবিরের হাতে তোকে দিতে রে—

অন্ধকারে কেউ দেখতে পেল না, মুখ টিপে টিপে হাসছে ভিখু। সে জানে যে ঘরে বেলেমাটির হাঁড়ির ভেতরে পলুর ডিম রাখে, সেই ঘরেই আছে নসু। হয়তো পলুর থলিগুলোকে বুকে করে আগলে বসে রয়েছে। তার মান-ইজ্জৎ এবং প্রাণের চেয়েও বেশি হলো ওই রেশমের গুটিগুলো।

কে, কে তুমি? অন্ধকার, ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে পলুর সেই ভাঁড়ারের চৌকাঠে: দাঁড়ানো মাত্র নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠল নসীবন।

আমি দবির খাঁ নই নসু—আমি—

ও—তুমি—তুমি এসেছো, তীব্র উত্তেজনা আর অবরুদ্ধ বেদনার ভার যেন প্রিয়জনের সান্নিধ্যে এসে গলে গলে জল হয়ে গেল। একটা ঢেউয়ের মতো ভিখুর বুকে আছড়ে পড়ে তীব্র কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ভিখু তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, হয়েছে কি, এত অস্থির হচ্ছিস কেন?

আমি আর পারছি না—আর পারছি না গো! অন্ধকারে নসীবনের জলভরা চোখদুটো ম্লান নক্ষত্রের মতো চিক চিক করতে লাগল।

কথা বলল না ভিখু। জানালাহীন এবং রেশমকীটের দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন সেই ঘরের ভিতরে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তার বুকটা ব্যথা করতে লাগল তার মনের ভেতরের সেই জ্বালাধরা অস্বস্তির জন্যে। কেমন করে—কিভাবে নসুর কাছে কথাটা পাড়বে! তার বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে পড়তে লাগল। তাঽ হঠাৎ মনে পড়ল হাকিমসাহেব, না মাদ্রাসার ছোট মৌলভী সাহেব বলেছিল, আকাঙ্ক্ষা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে বড় হওয়া যায় না, কিন্তু আবার বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে করে তোলে স্বার্থপর, করে তোলে হিংস্র।

কি ভাবছো?

কিছু না। এখানে পলুর বিশ্রী গন্ধ। বাইরে চল্ নসু—কেমন থমথম করতে লাগল ভিখুর গলা।

রাশি রাশি তারা আর নক্ষত্রের ছায়া বুকে নিয়ে দুলছে মহানন্দার জল। নদীর কাজল কালো স্বচ্ছ জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙা ভাঙা নক্ষত্রের জলজলে ছায়াগুলোকে ভিখুর মনে হলো এক-একটা দগদগে

বাঘী ঘা। পুড়ে যাচ্ছে তার বুকের ভেতরটা—কেমন করে বলবে নস্নুকে সেই কথাটা!

তুমি কি কিছু বলবে? অভিমানে ভার-ভার শোনায় নস্নুর গলার স্বর।

হ্যাঁরে নস্নু—খুব—খুব জরুরী কথা—নস্নুর আরও কাছে ঘন হয়ে বসল সে। হঠাৎ লুব্ধ আর মত্ত একটা সাপের মতো তার ডানহাতটা উঠে এল নস্নুর মুখখানার ওপরে। কান্না· আর ঘামে ভেজা ভেজা সুডৌল মুখখানায় হাত বুলিয়ে দিতে আস্তে আস্তে যেন অনেকদূর থেকে ভিখু বলল, নস্নু, তুই আমাকে খু-উ-ব ভালোবাসিস, না রে?

কী মস্করা করছো বল তো?

দবির তোকে সাদী করতে চায়, তোর বাপজান কি বলে? ঘৃণায় মুখখানা বেঁকিয়ে বলে, সে তো কাজীর ভয়ে ইঁদুরের গর্ত খোঁজে—

ঘরে যার কিছু মূলধন থাকে সে ভয়ে ভয়েই থাকে।

মানে?

মানে, তুমি কখনো বুঝবে না—কোনদিন বুঝবে না। তুমি—তুমি—তীব্র উত্তেজনায় আর একটিও কথা বলতে পারল না নসীবন। শুধু বিষধর সাপিনীর মতো দুলতে লাগল তার দীঘল দেহটা। চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, কাজীর ছেলে কেন ঘুর-ঘুর করে বুঝতে পার না—জান না তাকে অগ্রাহ্য করা মানেই সাপের লেজে পা দেওয়া—

জানি—আমি সব জানি রে নস্নু। কিন্তু—মনের ভেতরের অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় তার কণ্ঠ বোধ হয়ে এল। তার নিজের ওপরেই তার এতটুকু বিশ্বাস নেই। সেই কথাটাই তার মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বলল না। বলতে পারল না।

বিজন সেই নদীতীরে তারাভরা আকাশের নিচে দু'জনেই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর হু-হু করে ভিজে হাওয়া এল অন্ধকার নদীর বুক থেকে। ভিখুর মনে হলো, বাতাসটা যেন ধু-ধু

বালুচরে অব্যক্ত যন্ত্রণার মতো গোঙাচ্ছে। তার বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে যাচ্ছে, তবুও—তবুও নিবিড় আবেশে নসীবনের নরম দেহটাকে হু'হাতে জড়িয়ে ধরল। আর নসীবনের মনে হলো, চৈত্রের ঝাঁ ঝাঁ রোদে তেতে-পুড়ে এসে যেন তালপুকুরের হিমশীতল জলে নেমেছে। সারা সন্ধ্যার উত্তাপ উত্তেজনার রেশ কেটে গিয়ে পরম তৃপ্তিতে তার চোখহুটো বুঁজে এল। আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ গলায় বলল ভিখু, তুই আমার জন্যে সব করতে পারিস, না রে?

পারি না আবার, তোমার একটা মুখের কথায় আমি হাসতে হাসতে বিষ খেয়ে মরে যেতেও পারি। এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিল নসীবন। কিন্তু বলতে পারল না। শুধু মিষ্টি কোন নেশার ঘোর-লাগা মানুষের মতো ভিখুর বুকে মাথা রাখল। আর গানের মতো গুন্ গুন্ করে বলল, তোমার জন্যে কি করতে হবে বল? তোমার মুখ চেয়ে আমি—আমি—

আমাকে কিছু টাকা দিতে পারিস নসু?

টাকা! টাকা দিয়ে তুমি কি করবে গো?

চুপ করে থাকল ভিখু। নসীবন অন্ধকারে দেখতে পেল না, তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছে ভিখুর মুখে। দূরে নদীর ওপারে কাজলকালো দিগন্তের দিকে চোখহুটো ছড়িয়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে নসীবন বলল, তুমি আমাদের সাদীর খরচের কথা ভাবছো তো,—তোমার বাপজানের কাছে হাত পাততে চাও না—এই তো! বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল সে। হাসির দমক কমলে বলল, ঢের—ঢের অভিমানী ছেলে দেখেছি বাবা—তোমার মতো কাউকে দেখি নি। তার কালো হুটো ডাগর চোখে স্বপ্ন নেমে এল। আর সেই সুখস্বপ্নের ঘোরেই বিড় বিড় করে বলল, সাদীর খরচপত্রের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমাকে ব্যাটার বৌ করে নিয়ে যাওয়ার জন্ম তোমার বাপজান পা বাড়িয়েই আছে—ধুমধাম করেই বুড়ো—

সাদীর পর তোকে নিয়ে বেড়াতে যাব না। কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা শোনালো ভিখুর গলার স্বর। নসীবনের সরল, নিষ্পাপ মুখখানার দিকে সে মুখ তুলে তাকাতে পারল না। নসীবন কিন্তু বর্ষার কদমফুলের মতো রোমাঞ্চিত হয়ে তার কাছে এল। আর ক্ষীণ আলোয় যেমন পুঁথি পড়ে তেমনি করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সাদীর পর আমাকে নিয়ে কেমন করে হুটোপাটি করবে সেইসব মতলব আঁটা হচ্ছে বুঝি এখন থেকে? একটু থেমে, চিবুকটা নেড়ে বর্ষীয়সী মহিলার মতো বলল, কী দুষ্টু রে বাবা—আবার উৎসুক হয়ে বলল, আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে গো—কতদূরে যাবে?

তুই টাকাটা তো দিস। তোর কাছে জমানো যত টাকা আছে সব দিবি—

বাবা—বাবা, আমার যা কিছু, সবই তো তোমার গো। ভিখুর মাথার ঘন কোঁকড়ানো একরাশ চুলের ভেতরে বিলি কাটতে কাটতে বলল নসীবন, সেকথাও কি তোমাকে মুখ ফুটে বলে দিতে হবে! একটু থেমে আবার বলল, কৈ, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে, তা তো বললে না?

অন্ধকারে একটা প্রেতের মতো বসে রইল ভিখু। তীব্র একটা ব্যথা বুকের ভেতর থেকে পাক খেয়ে খেয়ে গলার কাছে উঠে আসছে।

সাদুল্ল্যাপুরের মাঘী পূর্ণিমার মেলায় নিয়ে যাবে তো?

না—

তাহলে ছোট ধরমপুরের পীরের দরগায়?

না রে না—

ও বুঝতে পেরেছি, কোপাইচণ্ডীর রেশম কুঠিতে—

তুই রেশমের বাইরে কিছুই ভাবতে পারিস না, না রে নসু?

তাহলে বল না কোথায়? অভিমানিনী কিশোরীর মতো আদুরে গলায় নসীবন বলল, খোলাখুলি না বললে কিন্তু ভালো হবে না বলছি!

আমাদের রোস্তনপুর আর নিমাসরাই ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরে রে—ভিখুর চোখদুটোর দৃষ্টি সুদূর হয়ে ওঠে, গৌড়ের চিড়াইবাড়ির ঘাট থেকে গঙ্গায় নৌকো ভাসিয়ে চলে যাব সপ্তগ্রামে —সপ্তগ্রাম থেকে যাব চট্টগ্রামে—

ওরে বাপরে, বাড়ি ছেড়ে এতদূরে গেলে আমার পলুগুলো দেখবে কে গো—বহু টাকার মাল একেবারে—

সে পরে দেখা যাবে—তোর টাকাটা কবে দিতে পারবি?

কত চাই?

পাঁচশো সিক্কা টাকা—

ওরে বাব্বা, এত টাকা আমি কোথায় পাব গো? একটু থেমে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, তা আমার পলু বিক্রির টাকা আর বাপজানের ধান বিক্রির টাকা সব কুড়িয়ে-কাড়িয়ে হবে—হ্যাঁ, হয়ে যাবে পাঁচশো সিক্কা টাকা। এবারে নসীবন মাদ্রাসার ছোট মৌলভীর মতো তর্জনী তুলে বলল, শোন, যা আছে সব তোমার হাতে তুলে দেব, কিন্তু বাড়ীঘর ছেড়ে অতদূরে যাওয়ার তাল-টাল করো না, কেমন?

ন—সু—রে—ও—ন—সু—উ—উ—উ! কোথায় গেলি মা—

আমি আজ যাই, কেমন। বাপজান অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছে। উঠে দাঁড়ালো নসীবন। বন্ধুবিদায়ের ম্লানহাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ভিখুর দরজার কবাটের মতো চওড়া বুকে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিস ফিস করে বলল, তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না গো—বলেই আর দাঁড়ালো না সে। যেন মিষ্টি কোন নেশার মৌতাতের মতো সেই জনহীন নদীতীরের নিরালা পরিবেশের মায়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যেই সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। সাদা শাড়িজড়ানো নসীবনের তন্বী দেহটা অন্ধকারে দ্রুত অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। ভিখুর মনে হলো, দিকচিহ্নহীন অন্ধকারের স্রোতে একটা মরালী ভেসে ভেসে চলেছে। নিঃশব্দে দাবদাহের মতো জ্বলে যেতে লাগল ভিখু। তার মনে হলো, দণ্ডে দণ্ডে প্রহরে

প্রহরে রাত বাড়বে আর ঘুমিয়ে পড়বে নসীবন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়তো দেখবে সুখস্বপ্ন, সাদীর পরে সে স্বামীর সঙ্গে চলেছে সাহুল্ল্যাপুরের মাঘী পূর্ণিমার মেলায়। কিন্তু সে স্বপ্ন কখনো সত্যে রূপায়িত হবে না। সে যেখানে যেতে চায়, যেখানে সে যাবে সেই ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশ ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ স্তেপভূমির ওপারে আরও—আরও দূরে—সুদূর উত্তরে বরফের দেশে, সেখানে কখনো যাবে না—কোনদিন যাবে না নসু,—কে জানে, সে নিজেই যেতে পারবে কি না। তবে তার রক্তের ভেতরে যে আকাঙ্ক্ষা অহর্নিশি কেঁদে কেঁদে মরে তা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত সাদীর বেড়ি সে পায়ে পরবে না—পরতে পারবে না—না—না, কিছুতেই না। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহটাকে মথিত করে বেরিয়ে এল একটা নিঃশব্দ চীৎকার, না—না—নসু, তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না রে—তুই আমাকে এক তিল বিশ্বাস করিস না। দারুণ যন্ত্রণায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার বুকের ভেতরটা। তার মনে হলো—মনে হলো, আকাশের তারায় তারায় বিদ্রূপের নিঃশব্দ হাসি বাজছে আর সেই তীব্র অট্টহাসির হা-হা শব্দ অন্ধকার বিশ্বচরাচরে প্রসারিত হয়ে ওপারের আমবনকে শিউরে দিয়ে আরও দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু যত দূরেই যাক সেই বিদ্রূপের মর্মান্তিক হাসির ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর শব্দটা যেন সে শুনতে পাচ্ছে,—তার হঠাৎ মনে হলো তার মাথার ভেতরে যেন আর একটা আকাশ আছে, হাসির শব্দটা কিছুতেই তার সেই মাথার ভেতরের আকাশটার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। তার সমস্ত শরীরটা দুলে উঠল—তার বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। আর—আর পারল না ভিখু। চীৎকার করে ডাকল—ন—সু—উ—উ—উ একটু দাঁড়া রে—একটু দাঁড়া—বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

আবার কি হলো ?

তোকে—তোকে—আমি হাঁফাতে হাঁফাতে ক্লান্ত একটা জন্তুর মতো বসে পড়ল ভিখু। নসীবন তাকে হাত ধরে তুলল। বলল, বল

না গো—কারও কাছে কিছু শুনেছো, না কি তোমারই কিছু মনে হয়েছে? বলতে বলতে নসীবন তার নরম মোমের মতো হাতটা সস্নেহে ভিখুর বুকের ওপরে রাখল। অমনি খপ করে তার হাতটা ধরে ভিখু একটা বদ্ধ উন্মাদের মতো উদভ্রান্ত গলায় বলল, আমি—আমি তোকে ঠকিয়েছি রে নসু—

ঠকিয়েছো! মানে? এবারে শক্ত হয়ে উঠল নসীবনের চোখ দুটো, হ্যাঁ, মিথ্যে বলেছি রে তোকে—তোকে মিছে কথা বলতে কষ্ট হয়—

কি মিছে কথা বলেছো?

তোর কাছে টাকা নিয়ে আমি জাহাজ কিনব রে নসু।

কী! অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠল নসীবন। খরিস গোক্ষুরের জিভের মতো চোখদুটো চিক চিক করতে লাগল। কিন্তু একটাও কথা বলল না। নিরুদ্ধ আর তীব্র ব্যথার উজান ঠেলে আর একটা কথাও সে বলতে পারল না। আর বলারই বা কি থাকতে পারে! তার মনের অন্ধকারে চকিতে দুলে উঠল বাফতার চুরিদার পাঞ্জাবি আর মালদহী সিল্কের লুঙ্গীপরা দবির খাঁর গোলগাল চেহারাটা। কেমন রক্তহীন, পাণ্ডুর মুখ আর অপলক দুটো চোখের ভরসা হারা দৃষ্টিতে ভিখুর অনুতপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বলল, তুমি আর কখনো আমার সঙ্গে দেখা কবো না। বলেই মাথা নীচু করে ঝড়ের বেগে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। ভিখুও হয়তো তার পিছু পিছু ছুটে যেত, হয়তো বোঝাতে চেষ্টা করতো. নিষেধ করতো তার ওপর মিথ্যে অভিমান করতে। কিন্তু—

কিছুই করতো পারল না—কিছু করা হলো না। যেই নসীবনের দিকে এগিয়েছে, অমনি ছুটতে ছুটতে এল একটা ছায়ামূর্তি! আর ভিখুর সামনে এসেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, দাদাবাবু গো—শীগ্‌গীর চল—মা—

মা-র কি হয়েছে রে আলেক—কি হয়েছে?

সেই বিকেল থেকেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে গো দাদাবাবু—

অ্যাঁ! আঁতকে উঠল ভিখু। শির শির করে উঠল তার বুকের ভেতরটা, তোমাকে সেই থেকে কত জায়গায় যে খুঁজেছি, রামু-গোঁসাইয়ের জাহাজ তৈরির কারখানায়। হোসেনচাচার বাড়ি। হাকিমসাহেবের ডেরায়—

ভিখু একটাও কথা বলল না। দাঁতে দাঁতে চেপে ধরে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল আর ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর একটা কিছু, সাংঘাতিক কোন বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য নিজেকে তৈরি করল। মা-কে জড়িয়ে টুকরো টুকরো হাজারো সুখের স্মৃতি একটা রঙীন মিছিলের মতো তাঁর চোখের সামনে দিয়ে যেতে লাগল। ধূ ধূ বিস্তীর্ণ মরুবিস্তারের মতো তাদের সংসারে একমাত্র মা-ই তার কাছে মরূদ্যানের স্নিগ্ধ সবুজ ইশারা। সেই মা হয়তো তাকে দেখতে চেয়েছে। একবার দেখার জন্য কত আকুলি-বিকুলি করেছে, আর সে তখন মূর-বণিকের ডেরায় কি ভেনিসের সওদাগরের কাছে ভিখারীর মতো ঘুর ঘুর করছে একটা জাহাজের আশায়! নিজের ওপর এবং নিজের দুর্দম বাসনাটার ওপর মর্মান্তিক আক্রোশে জ্বলে যেতে লাগল। কেন নিমাসরাইয়ের খলিলের ছেলের মতো, কি রুকুনপুরের জোতদার সামসুদ্দিনের ছেলে রসিদুলের মতো মোষের পিঠে চড়ে গলা ছেড়ে গান গেয়ে বাপের চাষবাস দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে পারল না?

কেন, হা আল্লা—রেশমের ব্যাপারীর ঘরেই যখন পয়দা করালে তখন তার মনের ভেতর এই বিষাক্ত পোকার মতো বড়লোকী বাসনাটা ঢুকিয়ে দিলে? কেন—কেন—কেন? যন্ত্রণায় তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আলেক, মা-কে গিয়ে দেখতে পাব?

আল্লা জানে দাদাবাবু—

॥ নয় ॥

আপনি তাহলে আমাদের ছেড়ে যাবেন বলছেন ?

আমার এক জায়গায় বেশিদিন ভালো লাগে না।

কোথায় যাবেন বলে ভাবছেন ?

দেখি তো। ওই যে রেশমের ব্যাপারী মজিবরের ছেলে ভিখু বাশিয়ায় যাবে বলে ঝুঁকেছে, ও যদি যেতে পারে—

তাহলে কি ওর সঙ্গেই পাড়ি দেবেন ঠিক করেছেন ? কিন্তু সে নিশ্চয়ই ব্যবসা করতে যাবে, আপনি কি করতে যাবেন ?

আমি কেন যাব ? ম্লান হাসল হাকিমসাহেব। সাবেক দিনের কোন বেদনা ভরা স্মৃতি তার চোখের পাতায় ঘন হয়ে নামল।

আরে কবিরাজমশাই যে! আসুন—আসুন! হোসেনচাচা সহাস্যে অভ্যর্থনা করল। আপনি কষ্ট করে দোকানে চলে এলেন একেবারে! একটু কাউকে দিয়ে খবর দিলেই পারতেন—

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী রামতারণ সেন কোন কথা বলল না। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল গৌড়ের প্রধান রাজপথের ওপরে মার্বেল পাথরে তৈরি সুদৃশ্য বিপণি। তাব্রিজের সুকোমল কার্পেটে আগাগোড়া মোড়া তার মেঝে। চারদিকে মেহগিনি কাঠের বড় বড় সেল্‌ফে থরে থরে সাজানো রকমারি বিদেশী পণ্যের সমারোহ। রঙীন কাঁচের জারে হলদে রঙের জীবাশ্ম, উত্তর সমুদ্রের শীলের বিশাল দাঁত, কাস্পিয়ান-ভল্গা উপত্যকার বিভিন্ন জন্তুর চামড়া, পশম আরও টুকিটাকি কত রকমের পণ্যসামগ্রী! আর ঝাড়-লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরির আলোয় ঝকমক করছে রুশী তলোয়ার।

কি দেখছেন কবরেজমশায়—কি নেবেন বলুন ?

আমি যা খুঁজছি, তা তো দেখছি না ভায়া!

কি চাইছেন, বলুন না ?

বনৌষধি হোসেনচাচা—বাগদাদে ওষুধের জন্য কোন গাছ-গাছড়া কেনেন নি ?

তাব্রিজে দেখেছি বটে, দু'একজন রুশীয় ব্যবসায়ী রাস্তার পাশে কতগুলো শুকনো শেকড় আর কে জানে কোন্ গাছের ডালপালা নিয়ে বসে আছে।

আহা, সেগুলোই কিনলেন না কেন ?

গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলে কেমন করে কিনব কবরেজমশায় ?

হতাশ হয়ে চলে গেল আয়ুর্বেদশাস্ত্রী রামতারণ সেন। হোসেন-চাচা বলল, রাশিয়ার যে কোন জিনিসের কী চাহিদা দেখেছেন হাকিমসাহেব ?

হাকিমসাহেব একটাও কথা বলল না। কে জানে কোন্ গভীর চিন্তার ভেতরে যেমন মগ্ন হয়ে ছিল তেমনিই রইল। কি এত ভাবছেন হাকিমসাহেব ?

অ্যাঁ ! যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, একটু আগে জিজ্ঞাসা করছিলেন না হোসেনচাচা, কেন রাশিয়ায় যেতে চাই ? একটু থেমে বলল, কবরেজমশায় যা খুঁজছিলেন, ঠিক তারই খোঁজেই আমি যেতে চাই হোসেনচাচা।

বলেন কি ! গাছ-গাছড়ার শেকড় কিনতে পাড়ি দেবেন রাশিয়ায় ?

আপনি তো জানেন না হোসেনচাচা, ওই বনৌষধি আদৌ রাশিয়ার পণ্য নয়।

তাই নাকি ! আমি যে দেখেছিলাম তাব্রিজে, আবাদানে রুশীয় ব্যবসায়ীরা—

রাশিয়ার বণিকরা কোথা থেকে এই বনৌষধি নিয়ে আসতো জানেন ? হাকিমসাহেবের চোখছুটোর দৃষ্টি সুদূর হয়ে উঠল। সেই

অনেক যুগ আগে থেকেই টোবোলস্ক থেকে রাশিয়ার সওদাগররা উটের পিঠে চড়ে চলে আসতো বুখারায়, সেখানে এসে সেখানকার বণিকদের দলের সঙ্গে মিশে খাড়া খাড়া ন্যাড়া পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে আফগানিস্তান পেরিয়ে চলে আসতো একেবারে তিব্বতে। থামল হাকিমসাহেব। চোখদুটো সরু—খুব সরু করে তাকিয়ে রইল দূরে গৌড়ের সারি সারি আলোকমালায় সজ্জিত প্রাসাদ-শীর্ষের দিকে। মনে হলো সে যেন দেখছে—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সেই পাহাড়ের গা বেয়ে তুষার-গলা নীলবর্ণ নদীরা তীব্র বেগে নেমে আসছে। সে যেন শুনতে পাচ্ছে রাশিয়ার সেই দুঃসাহসী ব্যবসায়ীদের উটের ঘণ্টাধ্বনির সেই দূরাগত শব্দ—ডিং—ডং—ডিং—ডং—ডিং—ডং—

গাছ-গাছড়ার ওষুধ কি তারা তিব্বত থেকে কিনতো হাকিম-সাহেব?

কিনতো নয়, এখনও কেনে হোসেনচাচা।

কারা বিক্রি করে ওগুলো?

তিব্বতীয় পুরোহিতরা। আসলে কিন্তু পুরোহিত নয়, যারা বনৌষধি বিক্রি করে, তারা নিজেরাই চিকিৎসক। একটু ভেবে বলল হাকিমসাহেব, হয়তো বিচিত্র সব গাছ-গাছড়ার ওষুধে অনেক জটিল দুরারোগ্য রোগ সেরে যায় বলেই চিকিৎসকদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের পুরোহিত বলা হয়।

থামল হাকিমসাহেব। তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় হোসেন-চাচার চোখদুটোর দৃষ্টি অগাধ হয়ে উঠল। বলল, কোন্ ধরনের গাছ-গাছড়ায় কি রোগ সেরে যায় সেসব কথাও আপনি নিশ্চয়ই কিছু কিছু জানেন হাকিমসাহেব?

কোন কথা বলল না হাকিমসাহেব। ম্লানহাসির আভাসে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, কিছু কিছু জানি

বৈকি। যখন তাব্রিজে, আবাদানে ছিলাম, তখন তো রীতিমত এই সব গাছ-গাছড়া দিয়েই চিকিৎসা করতাম।

পুরানো দিনের স্মৃতির ভেতরে ডুব দিয়ে আস্তে আস্তে আবার বলল হাকিমসাহেব, একবার এক পারসিক যুবক এল। বেচারি পেটব্যথায় কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে। তাকে তিব্বতী শেকড় ডিওসকোরিয়া ভিলোসা গুঁড়ো করে একটু জলের সঙ্গে খাইয়ে দিলাম, ব্যস—দেখতে দেখতে কর্পূরের মতো উবে গেল তার ব্যথা।

আপনি যদি আমার সঙ্গে এবার যেতেন তাহলে এইসব গাছ-গাছড়া কিছু কিনে নিয়ে আসা যেত হাকিমসাহেব।

হোসেনচাচা আছেন নাকি? স্বর্ণখচিত বহুমূল্য বস্ত্রের আবরণ দেওয়া একটা সুদৃশ্য পাল্কির ভেতর থেকে চিৎকারটা ভেসে এল। শিবিকা থেকে বেরিয়ে এল গৌড়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ সাহা। পট্টবস্ত্র পরা রাঙা টুকটুকে চেহারাটা আগুনের শিখার মতো জ্বলছে। দোকানের দিকে আসতে আসতে আবার হেঁকে বলল, বাগদাদ না ফাগদাদ কোন্ চুলো থেকে এসে এমন ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন চাচা!

তার ভারী কণ্ঠস্বরে দোকানঘরটা গমগম করতে লাগল। হোসেনচাচা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন—আসুন সা-মশাই—ফ্যাসাদের আবার কি হলো?

আরে হাকিমসাহেব যে! উচ্ছ্বাসে তাকে জড়িয়ে ধরল বটকৃষ্ণ, হেসে বলল, আপনার মতো গুণীলোকের দেখা পাওয়াও সৌভাগ্য হাকিমসাহেব!

হাকিমসাহেব কথা বলল না। সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। হোসেনচাচা বলল, কি অসুবিধা হয়েছে বলুন তো সা-মশাই?

আরে অসুবিধার কথা আর বলব কি, হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল বটকৃষ্ণ, গৌড়সুদ্ধ মানুষ জানে, পাইকার

বটা সা বাঘের দুধ মেলাতে পারে। আমার এই খ্যাতিই আমাকে মেরেছে চাচা—কাল রাত্রে চোখের পাতা দুটো এক করতে দেয় নি জানেন!

হোসেনচাচা আর হাকিমসাহেবের চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটে ওঠে। তারা জানে খুব হৈ-চৈ করে বাড়িয়ে কথা বলা বটা সার অভ্যাস। কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে, সত্যি-সত্যি একটা কিছু হয়েছে।

কি? অবাক হয়ে যাচ্ছেন—তাই না? একটু থেমে হো-হো করে হেসে বলল বটকৃষ্ণ, আশ্চর্য হওয়ারই কথা—একটু থেমে হোসেনচাচার দিকে তাকিয়ে চোখদুটো নাচিয়ে বলল, আরে এই গোলমালের মূলে তো আপনি! আপনিই তো নাটের গুরু! তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে এখন বোকা সাজছেন।

হোসেনচাচা আর হাকিমসাহেবের মুখের ভাব দেখে মনে হলো জটিল কোন ধাঁধার উত্তর খুঁজছে। বটা সা আবার হোসেনচাচার নাকের কাছে হাত ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, সেদিন যে জাহাজঘাটে রাশি রাশি রকমারি মাল এনে নামালেন সেগুলো কোথায় গায়েব করে বসে আছেন বলুন তো?

হোসেনচাচা কি যেন বলতে গেল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করল বটা সা, গৌড়ের দোকানীরা ওদিকে আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে বলতে লাগল, চাচা বাগদাদ থেকে রাশিয়ার না কি কোথাকার খুব ভাল ভাল মাল নিয়ে এসেছে। তারা কেউ বলে, চাচা নিয়ে এসেছে রাশিয়ার মোম এবং মধু, আবার কেউ বলে, চমৎকার চামড়া, শনের দড়ি, গাছের ছাল নিয়ে এসেছে—আর সেগুলো সব নাকি পাইকারী দরে আমি কিনেছি। আমি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের নিরস্ত করতে না করতেই এল আড়ং-ঘাটার পাখির কারবারী বিষ্টু দাস। সে তো ঝুলাঝুলি, চাচা নাকি ভল্লা না মল্লা কোথাকার অনেক শিকারী পাখি—সেই পাখি—

শুনুন—শুনুন সা-মশাই, এবার হোসেনচাচা তার গলার আওয়াজকেও ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল, সব মাল আমি গুদামে তুলে রেখেছি। পড়্তা রেখে দর-দাম কত হবে ঠিকঠাক করতে একটু সময় লাগবে তো!

এই দেখ দিকি, আপনি কি রকম ব্যবসাদার মশাই! বাজারে ওই সব মালের কি দারুণ চাহিদা আর আপনি—

কী করব বলুন সা-মশাই। আমি একা মানুষ—

আচ্ছা চাচা—আপনি কথা দিন, সব মাল কি আপনি আমাকে বিক্রি করবেন?

আচ্ছা—আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

না—না, দেখা যাবে নয় চাচা, ব্যাকুল হয়ে চাচার হাতদুটো ধরে বলল, আপনি কথা দিন! হেঁকে বলল পাল্কির বেহারাদের, হ্যাঁরে, তোরা কে কোথায় গেলি রে—চল্, আবার গঙ্গার পাড়ে আমার গুদামটা ঘুরে যেতে হবে। পাল্কিতে বসে আবার হেঁকে বলল বটা সা, আমার কথাটা মনে থাকে যেন হোসেনচাচা!

রাত বাড়ে। বৃক্ষশোভিত রাজপথের মোড়ে মোড়ে বাতিগুলো মৃতের মতো নিস্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। পথ ক্রমশঃ জনবিরল হয়ে আসছে। হাকিমসাহেবের চিন্তাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল হোসেনচাচা, রাশিয়ার জিনিসের এখানে কী চাহিদা দেখেছেন?

আপনি তো তাব্রিজের ওপারে যান নি। কাস্পিয়ানের ধারের দেশগুলোতে গেলে দেখতেন, আমাদের দেশের মসলিন আর সিল্কের কি আদর!

হুজুর—হুজুর, ছুটতে ছুটতে এল দ্বাররক্ষী, একটা লোক আমাদের দোকানের দিকে কেমন করে তাকাতে তাকাতে চলে গেল—মনে হলো পাঠান—

পাঠান! চিন্তার কতগুলো কালো কালো ছায়া হোসেনচাচার

মুখের ওপর ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, তুমি তাকে কোন জেরা করলে না কেন?

আমি তার দিকে ছুটে যেতেই হন্ হন্ করে হেঁটে চিড়িয়ার মোড়ের ঠিক আগের গলিতে ঢুকে পড়ল হুজুর!

তুমি যাও—

নিশ্চয়ই ঈশা খাঁর গুপ্তচর! দুঃস্বপ্নের ঘোরে যেন বিড়বিড় করে বলল হোসেনচাচা।

একটা কথাও বলল না হাকিমসাহেব। তার মনে হলো হোসেনের আশঙ্কা অমূলক নয়। গৌড়বঙ্গের বায়ুমণ্ডলে অশান্তির আগুন এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। রাজমহলের যুদ্ধে নিহত হয়েছে পাঠান-সর্দার গৌড়াধীপ দাউদ খাঁ। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় অবসান হয়েছে পাঠান রাজত্বের। সম্রাট আকবর হোসেনকুলী খাঁ ওরফে খান-ই-জাহানকে পাঠিয়েছেন বাংলার শাসনকর্তা করে। কিন্তু দাউদের অনুচররা ভুঁইয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে করিমদাদ ইব্রাহিম খাঁ আর ঈশা খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে।

কি ভাবছেন হাকিমসাহেব?

যে কোন মুহূর্তে একটা যুদ্ধ-টুদ্ধ বেধে যেতে পারে চাচা। একটু থামল হাকিমসাহেব। আবার ভেতরে ভেতরে কিসের যেন যন্ত্রণায় ছটফট করে বলল, তাই তো যত শীগ্‌গীর পারি বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

হ্যাঁ, যুদ্ধ আরম্ভ হলে খুবই অসুবিধা হবে।

ভিখু বোধহয় ভেনিসের সওদাগর ম্যাকেঞ্জি ফ্রেডারিকের কাছ থেকে সস্তায় একটা জাহাজ পেয়ে যাবে, একটু অনুনয়ের হাসি হেসে বলল হাকিমসাহেব, আপনি যদি একটু সাহায্য করেন চাচা!

আরে এত করে বলছেন কেন? আমি এই এলাম, তা নাহলে আমিই ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে পাড়ি দিতাম হাকিমসাহেব। একটু কি চিন্তা করে বলল হোসেন, ভিখুকে আমিও একটা জাহাজ কিছু

কম-সম করে দিতে পারি, কিন্তু মজিবরের সঙ্গে আমার বিবাদ বেধে যাবে নির্ঘাত।

সে চিন্তা আপনি করবেন না চাচা। আপনি দেখুন—কোন্ জাহাজটা দিতে পারেন। অনেক রাত হলো—আমি যাই, কেমন! দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল হাকিমসাহেব।

হাঁটু পর্যন্ত সাঁওতালী কাপড় পরা, গায়ে ফতুয়া, মাথায় খাড়া খাড়া কদমছাঁট চুল, সেই অশ্চর্য রকমের রহস্যময় মানুষটার ছায়া-দেহের দিকে তাকিয়ে মনে হলো হোসেনের, রেশমের ব্যাপারী মজিবরের ছেলের বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য, না নিজেরই কোন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে! খোদা জানে! সে যাই হোক, মহানগরী গৌড় হারাবে সত্যিকারের একজন গুণী মানুষকে, হারাবে সুদক্ষ চিকিৎসককে। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হোসেন। কর্মচারীদের হেঁকে বলল, এই তোমরা দোকান বন্ধ কর হে—রাত অনেক হলো।

খট-খট-খট—হঠাৎ প্রায় জনহীন নিস্তব্ধ রাজপথে অশ্বখুরের ধ্বনি বেজে উঠল। ঠিক হোসেনের দোকানের সামনে এসে তেজিয়ান ঘোড়ার বল্গা সংযত করল অশ্বারোহী—এক মোগল যুবক। তার পরনে তঞ্জেব মসলিনের নীলাভ বস্ত্র, গায়ে স্বর্ণখচিত রক্তলাল মখমলের মেরজাই আর বক্ষোদেশে দোদুল্যমান তিনটি স্বর্ণপদক। কোমরবন্ধের তীক্ষ্ণধার তরবারি দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যুবক সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

তোমার মালিক কোথায়? দ্বাররক্ষীকে প্রশ্ন করল সে।

সেলাম-সেলাম! আদাব হুজুর, মেহেরবাণী করে বলুন কী দরকার! বিনয়ের হাসিতে গলে গলে হাতজোড় করে বলল হোসেন, হুজুর, আমিই আপনার এই বান্দা, দোকানের মালিক।

আপনার সঙ্গে খুব জরুরী কথা আছে।

আচ্ছা হুজুর—আসুন—ভেতরে আসুন!

আপনি বোধহয় আমার পরিচয় জানেন না। বলেই জামার ভেতর থেকে পাঞ্জা বের করে তার চোখের সামনে তুলে ধরল। আর সেই মুহূর্তেই হোসেনের দুটো চোখে সম্ভ্রমের দৃষ্টি ফুটে উঠল। অস্ফুটস্বরে বলল, আপনিই মনসবদার কতলু খাঁ! হুজুর, বলুন আমি কোন অপরাধ করেছি—

আরে না না, হো-হো করে হেসে হোসেনের দুর্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে কতলু খাঁ বলল, সেনাবিভাগের কোন লোক দেখলেই আপনারা এত ভীত হয়ে ওঠেন কেন? যাক্ শুনুন—

একটু থামল কতলু খাঁ। দেওয়ালগিরি আর ঝাড়বাতির আলোয় ঝলমলে রাশি রাশি পণ্যসামগ্রীর দিকে চোখ বুলিয়ে নীচু গলায় বলল, যে জন্য এসেছি—কৈ, তা তো দেখছি না!

কি কিনতে এসেছেন হুজুর বলুন, আমি আপনার—

কোন কথা বলল না কতলু খাঁ। তার দুটো চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। দুরু-দুরু কাঁপতে লাগল হোসেনেব বুক। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার আশঙ্কিত মুখেব দিকে তাকিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল কতলু খাঁ, খোদার কসম খেয়ে বলুন, যা জিজ্ঞাসা করব, তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন?

আল্লার কসম খেয়ে বলছি, আমি মিথ্যে কখনো বলি না হুজুর।

আপনার দোকানে আজ সন্ধ্যায় কোন্ কোন্ খরিদ্দার এসেছিল?

কবরেজ রামতারণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী—

আর?

বটা সা—

কি কিনতে এসেছিল?

আমি বাগদাদ থেকে যে মাল এনেছি, সেই সব মাল পাইকারী দরে কিনতে চেয়েছিল।

আপনি কি বলেছেন ?

আমি সময় চেয়েছি হুজুর, আমার পড়তা রেখে দর-দাম—

বেশ-বেশ, ঠিক আছে। তাকে কিছু বিক্রি করেন নি তো ?

না হুজুর, আমার মাল—

আর কেউ এসেছিল ?

হ্যাঁ হুজুর, আমার দোস্ত হাকিমসাহেব।

ও, তিনি তো সাধুসন্ত মানুষ। আর কেউ এসেছিল ?

না হুজুর।

স্মরণ করে দেখুন তো, আর কোন সন্দেহজনক ঘটনা ঘটেছিল ?

সন্দেহজনক! মনের ভেতরে ডুব দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঝিকিয়ে উঠল হোসেনের চোখদুটো। ও হ্যাঁ —হ্যাঁ হুজুর, আমার দ্বাররক্ষী দেখেছিল, একটা লোক কেমন করে যেন আমার দোকানের দিকে তাকাতে তাকাতে—

ব্যস-ব্যস, বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। শুনুন, আমাদের কাছে গোপন খবর আছে ভাটিয়া থেকে পাঠান সর্দার করিমদাদ ইব্রাহিম খাঁ কিছুদিন আগে এক ছদ্মবেশী গুপ্তচর পাঠিয়েছে গৌড়ে। যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহই তার প্রধান উদ্দেশ্য। একটু থেমে দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে আবার বলে চলল মনসবদার কতলু খাঁ, মেঘনা নদীর ধারে ধারে ভাটিয়ার গভীর জঙ্গলে ইব্রাহিমের সঙ্গে ঈশা খাঁ আর ভুঁইয়ারা জোট পাকিয়ে সৈন্য সমাবেশ করছে।* আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

তা আমি—আমাকে কি সাহায্য করতে হবে হুজুর ?

থামুন! হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বহুদূরের সেই অদৃশ্য পাঠানদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল কতলু খাঁ, কুকুরগুলো ভেবেছে নদীনালায় ভরা সেই জল-জঙ্গলের দেশে আমরা যেতে পারব না—রাজা টোডরমল্ল এবং আমাদের সুবাদার খান-ই-

* 'গৌড়ের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড—রজনীকান্ত চক্রবর্তী।

জাহানও প্রতিজ্ঞা করেছেন বাংলা মুলুককে পাঠানশূন্য করবেন—তাই খুব শীগ্‌গীরই ভাটিয়াতে যুদ্ধযাত্রা—

আমাকে কি সামরিক তহবিলে কিছু চাঁদা—

আ! আপনি বড় বেয়াকুব দেখছি! বিরক্তিতে জ্বলে উঠল মনসবদার কতলু খাঁ, বলল, কেন, রাজকোষে কি অর্থের অনটন হয়েছে?

আমার গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর!

শুনুন, আমাদের গুপ্তচর-বিভাগের খবর হচ্ছে, ভাটিয়া থেকে প্রেরিত সেই পাঠান কুকুরটার নজর পড়েছে আপনার দোকানের ওপর!

সে কী হুজুর! আমি—আমি—আমার—

আ! ভয় কি, আমরা তো আছি। বলেই তেল-ফুরিয়ে-আসা নিস্তেজ সেই ঝাড়বাতি আর দেওয়ালগিরির ম্লান আলোয় ভরা বিশাল দোকানটার চারদিকে সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে হোসেনের কানে কানে ফিসফিস করে বলল কতগুলো ভয়ঙ্কর গোপনীয় কথা।

অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল হোসেনের মুখে। বলল, সে তো হুজুর—যেমন কাঠের বাক্সে করে এনেছি—ঠিক তেমনি আছে!

হ্যাঁ, হুঁশিয়ার! একটা—একটাও বিক্রি করবেন না কাউকে। একটু থেমে আবার কতলু খাঁ বলল, আমার এই পাঞ্জা নিয়ে যে আসবে তাকে বাক্স ধরে দিয়ে দেবেন, বুঝেছেন! তারপরে ফৌজদারের মুৎসুদ্দির কাছে গেলেই আপনার জিনিসের দাম পেয়ে যাবেন। বলেই সেই পারস্যের সোনালী সুদৃশ্য কার্পেটে মোড়া মেঝের ওপরে জরি-বসানো সৌখীন নাগরা জুতোর ছাপ এঁকে এঁকে আর মস্‌মস্‌ শব্দ তুলে চলে গেল সুবাদার খান-ই-জাহানের পাঁচহাজারী (পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের দণ্ডমুণ্ডের মালিক) মনসবদার কতলু খাঁ।

সদরগলি হিপ্পো

হিপ্পোলো হুকুম্মা

ভাঁয়ে ঝটকি বাঁয়ে ঝটকি হিপ্পো

হুকুম্মা—

পাল্কিবাহকদের গানে রাত্রির নিস্তব্ধ রাজপথ সচকিত হয়ে উঠেছে। সুষুপ্ত গৌড় মহানগরী। কালোপাথরে বাঁধানো রাজপথের দু'পাশে দেওদারবীথির অতিকায় ছায়ার আড়ালে এক-একটা সুরম্য প্রাসাদকে প্রেতের মতো মনে হচ্ছে। এখন এই প্রতিটি প্রাসাদের রুদ্ধদ্বার কক্ষে গৌড়ের সুখী বিলাসী নাগরিকরা যে-যার প্রিয়ার কণ্ঠলগ্ন হয়ে গভীর নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আর সে! তার মনের ভেতরে জুলিয়ার গম্ভীর আর কঠিন মুখাবয়ব চকিতে একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মনটা। নিজেরই জীবনটার ওপর মর্মান্তিক আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল সে। তার যেমন অন্দরমহল তেমনি তার বাইরের মহল। কেমন করে দিকে দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল বাগদাদ থেকে সে কাস্পিয়ান—ভল্লার দেশের চালানী তলোয়ার নিয়ে এসেছে, কেমন করে জানল মনসবদার কতলু খাঁ—সেই তলোয়ারের ইস্পাতের জুড়ি নেই দুনিয়ায়! মনে পড়ল চিড়াইবাড়ির সেই লোকে লোকারণ্য জাহাজঘাটে যখন হৈ-হৈ করে মাল নামানো হচ্ছিল, তখন হাকিমসাহেব ওই তলোয়ারের গুণপনা সবিস্তারে বর্ণনা করছিল—স্বয়ং সুবাদারেরও কানে গিয়েছে সেই সংবাদ। তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, ভাটিয়ার যুদ্ধ-অভিযানে এই তলোয়ার চাই—কিন্তু সে যা হোক, সে ব্যবসায়ী। সেই তলোয়ার চড়া দামে বিক্রি করে দুটো পয়সা লাভ করবে ভেবেছিল, কিন্তু সে গুড়ে বালি! এখন দেশের স্বার্থে, দেশের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই সরকারী বাঁধা দরে মাল ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্যই সেটা—

জলের দর!

পাল্কি থামল।

অন্ধকারে একটা প্রেতচ্ছায়ার মতো তার বিশাল সুরম্য অট্টালিকার দিকে তাকিয়েই হোসেনের মনটা ভারী হয়ে উঠল। এই প্রাসাদোপম সৌধ দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, তার ভেতরে কী তীব্র অশান্তির আগুন দিবানিশি ধিকি ধিকি জ্বলছে। কেউ জানে না, এই প্রাসাদেরই এক সুরম্য কক্ষে বাস করে এক কুপিতা নাগিনী!

জুলিয়াবিবির সেই খাস-কামরার সামনে এসে থমকে-দাঁড়ালো হোসেন। হাট করে খোলা দরজা। অন্ধকার ঘর। গেল কোথায় জুলিয়া? তার বুকের ভেতরটা অসহ্য—অসহ্য একটা জ্বালায় চিন চিন করে উঠল। তাহলে তার কানে যা পড়ে, পাড়া-প্রতিবেশীরা যা বলে, সেসব মিথ্যে নয়! আজ আসুক সে, একটা ফয়সালা করে ফেলবে।

সেই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন অলিন্দের কার্নিসের আড়ালে ধূর্ত অভিসন্ধির একটা ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল হোসেনচাচা।

নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল জুলিয়া। পান্না-হাজরা জামদানীর ওড়না লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। কালোসাপের মতো দীর্ঘ বিনুনিতে জড়ানো বফত-হানা মসলিন। আর বেণীপ্রান্তে দুলছে একটা নিপিষ্ট নার্গিসের কোরক। পরনের প্রায় স্বচ্ছ সেই আবোরোয়ান শাড়িও কেমন বিস্রস্ত। অভিসার শেষে আশ্লেষসুখে আচ্ছন্ন ও বিবশ নায়িকার মতো জুলিয়া ক্লান্ত পদক্ষেপে যেই তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো, অমনি ক্রুদ্ধ বাঘের মতো এগিয়ে এল হোসেন।

কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

কথা বলল না জুলিয়া। শুধু তার দিকে আক্রোশভরা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে যেই ঘরের দিকে পা বাড়ালো, অমনি হোসেন তার

পথরোধ করে দাঁড়ালো। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কথা বলছো না কেন, নিশ্চয়ই ইয়াসিনের ঘরে গিয়েছিলে!

কোন কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে রাজী নই আমি। হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো হোসেনের দিকে খরচোখে তাকিয়ে বলল জুলিয়া। একটু থেমে বলল, তার আগে তুমি বল, তুমি যেমন আমার জীবনটাকে বরবাদ করে দিয়েছো—তেমনি নসুর জীবনটাকে নষ্ট করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

আচমকা পাল্টা আক্রমণে হতভম্ব হয়ে গেল হোসেন। বিড় বিড় করে বলল, মানে—নসু—কে?

কেন? নসীবন আমার ভাই ওই আলমসাহেবের মেয়ে তা তুমি জান না? ভিখুর সঙ্গে তার সাদীর সব ঠিকঠাক। একটু থেমে তীব্র অবরুদ্ধ ব্যথার উজান ঠেলে ভার-ভার গলায় বলল জুলিয়া, তুমি আর হাকিমসাহেব মিলে ভিখুকে কালাপানিতে পাঠানোর চেষ্টা করছো—

কোন কথা বলল না। বলতে পারল না হোসেন। সমস্ত ব্যাপারটা একবাব তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করল। সন্ধ্যায় যখন হাকিমসাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল, সেই সময় একবাব তহ্‌বিলের চাবি আনতে বাড়িতে পাঠিয়েছিল তার এক কর্মচারীকে। নিশ্চয়ই তার মুখেই শুনেছে, ভিখুকে বিদেশে পাঠানোর পরামর্শ চলছে। আর তারই এই বাড়ির নীচের তলায় থাকে যে তার তরুণ গোমস্তা, সেই ইয়াসিনের সঙ্গে ওর অবৈধ প্রণয়টা সে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে বলেই ভিখুর প্রসঙ্গ তুলে সেটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আরও মনে হলো, কোথাকার কোন্ দূরসম্পর্কের ভাই আলমসাহেবের মেয়ে নসীবনের জন্য নয়, ভিখুর সুন্দর চেহারাটার ওপর নজর পড়েছে ওই শয়তানীর।

দেখ জুলিয়া, পুরুষমানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য বিদেশে গেলেই তার বিবির জীবনটা বরবাদ হয়ে যায় না। প্রত্যেকটি কথা

কেটে কেটে অভিশাপ উচ্চারণ করার মতো করে হোসেন বলল, তবে তোমার মতো কামুক আর উচ্ছৃঙ্খল—

চুপ কর শয়তান বেতমিজ কোথাকার! যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল জুলিয়া, তুমি মাসের পর মাস ওই বেশ্যামাগীকে নিয়ে কালাপানির দেশে দেশে ফুর্তি করে বেড়াবে আর আমি এখানে বসে বসে ঘরের কড়িকাঠ গুনব! বদ্ধ একটা উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করে বলতে লাগল, হ্যাঁ—যাই—যাবই তো ইয়াসিনের ঘরে। যাব যে কোন মরদের ঘরে, আমার যা খুশি করব, আমি—আমি রক্তমাংসের মানুষ, আমারও—আর বাদবাকী কথাগুলো আকুল কান্নার ভেতরে তলিয়ে গেল।

পাথুরে একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল হোসেন।

॥ দশ ॥

চিড়াইবাড়ির জাহাজ তৈরির কারখানা পরিদর্শন করতে আসবেন স্বয়ং রাজা টোডরমল্ল। গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ একটা প্রান্তরে চন্দ্রাতপ লম্বিত হয়েছে। সেই পট্টবস্ত্র নির্মিত চন্দ্রাতপ জরীতে ঝলমল করছে। বিশাল সুদৃশ্য সামিয়ানা থেকে সুন্দর সুগন্ধীফুলের রাশি রাশি মালা লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। তার ঠিক মাঝখানে রৌপ্যনির্মিত এবং স্বর্ণখচিত এক অতি মনোহর সিংহাসন। চারদিকে বীর যোদ্ধা এবং জমিদাররা সুদৃশ্য ও মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত হয়ে বসে আছে। সেই চন্দ্রাতপ ঘেরা সভামণ্ডপের বাইরে তিনদিকে রণসজ্জায় সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে পদাতিক বাহিনী। ঠিক তারপরের সারিতেই উন্মুক্ত তরবারি হাতে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে অশ্বারোহীরা। আর সভার সমস্ত জায়গাটা বেষ্টন করে একটা বিশাল কালো প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে রণহস্তীরা।

দূর-দূরান্তরের গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার নরনারী আসছে সম্রাট আকবরের হিন্দু-প্রতিনিধি রাজা টোডরমল্লকে দেখতে। খান-ই-জাহান অর্থাৎ হোসেনকুলীকে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু মহানগরী গৌড়ের কারো অজানা নেই, হোসেনকুলী নামেমাত্র সুবাদার। আসলে পঞ্চগৌড়ের আপামর জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হলেন মহামতি আকবরের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ অতি বিচক্ষণ রাজা টোডরমল্ল। তিনি যেমন জ্ঞানী, যেমন বহুদর্শী, তেমনি অসাধারণ তাঁর রণনৈপুণ্য। তারা জানে, রাজমহলের যুদ্ধে তিনিই গৌড়ের প্রধান প্রতিভূ দাউদ খাঁকে শুধু নির্মমভাবে পরাজিত করেন নি, নিহতও করেছেন। আর তারা জানে তিনিই প্রথম পাঠান-আফগান অধ্যুষিত বাংলার ভুঁইয়া

জমিদারদের ঘন ঘন বিদ্রোহের অশান্তিতে আচ্ছন্ন বিপর্যস্ত বাংলায় মোগলশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে ধীরে ধীরে শান্তি আর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছেন। তাই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর সম্মান প্রদর্শনের জন্যই কাতারে কাতারে সমবেত হচ্ছে পঞ্চগৌড়ের জনতা। চিড়াইবাড়ির জাহাজ নির্মাণের কারখানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি সামরিক। দক্ষিণ-বঙ্গের সমুদ্রোপকূলে ফিরিঙ্গি জল-দস্যুদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচার আর নদীনালা ও গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ভাটিয়া প্রদেশে পরাজিত পাঠানদের বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রকে দমন করার জন্য প্রচুর রণতরীর প্রয়োজন। তাই স্বয়ং রাজা টোডরমল্ল জাহাজ কারখানায় আসছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এখনও তিনি আসছেন না কেন ?

মহানগরী গৌড়ের পরপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যাস্তের রঙীন আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে মহানগরীর হাজারো প্রাসাদ-শীর্ষ। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে জনতা। উত্তেজনায়, ভয়ে আর রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে জাহাজ কারখানার মালিক বামনারায়ণ ওরফে রামুগোঁসাই। সে সভায় যায় নি। কারখানার চারদিকে যেন তুর্কীনাচ নেচে বেড়াচ্ছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে কাঠ ফাঁড়াইয়ের জায়গা, দেখছে শাল, পিয়াল, সেগুন, জারুল কাঠের গুদাম। হঠাৎ কি মনে হলো, ডাকল কুশাইকে, আচ্ছা, যদি একসঙ্গে আমাদের অনেকগুলো রণতরী তৈরি করতে বলেন রাজা, তাহলে কি বলব, একটু বলে দাও না কুশাই ! ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপে রামুগোঁসাই। মাথার চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘাম জমে ওঠে।

বলবেন আর কি, চট্টগ্রামের কারিগর না পেলে বণতরী তৈরি করা সম্ভব নয় !

সব্বোনাশ, বল কি কুশাই ! একথা বললে রাজা রুষ্ট হবেন না ! জপের মালার থলির ভেতরে রামুর হাতটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

কুশাই কি যেন বলতে গিয়েছিল, কিন্তু ছুটতে ছুটতে এল গোবিন্দ তুণ্ডীল। হাঁফাতে হাঁপাতে বলল, বাবু, শীগ্‌গীর আসুন—গঙ্গায় বজরাগুলো কেমন সাজানো হয়েছে দেখবেন একটু চলুন—

বাবু, নাগকিরদের সভা হয়ে এল বলে শুনেছি, এখুনি এসে পড়বে আমাদের এখানে। খারওয়া দাশুর মুখে দারুণ উত্তেজনার চিহ্ন ফুটেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল ননী সারেঙ, বাবু, আজ এই সময়টুকুর জন্য খেয়া পারাপারটা বন্ধ করে দিলে হয় না? ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে সে বলল, রাজাসাহেবকে দেখতে এত লোক ওপার থেকে আসছে—

তোরা—তোরা পুরানো লোক, জাহাজঘাটে কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললি, দু'হাতে বুক চেপে ধরে শোকার্ত মানুষের মতো ডুকরে উঠল রামুগোঁসাই, তোরা যা হয় নিজেরা বুদ্ধিসুদ্ধি করে করতে পারছিস না?

করেছি তো, আপনার একবার দেখা উচিত নয় কি? ননী সারেঙ চিমটি কাটার মতো করে বলে।

এল।

এল রামনারায়ণ গোঁসাই। কাঁপতে কাঁপতে এল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তারই নিজের কারখানায় নির্মিত সুদৃশ্য তরীগুলোর দিকে তাকিয়ে তার মন থেকে মুছে গেল উত্তেজনার চিহ্ন। কেমন একটা মুগ্ধ তন্ময়তা থমথম করতে লাগল তার চোখে। প্রথম সারিতেই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নদীতে চালানোর নৌকো অর্থাৎ ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা থেকে মন্থরা। ঠিক তারপরেই আছে সত্ত্বরা, জঙ্গলা আর প্লাবিনীর দল, এরা উপকূলের সমুদ্রের উপযোগী অর্ণবযান। আর একটু দূরে নিজেদের আভিজাত্য বজায় রেখে গভীর জলে ভাসছে সিন্ধুগামী জাহাজ ঊর্ধ্বা, স্বর্ণমুখী আর প্লাবিনী। ঢেউয়ের তালে তালে তাদের মাস্তুলগুলো দুলছে। গঙ্গার বুকে তারই কারখানার রাশি রাশি সুদৃশ্য তরীর দিকে তাকিয়ে গর্বে আনন্দে

স্ফীত হয়ে উঠল তার বুকটা। হঠাৎ নিজেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো মনে হলো। মনে হলো এখুনি—এখুনি এই মুহূর্তে সে ইচ্ছে করলেই এই দরিদ্র দুঃস্থ মানুষের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত ধূলিমলিন পৃথিবীর মাটি থেকে বাতাসে ভর করে ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে খেয়ে অনেক ওপরে উঠে যেতে পারে, ইচ্ছে করলেই সে গঙ্গার বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।

জয় রাজা টোডরমল্লের জয়!

জয় রাজা টোডরমল্লের জয় !!

সেই জয়ধ্বনি বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে গঙ্গার পরপারের গ্রাম ছাড়িয়ে দূর-দিগন্তের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। অথচ রামুগোঁসাইয়ের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। সে আচ্ছন্ন আর উদভ্রান্ত একটা মানুষের মতো তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় জলযানগুলোর দিকে মুগ্ধ আর অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। ভুলে গেল—একেবারে বেমালুম ভুলে গেল কয়েক মুহূর্ত আগেও ভয়ে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল যাঁর জন্য, অদূরে তাঁর উপস্থিতির কথা। এই হয়—এই নিয়ম। বিপুল বিত্তবান মানুষ তার ঐশ্বর্যের মোহে স্বয়ং ঈশ্বরকেও বিস্মৃত হয়। হয়ে যায়। কিন্তু—

ঝম্—ঝম্- ঝম্! হঠাৎ নূপুরনিক্বন ধ্বনিত হলো। সেই দূরাগত ক্ষীণ ধ্বনি রাজপুরুষের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্বেল আর লক্ষ মানুষের পদশব্দে মুখর চিড়াইবাড়ির ঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কেউ শুনতে পেল না তার পায়ের আওয়াজ। সে এল, এসে পড়ল রামুগোঁসাইয়ের কাছে। আর তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আরে তুমি! অভিভূত আচ্ছন্নতার সেই দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রামুগোঁসাই। তার সেই তন্বী স্বর্ণলতার মতো বরতনুর কাছে—খুব কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, এখন তো সবে সন্ধ্যে সুন্দরী, এখন তো তোমার

আসার কথা নয়! উহুঁ—উহুঁ—পাকা চুলে ভরা মাথাটা ডানে-বাঁয়ে ঝাঁকিয়ে গানের মতো সুর করে বলল, সখী—সখী, তুমি তো আসবে চুপি চুপি নিশি রাতে আমার—

না, না গোঁসাইঠাকুর, ঠাট্টা করবেন না। আপনার সঙ্গে গোটা কয়েক জরুরী কথা ছিল! দুশ্চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন দুটো চোখের দৃষ্টি দূরে ছড়িয়ে ছাড়া-ছাড়া গলায় বলল কৃষ্ণাবাঈ।

সে কী গো! এখন তোমাকে নিয়ে কি করে বসব সুন্দরী? বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলল, রা—ধা—মাধব—হে! বাঘের থাবার মতো বিশাল হাতটা এগিয়ে এল থিরবজুরী রেখার মতো কৃষ্ণাবাঈয়ের সুঠাম দেহের দিকে। সভয়ে সরে এল কৃষ্ণাবাঈ। সে লক্ষ্য করল, লোভের আভায় দগদগে ঘায়ের মতো জ্বলছে রামুগোঁসাইয়ের চোখদুটো। গোঁসাইঠাকুরের বুকের ভেতরে উগ্র কামনার অগ্নিগোলক তীব্র ক্ষুধায় জ্বলছে। সে-দৃষ্টি কৃষ্ণাবাঈয়ের অজানা নয়। তার মনে হলো, এই সময়—এই সুযোগ! এখন—ঠিক এই মুহূর্তে কামনার জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়বে রামুগোঁসাই, তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠুকবে। এই সময় সে তার স্বার্থ সিদ্ধি করবে। সে ফিসফিস করে বলল, আপনার কাছে আমি একটা পরামর্শ চাই গোঁসাইঠাকুর! একটু থেমে রামুর দেহের ওপরে তার নরম শরীরটা প্রায় ঢেলে দিয়ে বলল, রাজা টোডরমল্ল যখন এখানে আসবেন তখন আমাকে একটু দেখা করিয়ে দেবেন!

সে কী! কেন সুন্দরী?

শুনেছি তিনি যেমন জ্ঞানী তেমনি তাঁর দয়ার শরীর।

আহা তুমি বলবে তো, ব্যাপারটা কি?

আচ্ছা গোঁসাইঠাকুর, গৌড়ের কোন সওদাগর যদি ব্যবসা করতে দূরদেশে যেতে চায় তাহলে তিনি তাকে সাহায্য করবেন?

কি সাহায্য?

কি আবার, কিছু টাকা! সৎ কাজে তো সরকারী সাহায্যের রেওয়াজ আছে গোঁসাইঠাকুর—

আচ্ছা বেশ, না হয় রাজকোষ থেকে কিছু অর্থ মঞ্জুর হলো, তারপরে? তাই দিয়ে সে মাল কিনবে?

না-না, পণ্যদ্রব্য তার আছে গোঁসাইঠাকুর।

তাহলে টাকা দিয়ে সে কী করবে?

ও মা! কালাপানি পেরিয়ে যাবে কি করে? জাহাজ লাগবে না?

ও হরি! খুক খুক করে হাসল রামুগোঁসাই। খরচোখে তাকালো কৃষ্ণাবাঈয়ের প্রতিমার মতো মুখের দিকে। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারেও নজরে পড়ল তার অনিন্দ্যসুন্দর সুডৌল মুখে পড়েছে উদ্বেগের কালোছায়া। কোন্—কোন্ সওদাগরের জন্য তার এত দরদ—সে কে? তার বুকের ভেতরটা জ্বালা করতে লাগল। কৃষ্ণাবাঈয়ের পিঠে একটা চিমটি কেটে বলল, রাজসাহেবের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারব কিনা জানি না সুন্দরী, তুমি তো জান আমিই তোমাকে জাহাজের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু একটা সর্তে—

বলুন কি সর্ত গোঁসাইঠাকুর? আগ্রহে তাব চোখদুটো নক্ষত্রের মতো জ্বলতে লাগল।

তোমাকে তার নাম বলতে হবে সুন্দরী, সে কোন্ ভাগ্যবান সওদাগর যার জন্য তুমি জাহাজ মেগে বেড়াচ্ছো!

কোন কথা বলল না কৃষ্ণাবাঈ। মাথা নীচু করে সেই অন্ধকারে একটা শিলীভূত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল এক অপরূপ সুন্দর যুবকের দিব্যকান্তি। একমাথা ঘন কোঁকড়ানো কালো চুল। খড়্গের মতো খাড়া নাক, কালো দুটো বড় বড় চোখে বলিষ্ঠ এক সঙ্কল্পের আভাস—তার স্বপ্নের রাজপুত্র!

কি গো সুন্দরী, তোমার খুব পেয়ারেব লোক বুঝি, তাই নামটা গোপন রাখতে চাও? কুকুরের কান্নার মতো অদ্ভুত শব্দ করে হাসল

রামুগোঁসাই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্বরে বলল, হরি-হরি—সকলের মঙ্গল কর বাবা!

কৃষ্ণাবাঈ গোঁসাইয়ের ফোঁটা-তিলক কাটা গোল মাংসল মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আস্তে আস্তে বলল, নাম যদি বলি, তাহলে দুটো জাহাজ দেবেন?

দুটো জাহাজ! একেবারে দান? বিছুটি ধরার মতো ছটফট করে উঠল রামুগোঁসাই।

না-না, কিছু—যৎসামান্য কিছু মূল্য আমরা দিতে চেষ্টা করব গোঁসাইঠাকুর। একটু থেমে চোখের কোণা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ব্যবসায়ী মানুষ—বিনা পয়সায় নেব কেন, আমাদের মর্যাদা নেই?

বেশ, শুনি সেই সওদাগরের নাম-ধাম, তারপরে দেখি কি করতে পারি।

তবুও চুপ করে থাকল কৃষ্ণাবাঈ। প্রতিটি মুহূর্তে তার মনেব আয়নায় যার মুখের ছায়া পড়ে, দিবানিশি যার বুকের ভেতরে দাঁড়িয়ে যে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে আর যার সান্নিধ্যে এলেই তনুমন কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ হয়ে যায়, তার নামটা কিছুতেই বলতে পারল না সে। বলা যায়ও না। যাকে গভীরভাবে ভালবাসা যায়, তার কথা উট্‌কো লোকের কাছে বলতে মন চায় না।

কি গো বোবা হয়ে গেলে যে একেবারে! বল—বল শীগ্‌গীর, এখুনি এসে পড়বেন মহারাজা টোডরমল্ল। দূরে আলোকোজ্জ্বল সভামণ্ডপের দিকে সভয়ে তাকালো রামুগোঁসাই।

কৃষ্ণাবাঈ তার নাম বলতেই রামুগোঁসাইয়ের চোখদুটো মুহূর্তের জন্য ঝিকিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, বেশ, কম-সম করে দুটো জাহাজ দেব, কিন্তু—বলেই হঠাৎ থেমে গেল রামুগোঁসাই। সাঁ করে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে খুব চাপা আর তীক্ষ্ণগলায় বলল কয়েকটা কথা।

কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল। সে আর কোন কথাই বলতে পারল না। শুধু মনে হলো—মনে হলো তার পায়ের নীচে কোন মাটি নেই। ভারী—খুব ভারী অনড়, অটল শব-দেহের মতো তার যৌবনপুষ্ট দেহটা একটা অতল অন্ধকারের খাদে একটু একটু করে নেমে যাচ্ছে। সেই গভীর খাদের অভিশপ্ত শূন্যতার ভেতর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ আবর্তিত হচ্ছে, সেখানে হু-হু বাতাস অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কাঁদছে।

কি গো সুন্দরী, প্রস্তাবটা খারাপ লাগল? তার আরও কাছে ঘন হয়ে সরে এসে তার নিঃশ্বাসের সীমানায় দাঁড়ালো রামুগোঁসাই। আর হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল সে। কৃষ্ণাবাঈয়ের কবুতরের মতো নরম দেহটাকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরে ফিসফিস করে বলল, তোমার সমস্ত অঙ্গ সোনা দিয়ে মুড়ে দেব সুন্দরী। তাড়, কর্ণফুল, কঙ্কণ, মুক্তাপ্রবালের মণিময় হার, আরও—আর—কত কি যে দেব—

আমার কিচ্ছু দরকার নেই। অস্ফুটস্বরে বলল কৃষ্ণাবাঈ। নিঃশব্দে নিজেকে তার সেই নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত করেই হন্‌হন্ করে হাঁটতে লাগল সে। যেন কোন হিংস্র জন্তুর তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরটা ভেঙে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে হলো এখুনি তীক্ষ্ণধার কোন অস্ত্র দিয়ে তার তন্বী সুঠাম তনুটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তার জন্য বিন্দুমাত্র কিছু করার বিনিময়ে মাংসলোলুপ বীভৎস পশুর দল শুধু তার দেহটাকে খুবলে খেতে চায়! হোসেনচাচা, ধনকুমার, রামুগোঁসাই, ধনপতি সওদাগর—সব—সব সমান। কাউকে দেখতে তার বাকী নেই। তবুও—

তবুও অতি সাধারণ লোভী পশুর মতো মানুষের কুৎসিত মুখের মিছিলে একটি আশ্চর্য মুখের ছবি ভেসে ওঠে। কী উদার প্রশান্তি সে মুখাবয়বে! কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন দুটো ভাসা-ভাসা চোখ! বেশ বুঝতে পারা যায়, কোন দূরান্তবর্তী এক অজানা জগতে

তার মনের বাস। গঙ্গার শান-বাঁধানো ধারে ধারে নির্জন পথ ধরে যেতে যেতে হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। তার মনে হলো যেন খুব কম্প দিয়ে জ্বর আসছে। এই বুঝি ভালবাসা! শুনেছে খুব বেশি ভালবাসলে নাকি অকারণে বুকের ভেতরে কান্না গুমরে গুমরে ওঠে আর তীব্র জ্বরের মতো একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তনুমন। যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। মনে হলো, ঠিক এই মুহূর্তে যার কথা সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ভাবছে, সে কী তাকে ভালবাসে! সেই উদাসীন ছন্নছাড়া মানুষটার মনের কোন কোণে তার জন্য কি একটু স্থান আছে—কে জানে! সে বুঝতে পারে না। তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলে হয়তো সে নিষ্ঠুর উদাসীনতায় মুখ ঘুরিয়ে নেবে—হয়তো আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মর্মান্তিক অপমান করবে।

করুক। যা খুশি তাই হোক। যাকে গভীরভাবে ভালবাসা যায় তার জন্য মরেও সুখ আছে। তার বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। হু-হু করে জলো হাওয়া এল। বাতাসটা যেন তার পঙ্কিল দুর্গন্ধময় জীবনভূমির ওপর থেকে তারই অভিশপ্ত কান্নাকে বহন করে নিয়ে এল। চোখদুটো ফেটে জল এসে পড়ল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মনটাকে সংযত করার চেষ্টা করল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা শক্ত করে চেপে ধরল আর তার বুকের ভেতরে বলিষ্ঠ একটা স্তম্ভের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো একটি সঙ্কল্প—যাকে ভালবেসেছে, তার স্বপ্নকে সত্যে রূপায়িত করতে হবে। তাই ·

গৌড় মহানগরীর শেষপ্রান্তে আরবীয় বণিকদের মহল্লার একটা সুদৃশ্য অট্টালিকার সম্মুখের উদ্যানে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণাবাঈ। সেখানে রক্তরাঙা য়্যানিমন, গোলাপ, নরগিস আরও কত রকমের ও কত রঙের নানা ফুলের রঙীন সমারোহ। আর সেই বিশাল উদ্যানের মাঝে মাঝে সুবর্ণ কারুকার্য-মণ্ডিত ছোট-বড় অনেক-

গুলো ফোয়ারা থেকে সিঞ্চিত হচ্ছে সুগন্ধী গোলাপজল। কয়েক মুহূর্ত সেই রাশি রাশি পুষ্পবৃক্ষ শোভিত বাগানের একটা অন্ধকার স্থানে দাঁড়িয়ে রইল সে। তার মনে হলো এত রাত্রে চন্দন আলীর বাসগৃহে আসা কি ঠিক হয়েছে!

কে ওখানে? ছুটে এল দ্বাররক্ষীরা। গাছ-গাছালির ছায়ার আড়ালে নিকষ কালো মূর্তি দেখে তারা ভেবেছিল কোন দস্যুতস্কর হবে। কিন্তু জরীর কাজ-করা মোসল সিল্কের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা রমণীমূর্তি দেখেই তারা বলল, কে আপনি, এখানে কি চাই?

তোমাদের মালিক বাড়িতে আছেন?

জী হুজুর—আছেন।

একটা প্রশস্ত আঙিনা পার হয়ে প্রহরীরা তাকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে এল। বলল, বসুন মেহেরবাণী করে, এখুনি মালিককে খবর দিচ্ছি।

কৃষ্ণাবাঈ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল সেই বিশাল কক্ষের মনোরম আসবাবসজ্জা। বড় বড় জানালা-দরজায় ঝুলছে স্বর্ণখচিত কিংখাবের পরদা, দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে বহুমূল্য বস্ত্রের গদি-আঁটা কুর্শী আর মাঝখানে মণি-মুক্তোখচিত শ্বেতপাথরের একটা পালঙ্ক। সেই পালঙ্কের গদী সোনার বুটি দেওয়া লাল কিংখাবে মোড়া। পশ্চিম দেওয়ালের দিকে মেহগিনি কাঠের একটা তাকে দেশ-দেশান্তরের কত রকমের যে মণি-মুক্তা, বৈদূর্যমণি আর কত বিচিত্র বর্ণের মূল্যবান পাথর!

গৌড়ের বিদেশী সওদাগরদের ভেতরে চন্দন আলীর ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না, একথা সে শুনেছিল। আজ স্বচক্ষে দেখল। মনে হলো—মনে হলো, এই বহিরাগত বিত্তবান সওদাগরদের তুলনায় কত শ্রীহীন, কত নগণ্য আর করুণ দেশী ব্যবসায়ীরা! সেই স্বর্ণখচিত লাল কিংখাবে মোড়া শ্বেতপাথরের পালঙ্কের পাশাপাশি আর একটা ছবি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে—সুন্দর অপরূপ এক যুবক।

দুশ্চিন্তায় ম্লান তার মুখ। একটা কি দুটো জাহাজ কেমন করে কিনবে—কেমন করে কালাপানি পার হয়ে দূরের দেশে বাণিজ্য করতে যাবে সেই বাসনাটা—সেই আকাঙ্ক্ষাটা তার রক্তের ভেতরে কেঁদে কেঁদে উঠছে। আত্মীয়-পরিজনেরা সবাই তার বিরুদ্ধে। তাই সে দুটো জাহাজ সংগ্রহের আশায় পথে ঘুরছে ভিখারীর মতো।

মেহেরবাণী করে আসুন জী, পরিচারিকা এসে বলল, মালিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তাঁর খাস-কামরায়।

পরিচারিকাকে অনুসরণ করে বহুমূল্য আসবাবে সুসজ্জিত এক-একটা কক্ষ অতিক্রম করতে লাগল কৃষ্ণাবাঈ। মুগ্ধ বিস্ময়ে তার চোখদুটো আবিষ্ট হয়ে এল। কোন কক্ষে থরে থরে সাজানো রয়েছে বৈদূর্যমণি, মুক্তা, প্রবাল, আবার কোন কক্ষে আছে পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতর, পদ্মরাগ, মরকত ইত্যাদি আরও কত রকমের মহার্ঘ্য আর দুষ্প্রাপ্য রত্নরাজি!

একটি বিরাট প্রকোষ্ঠের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই সুন্দরী তাতারী (পরিচারিকা)। ফিসফিস করে বলল, ভেতরে চলে যান, মালিক আপনার জন্যে বসে আছেন। বলেই আর দাঁড়ালো না সে। কিন্তু কৃষ্ণবাঈয়ের ভেতরে যেতে আর পা উঠল না। এই প্রকোষ্ঠের তোরণ নীলমণি খচিত স্বর্ণ ও রত্ন নির্মিত! কারুকার্যমণ্ডিত আবলুশ কাঠের দরজায় শোভা পাচ্ছে সোনার বুটি দেওয়া মসলিনের পরদা! সেই বিপুল ঐশ্বর্যের মালিকের মুখোমুখি দাঁড়াতে কেমন একটা সঙ্কোচ অনুভব করল কৃষ্ণাবাঈ। কে জানে তার প্রস্তাবটা শোনার পর তাকে এক দরিদ্র প্রার্থীর মতো নিষ্ঠুর অবহেলায় প্রত্যাখান করবে কি না!

আরে এস-এস! বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? খাসকক্ষের অত্যুজ্জ্বল আলোয় পরদার নীচে কৃষ্ণাবাঈয়ের নূপুরপরা রাঙা টুকটুকে পা-দুটো নজরে পড়ল চম্বন আলীর। তার সহাস্য অভ্যর্থনায় ভরসা পেয়ে ভেতরে এল কৃষ্ণাবাঈ।

কি খবর নগরসুন্দরীর? তোমার যে আর দেখাই পাই না! শ্বেতপাথরের পালঙ্ক থেকে মেদবহুল পৃথুল দেহটা কোনরকমে নামিয়ে থপ থপ করে তার সামনে এল বিত্তবান আরবীয় সওদাগর চম্বন আলী। আপেলের মতো ফুলো ফুলো দুটো গালে যেন একটু টোকা দিলেই ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরবে। বড় বড় দুটো নীলাভ চোখের নীচে গভীর কালির দাগ। কৃষ্ণাবাঈকে সাপের মতো নিবিড় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে বলল, এস পালঙ্কে বসবে—দাঁড়িয়ে কি কথা হয় সুন্দরী! বলেই ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল চম্বন। তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কৃষ্ণাবাঈ বলল, আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা ছিল—

আরে আরে, হবে সেসব, আগে বস তুমি, একটু খানাপিনা হোক— আবার ছুটল তার হাসির ফোয়ারা। কৃষ্ণাবাঈয়ের মনে হলো প্রভূত ঐশ্বর্যশালী এই মানুষটার বুকের ভেতরে কোথাও লুকিয়ে আছে অফুরাণ খুশির প্রস্রবণ। হঠাৎ কি মনে করে চম্বন বলল, চল তোমাকে একটা জিনিস ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

কৃষ্ণাবাঈকে নিয়ে এল তার খাস প্রকোষ্ঠের পরেই আর একটা বিশাল হলঘরে। সেখানে কৃষ্ণকায় আর সুঠামদেহী কাফ্রী দাস-দাসীরা সারি সারি বসে কেউ সোনার সুতোয় মণিক্যের মালা গাঁথছে, কেউ গাঁথছে মুক্তোর হার, কেউ বৈদূর্যমণিগুলোকে ঘষছে, কেউ কাটছে শঙ্খ, আবার কেউ শানযন্ত্রে ফেলে প্রবালগুলোকে গোলাকার করছে।

সুন্দরী, জান ওই মুক্তোগুলো হলো মান্নার উপসাগরের। উল্লসিত কণ্ঠে বলতে শুরু করে চম্বন, আর ওই যে দেখছ বৈদূর্যমণি-গুলো, ওগুলো নিয়ে এসেছি সুবর্ণদ্বীপ থেকে। প্রবালগুলো দক্ষিণ সমুদ্রের অজানা এক-একটা দ্বীপের। নিজের বিপুল সম্পদের বিবরণ দিতে দিতে তীব্র উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে ওঠে আরবীয় সওদাগর। বলে, আমার কাছে কোথায় লাগে তোমাদের এদেশী সুবর্ণশ্রেষ্ঠী

ধনকুমারের সোনার সঞ্চয়—ওই মর্কটটাকে আমি এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে দিতে পারি।

কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে আলীসাহেব—আমার কথাটা—

আরে দাঁড়াও নগর-শোভনা, তুমি কি ঘোড়ায় জীণ চাপিয়ে এসেছো নাকি? একটু থেমে হেঁকে বলল, এই - কোই হ্যায়—

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন সুন্দরী তাতারী নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল। তাদের একজনের হাতে স্বর্ণপাত্রে কিছু আখরোট, পেস্তা, বাদাম আর কিসমিস। আর একজনের রৌপ্যপাত্রে গোলাপগন্ধী মধুশর্করা, মুশুস্বাক, আরও নানারকমের দুধের সর দেওয়া মেঠাই। আর একটি তাম্রপাত্রে কপূরযুক্ত তাম্বুল আর জলপাই রঙের সুদৃশ্য বোতলে পারস্যের সুগন্ধী সেরাজী। অস্ফুটস্বরে কৃষ্ণাবাঈ বলল, সর্বনাশ, এ কী করেছেন আলীসাহেব!

কিছু না—কিছু না, তোমার মতো নওজওয়ানীর কাছে এইটুকু খাবার তো নস্যি! বলেই ভারী দেহটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসল আলীসাহেব। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল তার কঠোর গলা, আমার বাড়িতে এলে কেউ না খেয়ে যায় না কৃষ্ণাবাঈ—তুমি আগে খাও, তারপর তোমার সব কথা শুনব।

আর আপত্তি করল না কৃষ্ণাবাঈ। সে এসেছে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে। আহারান্তে তার বক্তব্য বলল কৃষ্ণাবাঈ। খুব মন দিয়ে চোখদুটো বুজে চম্বন আলী শুনল তার প্রত্যেকটি কথা।

ভিখু যেতে চায় কোথায়?

ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে।

অ্যাঁ! উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল চম্বন আলী। সেরাজীর নেশায় আরক্ত দুটো চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, বলল, হাকিমসাহেব যে দেশের কথা খুব বলেন? যেখানে হাজার হাজার তেজী ঘোড়া, পশম, চামড়া, শীলমাছের দাঁত আর খুব মজবুত ইস্পাতের তলোয়ার পাওয়া যায়!

হ্যাঁ আলীসাহেব, হ্যাঁ। আমাদের দেশের মসলিন ও রেশমেরও খুব কদর আছে শুনেছি সেদেশে।

শুধু রেশম মসলিন কেন, এখানকার সুগন্ধী মশলা, চীনা সিল্ক, গাঙ্গেয় জটামাংসী আর শাল কাঠেরই চাহিদা কম নাকি? একটু থেমে বলল চম্বন আলী, গৌড়ের মূর-সওদাগরদের কাছেও শুনেছি কাবুলে, বাগদাদে, তাব্রিজে নাকি এখানকার হিন্দু-বণিকেরা রীতিমত স্থায়িভাবে বসবাস করছে।

ভিখু তো হাকিমসাহেবের মুখে শুনেছে কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে নাকি সারি সারি তাঁবুতে রুশীয় বণিক আর এদেশী সওদাগররা বাস করে মাসের পর মাস। কসাকরা নাকি ভল্গা নদীর ওপারে 'স্তেপ' না কি যেন কোথা থেকে নিয়ে আসে হাজার হাজার ঘোড়া। একটু থামে কৃষ্ণাবাঈ। বিড় বিড় করে বলে, আরও কত—কত কথা যে বলে সে! আমার এক-একবার ইচ্ছে হয়, হাকিমসাহেবের কাছে যেয়ে তার মুখে শুনি! কিন্তু—

যাও নি কেন?

বাব্বা! অতবড় একটা জ্ঞানী-গুণী মানুষ! সরম লাগে না? একটু থেমে থেমে কলকল করে বলে উঠল কৃষ্ণাবাঈ, আচ্ছা আলী-সাহেব, ভাবুন তো, মাসের পর মাস এই গঙ্গার পাড়ের মানুষ আর ভল্গার পাড়ের মানুষ একসঙ্গে বাস করছে—সন্ধ্যার আঁধার নামছে কাস্পিয়ানের জলে; দূরে দূরে জেলেডিঙির আলোগুলো জ্বলছে, তখন তাঁবুতে তাঁবুতে বসে যায় নাচগানের আসর।—একটু থামে কৃষ্ণাবাঈ। হয়তো তার উচ্ছ্বাসের জন্য একটু লজ্জাও পায়। কিন্তু—

লজ্জা নয়। চম্বন আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। সেই হাসি হাসি গোলগাল মুখখানা হঠাৎ ভয়ঙ্কর গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতে পারা যায়, ভেতরে ভেতরে যেন কোন তীব্র যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে সে। কৃষ্ণাবাঈ মাথা নীচু

করে ভাবছে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবছে, কাস্পিয়ান-ভল্গার দেশের কথা বলতে বলতে আবেগের ঝোঁকে অশোভন কিছু বলে ফেলেছে কিনা কিংবা এমন কিছু বলেছে যা তার মতো ধনীর আভিজাত্যে ঘা দিয়েছে।

টিক্—টিক্—টিক্—সেই প্রকোষ্ঠের দূর কোণ থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। দূরে দেউড়ীতে প্রহরীদের জুতোর শব্দ হচ্ছে খট-খট-খট ; ফোয়ারা থেকে অবিরাম জল ঝরছে—ঝর্ ঝর্। কৃষ্ণাবাঈয়ের মনে হলো প্রতিটি—প্রতিটি শব্দ যেন তার মাথার ভেতরে বাজছে।

শোন কৃষ্ণাবাঈ—ভিখুর জন্য কি করতে হবে ?

কৃষ্ণাবাঈ যেন বুঝতে পারল না কি বলছে আলীসাহেব। আবার কঠিন গলায় বলল, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি—বল না ভিখুর জন্য তুমি আমার কি সাহায্য চাও ? টাকা ?

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকায় কৃষ্ণাবাঈ।

তাহলে ? বলে ফেল না—

জাহাজ। আপনার তো অনেকগুলো জাহাজ আছে। যদি দুটো জাহাজ দিতেন একটু কম-সম করে—

হুঁ ! আবার মুখে তীব্র যন্ত্রণার সেই চিহ্ন ফুটে উঠল। বলল, ভিখুর কি দুটো জাহাজ লাগবে ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, যদি চারটে জাহাজ দিই ?

চারটে ! না—না, অতগুলো দিয়ে আমরা কি করব ?

না-না, আমার দুটো, তার দুটো !

আপনি—আপনি যাবেন ! তীব্র আনন্দে উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল কৃষ্ণাবাঈ। দারুণ আবেগের বশে সে আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু চম্বন আলী তাকে হাত তুলে থামতে

ইঙ্গিত করল। কৃষ্ণাবাঈকে তার আরও কাছে সরে আসতে বলল। কানের কাছে ফিসফিস করে চাপা—খুব চাপা গলায় বলল, শোন, খুব গোপন রাখবে একথা। আমি যাব—আমি যাব সেই ভল্লা-কাস্পিয়ানের দেশে। কেন জান? থামল আলীসাহেব। আবার সেই বিষাক্ত আক্রোশে কুৎসিত হয়ে উঠল তার মুখখানা! চোয়াল-ছুটো খিলের মতো এঁটে বসল তার গালে।

সে কী! কার ওপরে রাগ করে দেশছাড়া হবেন আলীসাহেব? ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে বলতে হঠাৎ মুখ ফসকে কৃষ্ণাবাঈ বলে ফেলল, আপনার বিবির সঙ্গে—

আরে না-না, বিবি-টিবি নয়, কোন জেনানা-টেনানা নিয়ে আমার ভাবার সময় নেই। আহত সিংহের মতো গর্জন করে উঠল। দাঁতে দাঁতে চেপে ধরে বলল, শালা— ওই হোসেনচাচা! আমি ওর কাছে কয়েকটা দাসদাসী কিনতে চেয়েছিলাম, ও হাঁকিয়ে দিয়েছিল। ভল্লার দেশের কয়েকটা ঘোড়া আব তলোয়ার নিয়ে এসে খুব জাঁক করছে।

বেশ! তা ছুটো জাহাজের জন্য মোট কত দিতে হবে?

আরে না-না, ওসব কিছু এখন দিতে হবে না। হাঁ-হাঁ করে উঠল চন্বন আলী। বলল, শোন, ভিখু ওদেশে গিয়ে যদি ব্যবসা করে কিছু লাভ-টাভ করতে পারে তখন দেখা যাবে। আবার কি ভেবে বলল, ধর না কেন—আমরা ছু'জন সওদাগর গৌড় থেকে আমাদের সওদা নিয়ে যাচ্ছি কাস্পিয়ানের দেশে ব্যবসা করতে।

কৃষ্ণাবাঈ কথা বলল না।

বুঝতে পারছো না, ভিখু বিক্রি করবে মালদহী সিল্ক, আমি করব মণি-মুক্তো-পাথর—ইত্যাদি, আমি যা করে থাকি। বিক্রির টাকাকড়ি সব থাকবে এক জায়গায়। তারপর ফেরার সময় হিসাব করে তার অংশ থেকে—

ও, ভিখুকে আপনার ব্যবসার অংশীদার করে নিতে চাচ্ছেন!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, অংশীদার—তোমাদের কটমট বাংলা ভাষাটা এখনও এতদিন গৌড়ে থেকেও কায়দায় আনতে পারলাম না। বলেই ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল আলীসাহেব।

আচ্ছা আদাব! আমি এখন যাই আলীসাহেব, আপনি কি যে উপকার করলেন—

পারস্যের সুদৃশ্য কার্পেটে মোড়া মেঝের ওপর পা ফেলে ফেলে যেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল কৃষ্ণাবাঈ, অমনি আলীসাহেবের গলার আওয়াজ শোনা গেল, দাঁড়াও—

মুহূর্তে কৃষ্ণাবাঈয়ের মনটা ঘৃণায় দড়ির মতো পাক দিয়ে উঠল। মনে হলো, এরা ব্যবসায়ী—এরা বিপুল সম্পদের অধিকারী—এরা রক্তচোষা ভয়ঙ্কর সরীসৃপের জাত। এইবার যতটুকু সুবিধা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি কড়া-গণ্ডায় উসুল করে নেবে। রামুগোঁসাই, হোসেনচাচা, ধনকুমার আর দুনিয়ার তাবৎ পুঁজিবাদী লালসা-দুর্বল পুরুষগুলোর ওপর আক্রোশে ফুলতে লাগল সে। কিন্তু—

চমন আলী এল। কৃষ্ণাবাঈয়ের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে, শুধু অপলক চোখে পরীলীলা শাড়ি পরা সেই তন্বী সুঠাম তনুর দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু বলল, তুমি—তুমি যাবে তো?

সকালের রোদে ঝিকমিক করছে মহানন্দার জল। নদীর পাড়ে এক শিমুলগাছের কাটা গুঁড়ির ওপর শিলীভূত একটা মূর্তির মতো বসে রয়েছে ভিখু। হু-হু বাতাসে নদীর জলে উঠেছে কলোল্লাস। ওপার থেকে কোন উৎকণ্ঠিত যাত্রী খেয়াঘাটের মাঝিকে ডাকছে—এ—ই—ও—মা—ঝি—ভা—ই—ই—ই—হাল-গোরু নিয়ে চাষীরা মাঠে চলেছে, গ্রামবধূরা হেলেদুলে কলসী কাঁখে নিয়ে নদীতে জল নিতে আসছে। ভিখুর মনে হলো দিকে দিকে এই যে বিপুল

কর্মযজ্ঞ চলেছে, উদ্দামবেগে বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত—এসবের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। মা-র মৃত্যুর পর কি যে হয়েছে তার, কোন কিছুতেই আর তার আসক্তি নেই, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, উদ্যম নেই। শুধু—শুধু ভাল লাগে দূরে—বহুদূরে নদীর ওপারে আবছা কুয়াশামাখা কাজল-কালো দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে। মনে হয় ওপারের ধূ-ধূ বালুচর পেরিয়ে গাছ-গাছালির ছায়ায় জবুথবু লুকিয়ে থাকা গ্রাম-গ্রামান্তর পেরিয়ে যদি চলে যেতে পারতো দূরে—অনেকদূরে। কেমন সন্দেহ হয়, তার মনের আকাশে দিবানিশি ডানা মেলে উড়ছে একটা পাখি। কিছুতেই সে তার ডানাদুটো মুচড়ে ভেঙে দিতে পারে না। কত নিষ্ঠুর আঘাত, কত বিদ্রূপ, কত লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, তবুও সে কিছুতেই গড্ডলিকা প্রবাহের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারে নি। পারে নি—চেষ্টা করেও পারে নি সে তার বাবার মতো বুড়ো টাট্টু ঘোড়ার পিঠে রেশমের সুতোর পেটীর বস্তা চাপিয়ে হাটে হাটে মেলায় মেলায় যেতে; পারে নি ঘর-গেরস্থালীর কাজে মন দিতে। অথচ—

অথচ ওই তো—ওই ঝাপড়া তেঁতুলগাছটার নীচে জমাট অন্ধকারে তার মা-র লাশটা নামিয়ে রাখা হয়েছিল। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে কেটে যখন কবর তৈরির কাজ চলছিল তখন সে মা-কে ছুঁয়ে বসে ছিল। আর মা-র শনের দড়ির মতো চুলগুলোর ভেতরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মনে মনে আল্লার কসম খেয়ে শপথ নিয়েছিল, মা, মা গো –তুমি আমার জন্য ভেব না, আমি বাবাকে দেখব—ঘর-সংসারের কাজে মন দেব—দেখ মা—আমি খুব—খুব ভাল হয়ে যাব মা। অস্ফুটস্বরে কথাগুলো বলতে বলতে বুকের ভেতর থেকে হু-হু করে পাক দিয়ে উঠে এসেছিল কান্না। দূরে অন্ধকারে বসে মা-র বুকে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কেঁদেছিল সে। কেঁদে কেঁদে

মনের ভার হাল্‌কা করেছিল। আলেকচাঁদ, ফালু, বাপজান, গ্রামের লোকদের সামনে কাঁদতে তার লজ্জা করে।

না। একফোঁটা চোখের জল ফেলে নি সে। সেই রাত্রে আলেকচাঁদ যখন তাকে ডেকে নিয়ে এল, তখন সব শেষ। মা-র সেই রোগজীর্ণ দেহটা একটা কাঠের মতো পড়ে রয়েছে। মাথার কাছে পাথুরে মূর্তির মতো বসে আছে বাপজান। সে শুধু ছুটে এসে ঘরে ঢুকে মা-কে জড়িয়ে ধরেছিল। বহু চেষ্টা করেও পাড়া-প্রতিবেশীদের সামনে কাঁদতে পারে নি। তারা বলেছিল, রেশমের ব্যাপারী মজিবর মিঞার বাউণ্ডুলে ছেলেটা পাষাণ গো—একেবারে পাষাণ। কিন্তু তারা জানে না, বাপজানের সঙ্গে তার মনের কোন যোগ নেই। সংসারে মা-ই একমাত্র স্নেহবন্ধন। সেই মা যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল তখন দুঃখ পেয়েছে ঠিকই। বুকের ভেতর গুমরে গুমরে উঠেছে নিঃশব্দ কান্না। কিন্তু যত দুঃখই হোক, তবুও কেন যেন নিজেকে হাল্‌কা বোধ করছে। মনে হচ্ছে, তার একটা পায়ের বেড়ী খুলে দিয়েছে আল্লাহ্—আর—আর একটা বন্ধন, আর একটা বেড়ী আছে তার—নসু—নসীবন। হঠাৎ মনে হলো, তার মা-র মৃত্যুর সময় কত লোক এসেছে। আলমসাহেব কি নসু তো আসে নি! কোন অসুখ-বিসুখ করে নি তো! বুড়ো একমাত্র মেয়েকে নিয়ে একা একা থাকে। ভেতরে ভেতরে সে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করল।

খেয়া পার হয়ে নসুদের বাড়ির দরজায় যেতেই দেখল রক্তবর্ণ গালিচায় ঢাকা একটি সুদৃশ্য পাল্কি। হয়তো আলমসাহেবের কাছে জমিজমার ব্যাপারে জোতদার সাইমুল্ল্যা এসেছে। বাড়ির ভেতরে লালমাটিতে নিকানো উঠোনের এক কোণে মাধবীলতার ছায়াকুঞ্জের নীচে একটা মোড়ায় বসে হুঁকো টানছিল আলমসাহেব। তাকে দেখেই মাথা নীচু করে হুঁকো নামিয়ে রাখল। আর আশ্চর্য! একটিও কথা না বলে গোয়ালঘরের দিকে চলে গেল।

কী হয়েছে এদের। তাহলে কি নসু সেদিনের সব কথা তার বাপজানকে বলে দিয়েছে। তাই বাপ-মেয়ের গোঁসা হয়েছে। যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে ডাকল, ন—সু—কোথায় তুই ?

আরে এস-এস! ঠিক সময় এসে পড়েছো তুমি। যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে রঙীন একটা প্রজাপতির মতো বেরিয়ে এল নসীবন। সালঙ্করা হাস্যোচ্ছল মূর্তি। খুশিতে ভেঙে পড়ে বলল, ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে বুঝি দেখাই হলো না!

সে কী রে, এত সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিস ?

ও মা! তুমি জান না? আর জানবেই বা কেমন করে, যা বিপদ গেল তোমাদের! কলকল করে বলে উঠল সে, তবে জানলেই বা কি, তোমার তো কিছুই এসে যায় না!

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকল ভিখু। চোখদুটোতে কেমন একটা সন্দেহের ছায়া দুলে উঠল। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, তোর কি সাদী হয়ে গিয়েছে ?

হা আল্লা! এতক্ষণ দেখেও বুঝতে পারছো না! উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ল নসীবন। হাসির দমকে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে ভিখুর হাত ধরে বলল, চল—চল—এস, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ভিখুর মনে হলো, নসুর কথাগুলোর ভেতরে একটা চাপা আক্রোশের আভাস আছে। নিঃশব্দে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, আমি যাই নসু—

কে নসীবন? কার সঙ্গে কথা বলছো তুমি? কাজীর ছেলে দবীর খাঁ তার ভারী দেহটা টেনেটুনে থপ থপ করে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে আসতেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ভিখু। না, সেই রাত্রে যেমন তার তীব্র অভিমানে বিক্ষুব্ধ কান্না থরো থরো মূর্তির সামনে দাঁড়াতে পারে নি, তেমনি আজ তার হাস্যপ্রদীপ্ত মূর্তির সামনেও দাঁড়াতে পারল না সে।

জোর পায়ে হাঁটছে ভিখু। দ্রুত—খুব দ্রুত, যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব আবাল্যস্মৃতি জড়ানো এই রোহনপুরের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল সে। তবুও—তবুও হাজারো টুকরো টুকরো মধুর স্মৃতি যেন বিষধর এক-একটা সাপের মতো তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। ওই তো—ওই তো সেই ঝাপড়া বটগাছটা, যার নীচে তারা বর-বৌ খেলতো, ওই তো সেই হেলে-পড়া নারকেলি কুলের গাছটা—ওই গাছে উঠে তার জন্য কুল পাড়তে গিয়ে নস্থুর ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরেছিল। সাবেকদিনের আরও কত—কত অসংখ্য ছোটখাটো ঘটনা যেন প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শোভাযাত্রা করে চলে যেতে লাগল। যাক-যাক, সব যাক। মা গেছে—নস্থুও কাজীর ছেলের বৌ হয়ে নিমাসরাই ছেড়ে চলে যাচ্ছে—কাউকে তার দরকার নেই। সে-ও চলে যাবে এই রোহনপুর ছাড়িয়ে, নিমাসরাই ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরে। যদি জাহাজ জোগাড় করতে পারে তাহলে চলে যাবে দিগন্তবিসারী ধূসর মরুভূমি, গহন পার্বত্যলোক ছাড়িয়ে, তুষার-গলা নদী পেরিয়ে সেই কাস্পিয়ান-ভল্গার দেশে। আর যদি না পায় জাহাজ তাহলে স্নেহ-মায়া-মমতা-ঘেরা এই সংসারের বন্ধন কাটিয়ে চলে যাবে—পীর-ফকির হয়ে যাবে। দিওয়ানা হয়ে তুনিয়ার দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে।

॥ এগারো ॥

না। পারল না।

পারল না ভিখু স্নেহ-মায়া-মমতা-ঘেরা এই সংসারের বন্ধন কাটাতে। কেউ-ই পারে না। বন্ধন থাকে মানুষের নিজের ভেতরে। রক্তমাংসের মানুষ তার প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মায়া-মমতার নরম নরম অনুভূতিগুলোকে ঝাঁক ঝাঁক স্বর্ণলতার মতো ছড়িয়ে দিয়ে আর একজনকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়। মানুষী প্রকৃতির ধর্মই হলো পরগাছা আলোকলতার মতোই।

কিন্তু যারা ভিখুর মতো বেয়াড়া, যারা স্বতন্ত্র, যারা একটু অন্যরকম অর্থাৎ যারা পালাতে চায়, তাদেরই ছোট ছোট সুখ-দুঃখ আর স্বার্থের শ্বাসরোধী সংসারের খাঁচায় বন্দী করার জন্যে তাদের পিছু পিছু ঘোরে মানুষী প্রকৃতির সেই চিরন্তন মায়া।

তাই—

তাই ভিখু যখন তার মা-র মৃত্যু এবং নসীবনের সাদীতে নিজেকে একটা মুক্তবিহঙ্গের মতো মনে করেছিল, যখন সে হাকিমসাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভেনিসের সাহেবের পুরানো জাহাজ কেনার জন্য টাকা জোগাড় করছিল, ঠিক সেই সময় একদিন সন্ধ্যায় চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কৃষ্ণাবাঈয়ের সঙ্গে।

কী ব্যাপার তোমার বল তো? তুমি যে ডুমুরেব ফুল হয়ে গিয়েছো!

কোন কথা বলল না ভিখু। শুধু অপলক চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার দীঘল দেহ পেঁচিয়ে পরেছে মাকড়সার জালের মতো সরু সুতোর 'ঝুনা' মসলিনের শাড়ি। প্রায় অস্বচ্ছ সেই বস্ত্রাবরণের আড়ালে ছায়াময় লোভানির মতো পুষ্ট নিতম্বদেশে শোভা পাচ্ছে ঘাঘর কিঙ্কিণী। আর বক্ষোদেশে সোনার কাঁচুলীতে আবদ্ধ যেন

গতিহারা একজোড়া দুরন্ত গ্রহ। দুই হাতে শঙ্খের অলঙ্কার। কানে ঝিকমিক করছে কর্ণপুর আর পায়ে চরণচুর।

কি গো শেখের পো, অমন করে দেখছো কি? আগে কখনো দেখ নি?

তবুও কথা বলল না ভিখু। তার মনে হলো ওর যৌবনপুষ্ট তন্বী দেহে থরে থরে সাজানো অভিসার-সজ্জার ভেতর থেকে যেন মূর্তি ধরে উঠছে মোহময়ী ছলনা। এই রহস্যময়ী দিনের পর দিন তার সঙ্গে নির্জনে রাতের অন্ধকারে দেখা করছে; লোভ দেখাচ্ছে সেই দূরের কাস্পিয়ান-ভল্লার দেশে যাওয়ার। কিন্তু আসলে তার মা, নসু যে ধাতুতে গড়া, ও তো সেই ধাতুতেই গড়া স্ত্রীলোক! মেয়েরা কখনো বড় স্বপ্ন দেখে না—কখনো অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটতে যায় না, ওরা স্বার্থপর—ওরা আত্মকেন্দ্রিক। নিজের সুখ-দুঃখ-স্বার্থের পরিধির বাইরে কোন কিছুই ভাবতে পারে না তারা। এই অপরিচিত স্ত্রীলোকটিরও লক্ষ্য বিড়ালের মতো থালার মাছের দিকে। তার কালাপানি পেরিয়ে বিদেশে যাওয়ার দুর্মর স্বপ্নটাকে উস্‌কে দিয়ে তার সঙ্গে ভাব-ভালবাসা করে আসলে তাকে নোংরা দুর্গন্ধময় সেই পাঁকে নামানোর চেষ্টায় তার আশপাশে ঘুর-ঘুর করে। তীব্র ঘৃণার ধিক্কার জ্বলতে লাগল তার চোখে।

তোমার কি শরীর খারাপ? অমন করে আমার দিকে কেন তাকাচ্ছো?

আমার পিছু পিছু কেন ঘুর-ঘুর কর তুমি? কেন—কেন? দারুণ উত্তেজনায় আর মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ভিখু, কী তুমি চাও আমার কাছে—কে তুমি—কি তোমার পরিচয়?

অপমানে কালো হয়ে গেল কৃষ্ণাবাঈয়ের রঙ-করা মুখ। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার। কান্না ভার-ভার গলায় মাথা নীচু করে বলল, তোমাকে—তোমাকে ভাল লাগে, তাই বারে বারে আসি। একটু থামল। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে-ওঠা কান্না চেপে অস্পষ্ট

গলায় বলল, তুমি বিদেশে যাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করছো, আমি তোমাকে সেই ব্যাপারে সাহায্য—আর কিছু বলতে পারল না সে। তীব্র ব্যথায় অবরুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। ভিখু খুব শান্ত এবং দৃঢ় গলায় বলল, কোন স্ত্রীলোকের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই আমার।

কোন কথা বলল না কৃষ্ণাবাঈ। জলে ভরা চোখদুটোর করুণ দৃষ্টি তুলে ধরল তার গম্ভীর আর কঠিন মুখের দিকে। আস্তে আস্তে বলল, তোমার কতদিনের আশা—তুমি রাশিয়ায় যাবে!

নিজের চেষ্টায় যেতে পারলে যাব।

কিন্তু আমি যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম!

না-না, আমি তোমার সাহায্য নিতে যাব কেন, কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? কে জানে, কি তোমার মতলব!

মতলব! অস্ফুট গলায় বলল কৃষ্ণাবাঈ। তীব্র যন্ত্রণায় মুখখানা এঁকে-বেঁকে দুমড়ে কেমন কুৎসিত হয়ে উঠল। আর পারল না সে। কান্নাটাকে লুকানোর জন্যেই মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। আর সেই অন্ধকারে একটা অভিশপ্ত প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে রইল ভিখু।

দূরে দীঘল দেহে রাণীর মতো অপরিসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে কৃষ্ণাবাঈ। তীব্র বেদনার ভারে নুয়ে পড়েছে মাথাটা। ভিখুর মনে হলো নম্মু, জুলিয়াবিবি, তার মা এবং আর সব স্ত্রীলোকের মতো বিদেশে যাওয়ার নামে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না। বরং উৎসাহ দেয়, প্রতিশ্রুতি দেয় সাহায্যের। তার কানের কাছে বাজতে লাগল ওর সেদিনের কথাগুলো, তোমার মতো উদ্যোগী পুরুষ সমুদ্র-বাণিজ্যে না গেলে কে যাবে বল? তার নিজের কথাগুলোও মনে পড়ে গেল—যে তাকে কাস্পিয়ান-ভল্গার দেশে যেতে সাহায্য করবে সে তার আপনার লোক। সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। অপরিচিত স্ত্রীলোকটি যেই হোক তাকে সে ভালবাসে। আর

ভালবাসে বলেই তার স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য হয়তো সত্যি সত্যিই বিদেশে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

এমন—এমন একটা সুযোগ—

এই যে শুনছো - ও—ও - শুনছো—দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও! ছুটে গিয়ে খপ্ করে তার হাতটা ধরল ভিখু। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আমি ভুল করেছি—ভুল করেছি গো—অকারণে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি—

নীরব কৃষ্ণাবাঈ। শুধু ভিখুর মুঠোর ভেতর থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। ভিখু ব্যাকুল হয়ে বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো! তুমি—তুমি আমাকে ক্ষমা কর। একটু থেমে আবার কৃষ্ণাবাঈয়ের হাতদুটো ধরে অনুনয়ের সুরে বলল, বলবে না কি ব্যবস্থা করেছো?

সেসব জেনে তোমার লাভ? তুমি তো আমার সাহায্য নেবে না বলেছো—

বাব্বাঃ, এত অভিমান তোমার? আমি তো কবুল করছি আমি বেয়াকুবী করেছি—কৃষ্ণাবাঈয়ের হাতদুটো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার মনে নেই—তোমাকে বলেছিলাম, কাস্পিয়ান-ভল্লার দেশে যেতে যে আমাকে সাহায্য করবে, সে যেই হোক—

থাক থাক, খুব হয়েছে। ভিখুর ছেলেমানুষী সরলতায় আর তার উদ্বিগ্ন আকুল হয়ে বলার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলল সে। হাসতে হাসতেই ডানহাতের চারটে আঙুল উঁচিয়ে বলল, একটা-দুটো নয়, চারটে জাহাজ জোগাড় করেছি।

বল কি! চারটে? আনন্দে উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল ভিখু। কৃষ্ণাবাঈ আস্তে আস্তে বলল চন্দন আলীর কথা, বলল তার ব্যবসার অংশীদার হয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যাওয়ার প্রস্তাব।

না-না, তা আমি যাব না, কিছুতেই যাব না। প্রবলভাবে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ভিখু, দরকার নেই জাহাজের। ধার-দেনা করে ওই ভেনিসের সাহেবের পুরানো জাহাজটা নিয়েই—

তুমি বড্ড ছেলেমানুষ গো! বহুদর্শী বর্ষীয়সী মহিলার মতো বেশ ধীরসুস্থে বুঝিয়ে বলল কৃষ্ণাবাঈ, দেখ, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, চম্বন আলীর মতো অবস্থাপন্ন লোক সঙ্গে থাকা ভাল, বুঝলে! একটু থামল। বহুদূরে গঙ্গার বুকে সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজগুলোর আলোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আর তোমার তো অসম্মানের কিছু নেই—দুটো জাহাজে থাকবে তোমার মাল আর দুটো জাহাজে থাকবে চম্বনের পণ্য। যার-যার মাল সে-সে বেচাকেনা করবে। ফেরার সময় তোমার লাভের অংশ থেকে দুটো জাহাজের ভাড়া বাবদ কিছু দিয়ে দেবে।

আচ্ছা বেশ! তুমি যখন বলছো—

না-না, আমি বলছি বলে নয়, দেখবে তোমার ভালই হবে। একটা কথাও আর বলল না ভিখু। শুধু কৃষ্ণাবাঈয়ের বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তার মনে হলো, সময় সময় বৈষয়িক বুদ্ধিতে মেয়েরা পুরুষদেরও হার মানিয়ে দেয়।

হাঁ করে দেখছো কি, সময় বেশি নেই হাতে। ভাদ্রমাস পড়তে আর মাত্র তিনদিন বাকী। শরৎকাল শুরু হতে হতে আমাদের রওনা দিতে হবে।

তাহলে আমরা সত্যি সত্যি রাশিয়ায় যাচ্ছি! অসহ্য—অসহ্য উত্তেজনায় ভিখুর দেহের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত খুশিতে ভেঙে পড়ে বলল, তুমি নিশ্চয়ই মায়াবিনী—তা না হলে তুমি এই অসম্ভবকে কিছুতেই সম্ভব করতে পারতে না। হঠাৎ থেমে গেল সে। স্থিরদৃষ্টিতে কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চম্বন আলী, হোসেনচাচা, ধনকুমার, রামুগোঁসাই,

গৌড়ের ধনী প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রীতিমত আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতা আছে, তার ওপরেও আছে গভীর সহানুভূতি। তার জীবনে এসেছে স্বপ্নের মতো কে এই নারী?

কি ভাবছো?

তোমার পরিচয়টা কিন্তু—

খিলখিল করে হেসে উঠল কৃষ্ণাবাঈ। পরমস্নেহে ভিখুর মাথাটা বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, বলব গো—বলব—জাহাজে সব বলব।

নিশিরাতের আকাশে তারার দিপালী জ্বলছিল। দূরে নিমাসরাইয়ের ভূতকুঁড়ির পুকুরের পাড়ের নিবিড় জঙ্গলের ভেতর থেকে রাত্রির প্রহর ঘোষণা করে থেকে থেকে শেয়াল ডেকে উঠছিল। সুষুপ্ত সারা গ্রাম। ঘুম নেই শুধু দুটো প্রাণীর চোখে। তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন উঠোনের মাঝখানে তারা হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

তুমি তাহলে আমার কথা শুনবে না?

শোনাশুনির কি আছে বল তো! আমি তো তোমার কাছে কখনো কিছু চাই নি, কখনো হাতও পাতি নি।

মজিবরের মুখখানা অমানবিক হয়ে উঠল। যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে বলে উঠল, তাই বলে তুমি যদি আমার ঘরে আগুন দিতে চাও তাই তোমাকে অনুমতি দিতে হবে?

আমি তো তোমাকে ওরকম অন্যায় কোন অনুরোধ করি নি।

বাঃ, অন্যায় নয়? তিন-তিনটি ঘরভর্তি মজুদ যে মাল আছে, তা তুমি নেবে বলছো—

হ্যাঁ, তোমার জিনিসের ওপরে আমার কি কোন অধিকার নেই?

কে বলেছে তোমার অধিকার নেই, সবই তো তোমার। কিন্তু

তুমি তো বলবে—আমার বুকের পাঁজরের মতো ওই মালগুলো নিয়ে তুমি কোন্ চুলোয় যাবে—কোন্ দরিয়ায় ঢেলে চম্পট দেবে? ক্রোধতপ্ত মুখখানা বিকৃত করে বলল, ছোটবেলায় একবার যেমন পাঠান-সওদাগরদের জাহাজে চেপে পালাতে চেষ্টা করেছিলে—তোমার তো সেসব অভ্যেস—

হঠাৎ থেমে গেল মজিবর। আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা উঠোনের মাটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলল, ইস, সিল্ক-মসলিন, মানে হাওয়াই, মটকা, কোরা, খামরু, মেখলা—আমার আরও অনেক অনেক টাকার মাল!

ভিখুর মনে হলো, অন্ধকারে উঠোনের মাটিতে সিল্কের কাপড়ের নামগুলো যেন অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে। সেই নামগুলো পড়ছে তার বাপজান। মা-র মৃত্যুর পর তার বাবার সংসার, বিষয়-আশয়ের আসক্তি যেন আরও—আরও বেড়ে গিয়েছে।

হঠাৎ সাঁ করে ভিখুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। তার নাকের কাছে তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলল, শোন, মাল নিতে পার, তোমাকে এখানে ব্যবসা করতে হবে।

আমি পারব না।

কী পারবে না? কেন পারবে না? দু'হাতে বুক চেপে ধরে বদ্ধ একটা উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল মজিবর, তুমি আমার বুকের রক্ত দিয়ে তৈরি মাল বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিয়ে যা খুশি তাই করবে, আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই তা হতে দেব না। আগুনে পোড়া সাপের মতো ছটফট করতে করতে ঝড়ের বেগে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল লাগিয়ে দিল।

বাপ-জান—বাপ-জান—তুমি—তুমি আমার একটা কথা—

না-না, তুমি আমার কেউ নও—ছেলে হিসেবে কোন কর্তব্য নেই তোমার—তোমার যা খুশি তাই করতে পার—চারিদিকের

অন্ধকারে বন্ধ দরজার ওপার থেকে তার কথাগুলো গুমরানো কান্নার মতো শোনালো।

পরদিন সকালে উঠেই মজিবর দেখল রেশমের কাপড়ের তিনটি গুদামের দরজা হাট করে খোলা। একটুক্‌রো সিল্কের চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

ঠিক সেই সময়—যখন ভোরের আভাসে পুবের আকাশ রঙীন হয়ে আসছিল, যখন মহানগরী গৌড়ের প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে দেবদারুবীথির নীচে নীচে ঘন হয়ে জমেছিল জমাট অন্ধকার, যখন পুণ্যার্থী নাগরিকরা দু' একজন করে চলেছিল স্নানের উদ্দেশে, ঠিক তখন—সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে চাঞ্চল্য জেগেছিল চিড়াইবাড়ি বন্দরেব ঘাটে। জেটী থেকে অদূরে গঙ্গার মৃদু ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে সারি সারি চারটি সমুদ্রগামী জাহাজ—স্বর্ণমুখী আর গর্ভিণী, কোলান্দিয়া আর মনোজ্জিল। কোলান্দিয়ায় বসবে টুকিটাকি দৈনন্দিন জিনিসের বাজার। মনোজ্জিলে থাকবে মাইফেলের আসর। প্রথম দুটো রামুগোঁসাইয়ের কারখানায় তৈরি এদেশী জাহাজ আর শেষের দুটো আবাদানের কারিগরের তৈরি মালাবার ও কঙ্কণ উপকূলের সমুদ্রেব উপযোগী অর্ণবযান। ননী সারেঙ, সুখানজিয়ার গণি মিঞা, ফয়েজ, খারওয়া দাশু, গোবিন্দ তুণ্ডৌল প্রভৃতি দূরগামী জাহাজের কর্মচারীরা দ্রুতহাতে যে-যার কাজ করছে। সারেঙ চিৎকার করে বলল, এই—ও সুখানজিয়াররা, প্রত্যেকটি জাহাজের হাল-টাল দেখে নাও।

দেখে নিয়েছি, মৌলিম সাহেবকে একবার জিজ্ঞাসা কর তো ননী ভাই, আকাশের অবস্থা কেমন?

তোদের কাজ তোরা কর না, ধমকে উঠল তুণ্ডৌল, বঙ্গোপসাগর আর আরবসমুদ্র পাড়ি দিয়ে দিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলল আমাদের মৌলিম জহর মিঞা।

সমুদ্রের জলের মাপ, আকাশের চেহারা দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বুঝতে পারা এবং নক্ষত্রের অবস্থান দেখে দিক-নির্ণয়ে বহুদর্শী মৌলিম জহর মিঞা কিন্তু একটা কথাও বলল না। শুধু গম্ভীর হয়ে বুক অবধি লুটিয়ে-পড়া কালো কুচকুচে দাড়িতে হাত যেমন বোলাচ্ছিল তেমনি বুলিয়ে চলল।

এটা কিসের গাঁট ?

মটকার বাবু—

ঠিক আছে।

স্বর্ণমুখীর সামনে একটা আবছায়া মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ভিখু শেখ। কুলীরা পিঠে করে বয়ে নিয়ে আসছে এক-একটা গাঁট আর সে একটা খেরোবাঁধা লম্বা লাল খাতায় লিখে চলেছে, কোরা—চারগাঁট ; এণ্ডি চাদর—দুই ; খামরু সিল্ক—পাঁচ ; ঢালি, অথবা বড় পলুর রেশম মসলিন সিল্ক, মটকা, আলোয়ান তৈরির রেশম ইত্যাদি আরও অনেক রকমের রেশমের কাপড়।

রেশমের বস্ত্রসম্ভার শেষ হলো। এবার শুরু হলো মসলিন— ঝুনা, শবনম্ আবরোয়ান, আল্লেবাল্লে, তরন্দাম, বদনখাস, সরবতি—

ভিখু ভাই, করেছো কি! তুমি যে মালের পাহাড় জাহাজে চাপিয়েছো! সারেঙ বলল, মালদহী সিল্ক আর মসলিন ছাড়াও অন্যান্য—

হ্যাঁ ননীভাই, সেই ঝাপসা অন্ধকারে ভিখুর চোখদুটো জ্বলতে লাগল, নিয়েছি কুমীস, এই কাপড় দিয়েই তো পারসিকরা কোর্তা তৈরি করে। নিয়েছি বাফতা, মলিদা, হাম্মাম আরও কত রকমের কাপড়! আমার ছাই মনেও থাকে না—

দেখ শেখসাহেব, আবার লোকসান দিও না, মাল তো নিয়েছো গুচ্ছের।

বল কি ফয়েজ! দপ্ করে জ্বলে উঠল ভিখুর চোখদুটো, আমি যে হাকিমসাহেবের মুখে শুনেছি, আমরা যে দেশে যাচ্ছি, সেখানে

নাকি বাংলাদেশের রেশম আর মসলিনের চাহিদা সেই দশম শতাব্দী থেকে।

হিপ্পালো হুকুম্মা—
খসমসতলা রয় হিঁপ্পো
হিপ্পালো হুকুম্মা···
বাঁয়ে কালো হাতি হিঁপ্পো—
হুকুম্মা—

পাল্কি থামল বন্দরের ঘাটে। দরজা খুলল বাহকেরা। ভিখুর পরিচিত সেই যেন গোলাপী মোমের প্রলেপমাখা পা দুটো পড়ল ঘাটের গৈরিক মাটিতে। অপরূপ সাজে সেজেছে কৃষ্ণাবাঈ। পরনে বহুমূল্য সমুদ্রের মতো নীলাভ রঙের পান্না-হাজার জামদানি শাড়ি। গলায় দুলছে মুক্তাপ্রবাল মণিময় হার, দশটি আঙুলের মাথায় মাথায় শোভা পাচ্ছে মুক্তাশোভিত দীর্ঘ নখ। সুর্মাটানা কালো দুটো ডাগর চোখে হাসি ফুটিয়ে চাপা গলায় ভিখুকে বলল, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে এক জাহাজে থাকব!

ভিখু কোন কথা বলল না। তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল বাল্যসখী নসীবনের মুখখানা। তার মনে হলো, আবার তার পায়ে আল্লাহ্ রঙীন বেড়ী পরিয়ে দিচ্ছে। কে জানে কেন, কোন্ স্বার্থে এই রহস্যময়ী স্ত্রীলোকটি তার স্বপ্নকে সত্যে রূপায়িত করতে সাহায্য করছে! হেসে বলল, সব ব্যবস্থাই তো তুমি করেছো—তোমার যেখানে খুশি থাকবে।

দাঁড়াও, আগে গঙ্গাপূজার ব্যবস্থা করি। ব্যস্ত হয়ে উঠল কৃষ্ণাবাঈ। দূরে একটা ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে হেঁকে বলল, পুরোহিতমশায়, খুব তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করে ফেলুন।

কৃষ্ণাবাঈয়ের পরিচারিকা সুধর্মা একটা স্বর্ণপাত্রে রম্ভাফল, ঘৃত, ক্ষীর, গোধূমচূর্ণ, শর্করা নিয়ে এল। ভোরের নিস্তব্ধতাকে সচকিত করে মন্ত্রোচ্চারণের গম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল—ওং গাং গঙ্গায়ৈ

বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবমূতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণৈ নমোঃ নমঃ। এতৎ পাদ্যং ও গঙ্গায়ৈ নমঃ—

খট্‌—খট্‌—খট্‌! গঙ্গার পাড়ে শান-বাঁধানো রাস্তায় অশ্বখুরের ধ্বনি বেজে উঠল। আরবী ঘোড়ায় চড়ে এল গৌড়ের স্থায়ী অধিবাসী আরব-সওদাগর চম্বন আলী। তাকে অনুসরণ করে এল তার খানসামারা। তাদের কাঁধে ঝুলছে বাঁকের দু'দিকে বড় বড় কাঠের বারকোষে স্বর্ণ-মণিমুক্তার বিপুল পণ্যসম্ভার। আরবটুলী থেকে অন্যান্য বণিকরা এল আলীসাহেবকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। কৃষ্ণাবাঈয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা উল্লসিত গলায় বলল আলীসাহেব, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে আমার খাস জাহাজ স্বর্ণমুখীতে থাকবে!

কৃষ্ণাবাঈ চুপ করে থাকল। তার মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করল না চম্বন আলী। বড় বড় লাল চোখদুটো নাচিয়ে ভিখুকে বলল, সবরকম মালদহী সিল্ক আর মসলিন নিয়েছো তো? একটু থেমে বলল, তা তুমি নিজে আমার কাছে না গিয়ে এই সুন্দরীকে পাঠিয়েছিলে কেন? তুমি বাহাদুর ছোকরা আছো হে!

ভিখু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বলল না—বলতে পারল না, কৃষ্ণাবাঈকে সে পাঠায় নি। কেন সেই সুন্দরী তার বিদেশযাত্রার ব্যবস্থা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাও সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। তার আবাল্যের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। কিন্তু সেই উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে কাঁটার মতো একটা অস্বস্তি খচ্‌ খচ্‌ করছে।

এল বটা সা, এল কবিরাজ রামতারণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এল গৌড়ের ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা। ভিখুর হাতদুটো ধরে চিৎকার করে বলল বটা সা, ভিখুভাই, কথা দাও, বিদেশ থেকে যে মাল আনবে সব আমাকে বিক্রি করবে।

হাকিমসাহেব আসছেন না কেন? কবিরাজ রামতারণ দূরে

আবছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাস্তাটার দিকে চোখদুটো মেলে ধরে বিড় বিড় করে বলে, আমি দু'একটা গাছ-গাছড়ার ওষুধের কথা বলে দিতাম—

ভিখু শেখ এসে গিয়েছে, আলীসাহেব এসে গিয়েছে, তোরা আর দেরী করছিস কেন রে? খড়মের শব্দ তুলে এল রামুগোঁসাই, উষাকাল যে গত হতে চলেছে রে ননী—

এখনও হাকিমসাহেব আসেন নি ঠাকুর।

সে কী! মূল গায়েনই এখনও আসে নি?

ভিখুর মনেও চেপে এল দুশ্চিন্তা—ইস্পাহান, তেহরান, আস্ত্রাখান থেকে ভল্গা-কাস্পিয়ানের অজানা সেই দূরদেশের যে দিশারী সে-ই যদি শেষপর্যন্ত না যায়! যা খেয়ালী মানুষ!

ওই যে—ওই যে কারা যেন আসছে! অস্ফুট গুঞ্জন উঠল বন্দরে। দূরে—বহুদূরে সেই বাঁধের মতো উঁচু সড়ক ধরে আসছে এক বিশাল শোভাযাত্রা। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই মিছিলের জনতা। পুরোভাগে আছে হাকিমসাহেব।

সে কী হে, এ যে একেবারে রাজকীয় শোভাযাত্রা! বলল রামু-গোঁসাই, গৌড়ের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই মানুষটাকে ভালবাসতো!

অত ভাল বদ্যি তো আর নেই রাজধানীতে।

কী ব্যাপার হাকিমসাহেব, মুখখানা ম্লান কেন? কবরেজমশাই এগিয়ে এল, আমার কথাটা যেন মনে থাকে, সেই পাহাড়ী গাছ-গাছড়ার শেকড়—তিব্বতী পুরোহিতরা—

আচ্ছা -- আচ্ছা, আগে ফিরে আসি তবে তো!

কি হে ভিখু, শেষপর্যন্ত তাহলে যাওয়া হলো? ভিখুর পিঠে চাপড় দিয়ে বলল হাকিমসাহেব। উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে আবেগ ভরা গলায় বলতে লাগল সে, শুনুন ভাইসব, শুনুন আলীসাহেব, একসঙ্গে অনেকদিন গৌড়ে ছিলাম। তাই এখান থেকে চলে যেতে মন খারাপ হচ্ছে যেমন, তেমনি আনন্দ হচ্ছে এই

ভেবে, যে দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল সেই সুদূর নবম শতাব্দী থেকে, যে দেশের উদ্দেশে শত শত অজ্ঞাতনামা ভারতীয় বণিক তাদের পণ্য নিয়ে পারস্য হয়ে মধ্য-এশিয়ার পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ডিঙিয়ে আরও উত্তরে ককেশাস পর্বত পেরিয়ে চলে যেত সেই নিম্ন ও মধ্য-ভল্গার বন্দর খাজারে,* চলে যেত বুলজারে—আমরা আজ সেই দেশে চলেছি। আরবীয় ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে আরও জানা যায় ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত। জানা যায় ভল্গারও উত্তরে স্লাভদের সঙ্গে সিরিয়া, চীন ও আমাদের দেশের ব্যবসার কথা।

সে যা-ই হোক, আমাদের পূর্বসূরীরা যে দেশে তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে চলেছে সেই সাতশো বছর আগে থেকে, সেই ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে† ভিখু শেখ নিয়ে যাচ্ছে এই ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে তার পণ্য—মালদহী মসলিন আর রেশম, আলীসাহেব নিয়ে যাচ্ছেন সুবর্ণরত্ন মণিমুক্তার পণ্য।

আরে তা তো হলো, কিন্তু হাকিমসাহেব, আব দেরী করলে যে যাত্রাকাল গত হয়ে যাবে! রামুগোঁসাই বাধা দিয়ে মৌলিমকে বলল, তোমাদের আর কি বাকি আছে জহব মিঞা? জহর স্থির দৃষ্টিতে কৃষ্ণাবাঈয়ের যৌবনপুষ্ট সুঠাম তনুর দিকে তাকিয়ে মধু-খাওয়া মৌমাছির মতো ঝিম ধরে দাঁড়িয়েছিল। গোঁসাইয়ের কথায় চমকে উঠে বলল, আজ্ঞে কত্তা পাঁচ পীরের পূজাই তো এখনো হয় নি।

কি রে গণি, কী করছিস তোরা? খেঁকিয়ে উঠল রামুগোঁসাই।

গৌড়ের বাসিন্দা, সওদাগরদের ভেতরে ভিখু শেখই প্রথম যাচ্ছে রুশ-মুলুকে, যেন কোন ত্রুটি না থাকে গোঁসাইঠাকুর। বলল কৃষ্ণাবাঈ।

* "ভারত-রুশ"—পি এম. কেম্প।

† Bengal District Gazetteer, Malda, by G. E. Lambourn. (1918), P. 59

আরে দেখছো না—সেই চেষ্টাই তো করছি কৃষ্ণাবাঈ, ভিখু যাবে বলে বাছা বাছা মৌলিম, সুখানজিয়ার, তুণ্ডীল অন্য কোন জাহাজে না পাঠিয়ে তোমাদের সঙ্গে পাঠালাম।

বল ভাই, পাঁচপীর বদর—বদর! স্বর্ণমুখীর গলুইয়ের ওপর একটা নারকেল ভেঙে তার জলটুকু ছড়িয়ে দিয়ে হেঁকে বলল গণি মিঞা। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত গলায় শোনা গেল—পাঁচপীর বদর বদর—

অমনি শুরু হয়ে গেল কাঁসরধ্বনি, ঠন্-ঠন্-ঠন্—

বেজে উঠল জয়ঢাক—ডুডুম-ডুডুম-ডুম-ডুমা-ডুম। নারকেলের মালাটা জলে ফেলে দিয়ে গণি মিঞা পাঁচপীর,—গাজী মিঞা, পীর হাথিলী, পীর জহল, পীর মহম্মদ, পীর বদরউদ্দিনের উদ্দেশে প্রণাম জানালো। রামুগোঁসাই নিরুদ্বিগ্ন ও নিরাপদ সমুদ্রযাত্রার প্রার্থনা জানালো জলাধিপতি বরুণের কাছে। নোঙর তুলল তুণ্ডীল গোবিন্দ ঘড়—ঘড়—ঘড়—

বল ভাই পাঁচপীর বদর বদর—

বদর—বদর!

জাহাজ ছাড়ল।

ভিখু অপলক চোখে তাকিয়ে রইল মহানগরী গৌড়ের রাশি রাশি প্রাসাদ-শীর্ষ ছাড়িয়ে দূরে মহানন্দার পাড়ে ঝাপসা কালো দিগন্তরেখার ভেতরে জবুথবু হয়ে লুকিয়ে-থাকা তার গ্রাম নিমা-সরাইয়ের দিকে। সেখানকার মাটিতে রেণু রেণু হয়ে মিশে রইল তার বাইশ বছরের জীবনের কত টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি। সেখানকার মাটিতে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে রইল তার স্নেহময়ী মা। মনে পড়ে গেল বাপজানের মুখখানা। হু-হু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। জল এসে পড়ল তার চোখের কোণায় কোণায়। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এল চিড়াইবাড়ি বন্দরের সমবেত জনতার ছবি—ঝাপসা হয়ে এল প্রাসাদনগরী গৌড়ের তীরভূমি।

॥ বারো ॥

গঙ্গার উত্তাল ঢেউ কেটে কেটে তর তর করে এগিয়ে চলল স্বর্ণমুখী আর গর্ভিণী, কোলান্দিয়া আর মনোজ্জিল।

শরৎকালের গঙ্গা। ভরা যৌবনবতী মেয়ের মতো তীব্র কলহাস্যে চারদিক মুখর করে চলেছে দূর সমুদ্রের দিকে। ভিখু চোখদুটো ছড়িয়ে দিল দূরে—বহুদূরে, যেখানে গঙ্গার বিশাল গৈরিক জলরাশি আবছায়া কুয়াশাময় দিগন্তে উধাও হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপরে বিপুলব্যাপ্ত নীল আকাশ, চাবদিকে অবারিত দিগন্ত, সামনে সমুদ্র-প্রবাহিনী নদীব উদ্দাম জলরাশি ভিখুর বিক্ষুব্ধ মনটাকে একটু একটু করে কেমন আবিষ্ট করে তুলল। তার মনে হলো নিমাসরাই-রোহনপুর-গৌড়ের সেই সংকীর্ণ শ্বাসরোধী কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সে যেন এই প্রথম পৃথিবীর অবারিত আলো-বাতাসের ভেতরে এল। এই নদী বেয়ে তারা সমুদ্রে পড়বে। বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর থেকে আরব সাগর অতিক্রম করে সে মধ্য-এশিয়ার কত অজানা নগর বন্দর জনপদ পেরিয়ে, কত জন-হীন এক-একটা পার্বত্য ভূভাগের ওপর দিয়ে চলে যাবে তার স্বপ্নের সেই কাস্পিয়ান-ভল্গার দেশে। তার বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল। কিন্তু তাদের জাহাজগুলো যেন বড় ধীরগতিতে চলেছে। এখনও—এখনও সমুদ্র অনেক দূর!

সমুদ্র অনেক দূর—অনেক দূর কাস্পিয়ান-ভল্গার দেশ। এই জাহাজেই দিন ফুরিয়ে রাত আসবে। দিন আর রাত্রি পরস্পর মালা গেঁথে চলবে। সমুদ্রের বুকেই কেটে যাবে মাসের পর মাস। হাকিম-সাহেবের মুখে শুনেছে, দিনের পর দিন শুধু অথৈ জল দেখতে দেখতে মানুষ নাকি কেমন অস্থির হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে উন্মন। সে-ও যদি—

ই খারওয়া—এই দাশু, পাল নামিয়ে ফেল্—চেঁচিয়ে বলল তুণ্ডীল, দেখছিস না হাওয়া একেবারে পড়ে গেছে—

দাশু অন্যান্য জাহাজের খারওয়াদেরও পাল নামাতে হুকুম করল। শুরু হয়ে গেল জলে দাঁড় ফেলার অবিশ্রান্ত শব্দ ঝপ্-ঝপ্-ঝপ্-ঝপ্—সেই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সারেঙ ননী শুরু করল নৌকা বাইচের বন্দনা গান—

প্রথমে বন্দনা করি নিত্যানন্দ হরি
দ্বিতীয়ে বন্দনা করি পূবে ভানু স্বর
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর
যাহাতে বাণিজ্য করে চাঁন্দ সওদাগর—

তার সহকারীরা ধরল দোঁহার—যাহাতে বাণিজ্য করে চাঁন্দ সওদাগর—

গানের সেই উদাত্ত সুর নদীর বুকের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ওপারের উঁচু পাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগল।

কি ভাবছো? নিঃশব্দ পায়ে কৃষ্ণাবাঈ এসে দাঁড়াল। ডালিমের দানার মতো রক্তাভ ঠোঁটে ঝিলমিল করছে হাসি। সাফল্যের হাসি। বিজয়িনীর হাসি। তার আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই সফল হয়েছে ভিখুর এই বাণিজ্যযাত্রা। খুব সহজে ভিখু তার সাহায্য নিতে চায় নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারে নি ভিখু। ওর বুকের ভেতরের সেই উদ্দাম বাসনাটাই তার কাছে নত করেছে তাকে। আবার বলল, কি শেখের পো, আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

কেন বলব না, তুমি আমার জন্য কত করেছো! নিভু-নিভু গলায় বলল ভিখু। কোন কথা বলল না কৃষ্ণাবাঈ। অভিমানে কালো হয়ে উঠল তার মুখখানা। কত নির্জন সন্ধ্যায়, কত স্তব্ধ দুপুরের নিরালায় এই মানুষটার সঙ্গে সে কত কথা বলেছে, কিন্তু ওর মনের কোন থৈ পায় নি সে। তবে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, মেয়েদের

নিয়েই ওর বুকের ভেতরে কোন গভীর ক্ষত আছে। সেই ক্ষতমুখ থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছে। তবুও ওর সেই বিস্বাদ-বেদনা, দুঃখ-আঘাতের অনেক—অনেক উর্ধ্বে ওর দুর্মর আর দুর্বার বাসনা—সেই সুদূর ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে বাণিজ্যযাত্রার বাসনা। সেই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছে বলে তার ওপরে কোন টান নেই, নেই প্রীতি-ভালবাসা—শুধু আছে কৃতজ্ঞতা। আর একটিও কথা না বলে সে মাথা নীচু করে নিঃশব্দ পায়ে চলে যাচ্ছিল। ভিখু ছুটে এসে খপ্ করে তার মোমের মতো নরম হাতখানা ধরে ব্যাকুল গলায় বলল, তুমি চলে যাচ্ছো! তুমি আমার কোন কথায় দুঃখিত হয়েছো?

কোন কথা নেই কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখে।

বেদনায় ম্লান চোখদুটোর বিষাদভরা দৃষ্টি দূরে পরপারের আবছায়া সবুজ গাছ-গাছালির দিকে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু শোনা যেতে লাগল শাঁ শাঁ বাতাসে জলের অস্ফুট কলোল্লাস আর দাঁড়ের একটানা শব্দ ঝপ্-ঝপ্-ঝপ্-ঝপ্—

কী ব্যাপার, চুপ করে আছো কেন? ভেতরের পুঞ্জীভূত অস্বস্তিটা বারুদের মতো ফেটে পড়ল, তুমিই বা কে—কেন আমার জন্যে এত করতে গেলে, কেনই বা আলীসাহেবকে জোটালে, সব মিলিয়ে আমার কিন্তু মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না—

আমি চেষ্টা না করলে, আলীসাহেব জাহাজ না দিলে তুমি আসতে পারতে?

আসতাম না—আসা হতো না, তাতে কি হতো? তীব্র অভিমানে অল্পবয়সী ছেলের মতো বলল ভিখু, সওদাগর হয়ে না হয় যেতাম না, কোন বিদেশী সওদাগরী জাহাজের তুণ্ডীলদের সঙ্গে মিশে ভেসে পড়তাম।

কেন, সওদাগর হয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে ভাল লাগছে না?

না-না, তোমাদের মতলব তো বুঝছি না—

মতলব ! যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কৃষ্ণাবাঈ। আহত একটা বিস্ময় ছটফট করতে লাগল তার দুটো কালো ডাগর চোখে। ভিখুর দেবদারুর মতো দীর্ঘ বলিষ্ঠ তনু, সোনার মতো রঙ, একমাথা ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল আর কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন দুটো বড় বড় চোখের দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে যেন নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল, কেন, নিঃস্বার্থে কেউ বুঝি কিছু করতে পারে না ?

আহা পারবে না কেন ? তুমি একটু খোলসা করে বলবে তো !

শুনবে ! হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে ভিখুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে কতগুলো কথা বলল। সঙ্গে সঙ্গে ভিখুর প্রশস্ত কপালে কে যেন আবির ছিটিয়ে দিল। তার হাতদুটো নিজেব হাতের ভেতর টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল কৃষ্ণাবাঈ, অনেকদিনই তোমাকে দূর থেকে দেখেছি, চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরছো, থেকে থেকে সমুদ্রের বড় বড় জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছো। একটু থামল সে। যেন অস্পষ্ট ছায়ান্ধকারে চিড়াইবাড়ির ঘাটে ভিখুর পায়চারি করার সেই সাবেক দিনের দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু তুমি কি করে দেখলে—তুমি কি বন্দরের আশেপাশে থাকতে ?

আমি ! ম্লান হাসি ফুটল কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখে। অস্ফুটস্বরে বলল, আমি জলের ধারেই থাকি—এই জলের বুকেই আমার জন্ম।

খট্—হঠাৎ একটা সন্দেহজনক শব্দ হলো। দ্রুতপায়ে চলে যেতে যেতে কৃষ্ণাবাঈ খুব চাপা গলায় বলল, তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে দুটো কথা বলার কি উপায় আছে ! আলীসাহেব আসছে। তার কথাগুলোর ভেতরে বিষাক্ত একটা বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল।

স্বর্ণমুখীর পারস্যের গালিচায় আবৃত কাঠের মেঝের ওপর স্বর্ণখচিত নাগরাই জুতোর মসমস শব্দ তুলে এল চম্বন আলী। ভিখুকে বলল, ওই হাসিন (সুন্দরী) দুখ্তার (মেয়ে) তোমার সঙ্গে কথা বলছিল, না শেখসাহেব ? মুহূর্তে ভিখুর মনটা কুঁকড়ে গেল। তার

কথার ভেতরে প্রভুত্বের সুরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিরক্তি চেপে গম্ভীর হয়ে বলল, কেন, কথা বললে কি হয়েছে?

আরে! তুমি গোঁসা করলে যে শেখসাহেব! জলের বুকে দাঁড়ের অবিশ্রান্ত সেই শব্দকেও ছাপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল চম্বন আলী। হাসির দমক কমলে বলল, কৃষ্ণবাঈকে দেখলে মনে হয় যেন একটা পরী হাওয়ার ওপর পা ফেলে চলেছে—একটু থামল চম্বন আলী। অদূরে কৃষ্ণাবাঈয়ের কক্ষের অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত রুদ্ধদ্বারের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপরেই কৃষ্ণাবাঈয়ের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল।

চার-চারটে জাহাজই দিয়েছে সুবর্ণশ্রেষ্ঠী এই ধনকুবের। অতএব প্রত্যেকটি অর্ণবপোতের মৌলিম-তুণ্ডীল পঞ্জেরী-খারওয়া থেকে শুরু করে আরোহীদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক সে—হয়তো এই বিশ্বাসটাই ওর রক্তের ভেতরে বিষের মতো ক্রিয়া করছে। হয়তো কেন, তাই হয়—তাই হয়ে থাকে। রামুগোঁসাই যেমন চিড়াইবাড়ির সারাটা বন্দরকে নিজের জমিদারী বলে মনে করে। ঠিক এই জন্যেই—এই জন্যেই সে এই লোকটার অংশীদার হয়ে সমুদ্র-বাণিজ্যে যেতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল।

স্ত্রী-বুদ্ধি! ভিখুর বিস্বাদ বিক্ষুব্ধ মনের ভেতরে কৃষ্ণাবাঈয়ের মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মতো কমনীয় মুখখানা, তার সেই বিচিত্র কথা-গুলো মনে পড়ে গেল, জলের বুকেই তার জন্ম—জলের ধারে থাকে। এসব হেঁয়ালীর অর্থ কি! আলীসাহেবকে দেখে কৃষ্ণাবাঈ-ই বা আশঙ্কিত হয়ে ওঠে কেন? তার মনে হলো কী একটা আসন্ন সর্বনাশ যেন সাপের মতো মাথা উঁচু করে নীল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সাজিয়া চল গো সখি, জলের ঘাটে যাই
হাঁ—হাঁ বেশ—বেশ,
যে ঘাটে ভরিব জল, সেই ঘাটে কানাই (গো)
জল ভরিব সুন্দরী কন্যা, জলে দিয়া ঢেউ
হাঁ—হাঁ—বেশ—বেশ

ঝপ্—ঝপ্—ঝপ্—ঝপ্—জলে দাঁড় টানার অবিশ্রান্ত শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাঝিরা সমবেত গলায় গান গেয়ে চলেছে।

টু—মা—ডে—ব জা—হা—জ কু—টা যা—বে—এ—

সপ্তগ্রামের কাছাকাছি আসতেই পর্তুগীজদের বিশাল সুঁচালো-মুখ 'ক্যানো' প্যাটার্ণের বিশাল একটা জাহাজ থেকে হেঁকে জিজ্ঞাসা করল।

অনে—ক—দূরে—রা—শি—য়া—য়—সারেঙ হেঁকে উত্তর দিল।

লালমুখো ফিরিঙ্গিদের তুই সত্যি কথা বলতে গেলি কেন? মৌলমি জহর মিঞা ধমকে উঠল ননীকে। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল, শালারা ব্যবসাব নাম করে বোম্বেটেগিরি কবে বেড়ায়।

আরে তুমি এখানে! হাকিমসাহেবের উল্লসিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ভিখুর পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বলল, আমি তোমাকে সারাটা জাহাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি! ভিখুব গম্ভীব বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে ভিখু?

ভিখু কোন কথা বলল না। একবার মনে হলো, কৃষ্ণাবাঈ আর চন্দন আলীর রহস্যময় আচরণের কথা বলে। আবার মনে হলো, এই উদাসীন উদার মহৎ মানুষটাকে সে ভাল করেই চেনে। সংসারের ক্লেদ-পঙ্কিলতার অনেক উর্ধ্বে তার মনের বাস। মাথা নীচু করে শুধু সে বলল, কবে সাগরে পড়ব হাকিমসাহেব?

এই তো সবে সপ্তগ্রাম ছাড়ালাম—এখনো সমুদ্র অনেক দূর ভিখু

ভাই। হেসে বলল হাকিমসাহেব, সমুদ্রে পড়লেই দেখবে তোমার মনটাও সমুদ্রের মতই যেন উদার এবং বিশাল হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল হাকিমসাহেব। বলল, তুমি একটু আমার ঘরে এস তো—কাজের কথা আছে।

তিনশো গজ দীর্ঘ ও বিশ গজ প্রস্থ এবং যার গলুই দুটো বিশালাকৃতি সিংহের মুখের মতো সেই স্বর্ণমুখীর শেষপ্রান্তে হাকিম-সাহেবের সুসজ্জিত কক্ষ। জানালায় দাঁড়ালেই চোখে পড়ে, গঙ্গার গেরুয়ারাঙা বিশাল জলরাশি ছাড়িয়ে ওপারের ঘনসবুজ দিগন্তরেখা।

তুমি কি পরিমাণ পণ্য নিয়েছো ? গৌড়ের কাগজের কারখানায় তৈরি লালচে মোটা কাপড়ের খাতা খুলল হাকিমসাহেব, বল— বল—

কেন বলুন তো ?

কেন ! একটু থামল হাকিমসাহেব। দূরে গঙ্গার বুকে সঞ্চারমান এক-একটা ছায়ার মতো জেলে নৌকোগুলোর দিকে তাকিয়ে ভরাট গলায় বলল, জান ভিখু ভাই, আজ যেটা ঘটনা, কাল সেটা ইতিহাস হয়ে যায়।

আপনি কি ইতিহাস লিখছেন ?

আমি কেন লিখব ? তুমি একবার বুখারায় চল না, দেখবে, সেখানে রাশিয়ার সওদাগরদের ভীড়ের ভেতর ক্রুয়িম্স্কির মতো, রজেনের মতো কত ভারত-প্রেমিক ঐতিহাসিকদের সঙ্গে দেখা হবে। তাঁদের বলতে হবে না, তুমি কি কি পণ্য নিয়ে তাদের দেশে বাণিজ্য করতে এসেছো ! একটু থামে হাকিমসাহেব। নিজের মনের গভীরে ডুব দিয়ে যেন অনেক—অনেকদূর থেকে বলে, শুনেছি, এই ষোড়শ শতাব্দীরই গোড়ার দিকে বাবর কাবুল কান্দাহার থেকে পারস্যের খোরাসান পর্যন্ত নাকি 'কাফেলা' (উটের ক্যারাভান) পাঠিয়েছিল—বুঝলে ভিখু, সেই জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর আমাদের বাদশা আকবরের পিতৃব্য। বিচিত্র মানুষ ! মাত্র বারো বছর বয়সে রাশিয়ার অন্তর্গত তুর্কীস্তানের একটি নগণ্য পরগণার অধিপতি হয়ে

শুধু নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সাহসের বলে ভারতে একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন।

ভিখু যেন রূপকথা শুনছে।

এই শতাব্দী শুরু হওয়ার চার বছর পরে (১৫০৪) বাবরশাহ কাবুল অধিকার করেছিলেন, তিনি কাবুলে এসেই জানতে পেরেছিলেন—জানতে পেরেছিলেন সেই বিচিত্র তথ্য—না থাক, তোমার মালের কথা বল তো।

না-না হাকিমসাহেব, বলুন—বলুন বাবরের কথা! ভিখু তার দুটো হাত জড়িয়ে ধরল, আমি তো এসব কিছু জানি না—জানার সুযোগও হয় নি। একটু চুপ করে থেকে বলল, আর একটা কথা বলব হাকিমসাহেব, আপনি যেমন দুনিয়ার দেশ-দেশান্তরের খবর বলেন, এমন তো আর কেউ বলে না!

কাবুলে এসেই বাবরের কানে এসেছিল প্রাকৃতিক সম্পদে যেমন সমৃদ্ধ, বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে যেমন উন্নত, তেমনি চরম দরিদ্র দেশ হলো এই ভারতবর্ষ। হাকিমসাহেব বলতে শুরু করল, কাবুলেব অবস্থান দেখে হয়তো ভেবেছিলেন, ভারতের সঙ্গে যদি মধ্য-এশিয়া তথা পারস্য থেকে একেবারে সুদূর রাশিয়া পর্যন্ত বাণিজ্যের যোগসূত্র গড়ে তোলা যায়, তাহলে ভারত তার পণ্যের জন্য নতুন একটা বাজার পেতে পারে। তাই কাবুল থেকেই তিনি প্রথম রাজকীয় সনদ দিয়ে গাঙ্গেয়ভূমির সওদাগরদের কাফেলা পাঠিয়েছিলেন।

বাবরশাহের আগে কি তাহলে আমাদের দেশের পণ্য পারস্যে, রাশিয়ায় যেত না?

যাবে না কেন, ভারতীয় .সওদাগররা ভল্লার বন্দরে যেত মৌর্যযুগ থেকেই, একথা তো আগেও বলেছি।

একটু থেমে বলল, বাবরের বাহাদুরি হলো, তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যবসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং প্রথম সরকারী ছাড়পত্র তিনিই দিয়েছিলেন।

আচ্ছা হাকিমসাহেব, কাবুলে এসেই কি করে ভারতের ব্যবসার ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ?

বাঃ! কাবুল হলো গিয়ে যেমন ভারতের দরজা, তেমনি আবার বলাখ্, ফেরগানা (বাবরের পৈতৃক রাজ্য), বুখারা, তুর্কীস্তান, কাইজার এবং বদ্খাসান এবং মধ্য-এশিয়ার আরও বহু ব্যবসা কেন্দ্রের কাছাকাছি। তাই এই—

কাবুলেই আমরা যেতে পারব না, তাই না হাকিমসাহেব ?

না-না, আমরা পারস্য থেকে স্থলপথে যাব। আচ্ছা সেসব আলোচনা পরে হবে, হাকিমসাহেব এবার দৃঢ় গলায় বলল, তুমি বল—বল কিসের কিসের এবং কত পরিমাণ কাপড় নিয়েছো ?

বলতে হবে না, আমার কাছে হিসেব আছে। বলেই বিরসমুখে ভিখু ময়লা একখণ্ড কাগজ তার হাতে দিল। হাকিমসাহেব পরম উল্লাসে সেই মালদহী মসলিন আর রেশমের বস্ত্রের বিপুল সম্ভারের বিবরণ খাতায় লিখতে শুরু করল।

—ছপ্-ছপ্-ছপ্-ছপ্—
জোনা ভাই রে—রে—রে—
পুবের থনে আইলা বাতাস
নদী হইল তল রে
জোনা ভাই—রে—

দাঁড়ের শব্দ, তুণ্ডীলদের গান আর জলের একটানা কলোল্লাস মিলিয়ে সেই বিচিত্র ঐকতানের মধুর সুর নদীর বুকের ওপর দিয়ে হু-হু বাতাসে দূর-দূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

জান ভিখু ভাই, তোমার নামও একদিন ইতিহাসে লেখা থাকবে।

বলছেন কি হাকিমসাহেব, কি এমন করেছি বলুন! সুবর্ণশ্রেষ্ঠী ধনকুমার যায় সুমাত্রায়, যবদ্বীপে, হোসেনচাচা যায় বাগদাদে!

কিন্তু তুমি রাশিয়ায় যাচ্ছো—অন্তত যেতে উদ্যোগী হয়েছো—মনস্থ করেছো।

কি যে বলেন হাকিমসাহেব!

না-না ভিখু, দেখবে একদিন—না, তুমি হয়তো দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ বংশধররা তোমাকে নিয়ে গর্ব করবে—কারণ তাদেরই এক পূর্বপুরুষ সেই সুদূর ভল্গা-কাস্পিয়ানের দেশে গিয়েছিল। একটু থামল হাকিমসাহেব। হঠাৎ ভিখুর উদ্দীপ্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আফানাসি নিকিতিনের নাম শুনেছো?

আফানাসি নিকিতিন! সে আবার কে?

আচ্ছা, তোমাকে বলব একদিন।

হা—কি—ম সাহেব—দুস্তের সঙ্গে যে খুব গপ্‌জাদন (গল্প) করছেন, আমরা কি মানুষ নয়? এল চম্বন আলী। তার সারা গায়ে সুগন্ধী সেরাজীর গন্ধ। নেশার আমেজে রক্তবর্ণ চোখদুটোকে প্রায় আধবোজা করে বলল, হাকিমসাহেব, আপনি না হয় সাধুসন্ত মানুষ—আপনার কথা আলাদা। কিন্তু আমরা তো সাধারণ সংসারী মানুষ।

ভিখু ঝড়ের মতো চলে গেল তার ঘরে। এই লোকটাকে সে একেবারে সহ্য করতে পারে না।

আপনি কি বলতে চাইছেন আলীসাহেব?

চম্বন আলী মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলল, আপনি, আপনার দুস্ত ভিখু ভাই, ওই আসমানের জীনপরীর মতো মকবুল (সুন্দরী) মেয়েটা কেউ-ই আমাকে পছন্দ করছেন না—

আলীসাহেবের কান্নার আভাসে করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল হাকিমসাহেব। সেই অট্টহাসির প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল স্বর্ণমুখী।

হাসির রেশ টেনে বলল, কেন, কৃষ্ণাবাঈ—ভিখু—ওরা কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলছে না বুঝি!

না হাকিমসাহেব, ঘেয়ো কুত্তা দেখলে যেমন তাকে দূর-দূর করে, ঠিক সেইরকম।

বয়সেরও তো একটা ধর্ম আছে আলীসাহেব, আপনার বয়স বেড়েছে, দেহ কমবুনিয়াজী (দুর্বল)—

কী! ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আরব সওদাগর চম্বন আলী, নেশার আমেজটুকু উবে গেল চোখ থেকে। সেখানে ফুটে উঠল আরবের মরুদস্যুর মতো হিংস্রদৃষ্টি। বলল, জানেন হাকিমসাহেব, এখনও চল্লিশ মাইল আমি জোরকদমে একদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে পারি—একসের ছোলার দানা খাই আমি 'সুভে' (ভোরে)—পাঞ্জা লড়তে পারি—

আচ্ছা—আচ্ছা, ঘাট হয়েছে আলীসাহেব, আমার ঘাট হয়েছে। আপনি বুড়ো হন নি। একটু থেমে হাকিমসাহেব আবার বলল, কিন্তু আলীসাহেব, জাহাজে আপনার সময় কাটানোর উপকরণের তো অভাব নেই, মনোজ্ঞিলে ঢালাও নাচগানের ব্যবস্থা আছে—সেখানেও হাসিন বাঈজী নেচে গেয়ে আপনার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে। কোলান্দিয়ায় বসিয়েছেন বাজার—সেখানেও টুকিটাকি জিনিসের বিকিকিনি চলছে—

হাকিমসাহেব! হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ আর গম্ভীর হয়ে উঠল চম্বন আলীর ভারী মাংসল মুখখানা। ভার-ভার গলায় বলল, আপনি সাদী করেছেন?

সাদী! অস্ফুট যেন একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল হাকিমসাহেবের মুখ থেকে। আর চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে এল যেন কোন দুঃস্মৃতি!

জানেন হাকিমসাহেব, আমরা সওদাগর আছি—কালাপানি পার হয়ে বছরের পর বছর বিদেশের বন্দরে বন্দরে ঘুরি, তাই আমাদের জানি বুজুরগ্‌রা (স্ত্রী) ভালবাসে না। চম্বন আলীর কথাগুলোর ভেতরে একটা হাহাকার ফুটে উঠল। আবার অনেক—অনেকদূর

থেকে বলল, ওই বেহেস্তের পরীর মতো সুন্দরী মেয়েটির মুখের কথার ওপরে স্রেফ চার-চারঠো জাহাজ দিয়ে দিলাম—

হাকিমসাহেবের মুখে হাসির আভাস ফুটল। করুণার হাসি। বলল, কৃষ্ণাবাঈকে তো আপনারা গৌড়ের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকরাই ভাল করে জানেন আলীসাহেব। আর—

আর কি?

আর আপনি তো জানেন, আরবীতে একটা প্রবাদ আছে, অল অজলু মিনা শয়তান—হন্তদন্ত হয়ে কিছু করার মানেই শয়তানের খপ্পরে—

হো-হো করে হেসে খুশিতে ভেঙে পড়ে বলল, অলীজাহের, বরাদরে আজীজে মন (হে আমার প্রিয় ভ্রাতা) দের আয়দ্ দুরুস্ত আয়দ অর্থাৎ যা কিছু ধীরে সুস্থে আসে, তাই মঙ্গলদায়ক—বেশ, ধীরে-সুস্থেই আসুক।

তাই ভাল।

কিন্তু তা হয় নি। দেরী করে নি চন্দন আলী। করতে পারে নি। ধনী বিত্তশালী মানুষের জন্মলগ্নেই থাকে একটা ভয়ঙ্কর অভিশাপ! —পৃথিবীর সমস্ত রকম ভোগের উপকরণগুলো তার হাতের মুঠোর ভেতরে পাওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাকে যক্ষ্মার জীবাণুর মতো কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। কিন্তু সুন্দরী নারী, সম্পদ, অর্থ সব—সব তার হাতে তুলে দিলেও তার আকাঙ্ক্ষার পরিধি দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ির মতো ক্রমাগত বেড়েই চলে। তারপরে একদিন তারই অজস্র স্বার্থ বাসনা কামনা দিয়ে তৈরি শ্বাসরোধী অন্ধকার কবরের ভেতরে বন্দী হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

যাক সেসব কথা। শরতের শান্ত গঙ্গার বুকে তাদের নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত জলযাত্রার আড়ালে কেমন করে তিনটি নরনারীর জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল সেই ঘটনায় আসা যাক—

রাত্রি নেমেছিল ঘন হয়ে। আর রাত্রির বাতাসে স্নান করে আকাশের তারাগুলো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রাশি

রাশি অগণন তারা আর নক্ষত্রের ছায়া বুকে নিয়ে দুলছিল গঙ্গার জল। যতদূর চোখ যায়, নির্মেঘ আকাশের বুক চিরে শুধু বিশাল ছায়াপথের আভাস। হাওয়া বইছিল হু-হু করে। আর সেই অনুকূল বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলছিল স্বর্ণমুখী, গর্ভিণী, কোলান্দিয়া আর মনোজ্জিল। কোলান্দিয়ার বাজারের ছোট ছোট বিপণির আলো নিভে গিয়েছে ; থেমে গিয়েছে মনোজ্জিলের নাচ-গান। ছাদের ওপরে নৃত্যস্থলীর চারদিকে ধূপা-ধার থেকে সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছিল গঙ্গার মত্ত বাতাসে। ঠিক সেই সময়—

সেই সময় দুটো ছায়ামূর্তির মতো ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে ছিল পাশাপাশি। কিন্তু তাদের কারো মুখে একটাও কথা ছিল না। যেন কোন প্রিয়জনের শবদেহকে ঘিরে তারা নিঃশব্দে বসে ছিল!

তারপর ?

তারপর আর কি—আমিও দেখতে দেখতে বড় হলাম। আমার দেহ ছাপিয়ে এল ভরা যৌবন। মা-র মতো আমারও নিমন্ত্রণ আসতে লাগল গৌড়ের সওদাগরদের কাছ থেকে। তারা মাসের পর মাস সমুদ্রের বুকে জাহাজে কাটাবে। তাই আমাকে চাই তাদের—

তুমি তাহলে—

হ্যাঁ। আমি প্রমোদসঙ্গিনী, আমি বারবধূ—আমি—আমি একটা বেশ্যা। অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় চাপা আর্তনাদ করে কৃষ্ণাবাঈ বলে, আমি অত্যন্ত নীচ আর ঘৃণ্য।

আহা—ওসব কথা রাখ। তুমি যা-ই হও, আমাকে তুমি চন্দন আলীর অংশীদার করতে গেলে কেন ? কেন ওই মন্তপ আরব বেনেটার হাত ধরে অনুরোধ করতে গেলে ? অসহ্য বিরক্তিতে জ্বলে-পুড়ে ভিখু বলল, এখন ও তো তোমার কাছে ঘুর-ঘুর করবেই—তুমিই ধান ছড়িয়েছো—

তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে কৃষ্ণাবাঈ হেসে ফেলল। কিন্তু পর-

মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল। বিষাদের ছায়া ভেসে উঠল তার মুখে। আলগোছে অতি সন্তর্পণে ভিখুর বুকের ওপর মাথা রেখে অস্ফুটস্বরে বলল, কেন করেছি বুঝতে পারছো না?

না-না, কাজটা মোটেই ভাল করনি—একেবারে বোকার মতো করেছো কাজটা।

কেন? বিদ্যুৎগতিতে ভিখুর কাছে থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়ালো সে। উদ্যত-ফণা সাপিনীর মতো দুলে উঠল তার দীঘল দেহটা, বলল, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারি না? তোমার মনের একটা বাসনাকে মেটাতে আমি একটু সাহায্য করতে পারি না?

কেন তুমি গায়ে পড়ে উট্‌কো সাহায্য করতে যাবে? ভিখু এবার মরিয়া হয়ে বলল, তুমি তো গৌড়ের খানদানী সওদাগরদের সঙ্গে ওঠা-বসা কর—হোসেনচাচার সঙ্গে ধনকুমারের সঙ্গে সুমাত্রা, সিংহল, যবদ্বীপ গিয়েছো। একটু থামল। তরল অন্ধকারে কৃষ্ণাবাঈয়ের যন্ত্রণা-কাতর কালিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে একটু নরম হলো। কেমন শুকনো গলায় বলল, আমি হলাম গিয়ে গেঁয়োমানুষ -রেশমের ব্যাপারীর ছেলে—আমার ওপরে তোমার কৃপার—

আর সহ্য করতে পারল না কৃষ্ণাবাঈ। নদীর বুকের ওপর জমে-থাকা সমস্ত অন্ধকার যেন চেপে নেমে এল তার মুখে। নিরুদ্ধ যন্ত্রণার উজান ঠেলে আর একটা কথাও বলতে পারল না। শুধু জলভরা চোখদুটোর করুণ দৃষ্টি ভিখুর নির্বিকার পাথরের মতো মুখের দিকে তুলে ধরল আর ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, অনেক রাত হয়েছে। আমি আজ যাই, কেমন?

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভিখু। তার স্নায়ুগুলোর ভেতর থেকে উঠে আসতে লাগল একরাশ কুয়াশা।

স্বর্ণমুখীর দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিন্দ দিয়ে ধীরপায়ে তার খাসকক্ষে চলেছে কৃষ্ণাবাঈ। বেদনার ভারে অবসন্ন মন। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে

দেহ। তার মনে হলো—মনে হলো, মনের সবচেয়ে গূঢ় কথাটি কিছুতেই বলা যায় না। মানুষ তাকে অত্যন্ত প্রিয় সম্পদের মতো সঙ্গোপনে রাখতে চায়। কি করে, কেমন করে বোঝাবে ভিখুকে কেন ওর ওপরে তার আকর্ষণ? কেন গৌড়ের দেশী-বিদেশী সওদাগরদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে সে-ভিখুর সমুদ্রযাত্রার সঙ্গিনী হয়েছে? সেসব কথা বুঝিয়ে বলতে হলে তো সাবেক দিনের অনেক কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে হবে। আর সেই দুঃসহ জ্বালাধরা অতীত দিনের স্মৃতির ঝাঁপি খুললেই বেরিয়ে আসবে এক-একটা বিষধর সাপ।

ধনকুমার।

হোসেন চৌধুরী।

আরও অনেক—আরও অনেক। তাদের সেসব মুখের ছবি কবে তার মনের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। এখন আর চেষ্টা করলেও তাদের একটা মুখও মনে করতে পারবে না। শুধু তার স্মৃতির ভেতরে জ্বলজ্বল করে তাদের বীভৎস কামনার নির্লজ্জ বিকার—মনে পড়ে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো এক টুকরো মাংসের জন্য তাদের লোলুপ উল্লাস। এসব কথা ভাবতে ভাবতে বাইরে তার ঘুমন্ত পরিচারিকা জুবেদার পাশ কাটিয়ে যেই তার কক্ষে পা দিল, অমনি তাকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরল আর এক নেকড়ে। বলিষ্ঠ দুটো হাতে তাকে ময়দার নরম তালের মতো পিষতে পিষতে চাপা—খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, মেহেরবাণী করে চিৎকার করো না সুন্দরী। কত করে বলেছি, তুমি তো আমার ঘরে এলে না—তাই—

আপনার পায়ে পড়ি আলীসাহেব! মেহেরবাণী করে শুনুন! এই বেতমিজ কাজ করবেন না—আপনি আমার বাপজানের বয়সী—

কেন উগ্র-উগ্র কর তুমি! তীব্র আক্রোশে কামনার জ্বালায় ফুঁসে উঠল চন্দন আলী। লালসার আগুনে তার চোখদুটো জ্বলছে ধকধক করে। কৃষ্ণাবাঈয়ের দীঘল দেহ, প্রখর হয়ে জেগে-থাকা স্বাস্থ্য ও যৌবনের দিকে বাঘের মতো একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে

তাকিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল ধাপে ধাপে। কৃষ্ণাবাঈও এক পা এক পা করে পিছু হটতে লাগল। সাপের মতো হিস হিস করে বলল চম্বন আলী, খবরদার, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো না—টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করো না। চম্বন আলীর একটা ইজ্জৎ আছে।

বলতে বলতে বাঘের থাবার মতো হাত দিয়ে একটানে খুলে ফেলল তার গজমোতির কণ্ঠহার। বলল; চম্বন আলী নিজে কখনো কোন জেনানার ঘরে যায় না—তার কামরাতেই জেনানারা যায়। জান সুন্দরী, তোমার খুশ্‌নসীব—বলেই যেই তার মসৃণ মলমল শাড়ির নীচে সোনার কাঁচুলীতে আবদ্ধ সুডৌল বুকের দিকে আলীসাহেবের লুব্ধ আর মত্ত হাতটা সরীসৃপের মতো এগিয়ে এল, অমনি আর্তনাদ করে উঠল কৃষ্ণাবাঈ—জু—বে—দা—হাকিমসাহেব—

এই দাশু, ননী, গ-ণি—তোরা কি সবাই—ঘু-মি-য়ে প-ড়ে-ছিস? মৌলিম জহর মিঞার আর্তনাদটা নিশিরাতের স্তব্ধতা আর জলের একটানা কলোচ্ছ্বাসকেও ছাপিয়ে শোনা গেল।

সেই আর্ত চিৎকারে জেগে উঠল প্রতিটি জাহাজের সারেঙ, জেগে উঠল সুখানজিয়ার-মৌলিম-তুণ্ডীল-খারওয়ার দল। পঞ্জেরীরা (মাস্তুলের ওপরে উঠে যারা আকাশের মেঘ পর্যবেক্ষণ করতো) সাঁ-সাঁ করে উঠে পড়ল দীর্ঘ-শীর্ষ মাস্তুলগুলোর ওপরে। দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকারে চোখদুটো বিস্ফারিত করে মেলে ধরে দেখল, আকাশের ঈশানকোণে গিন্নী শকুনের ঠোঁটের মতো একটুক্‌রো মেঘ দেখা যাচ্ছে। থেমে গেছে বাতাস।

ঝড় আসছে!

॥ তের ॥

সমুদ্র!

এবারে সমুদ্রে পড়ল গৌড়ের আরবীয় সওদাগর চম্বন আলী—শেখ ভিখুর নওয়ারা (নৌবহর)। স্বর্ণমুখীর কারুকার্যমণ্ডিত রেলিং-এ ভর দিয়ে পাথুরে একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ভিখু। তার অপলক ছুটো চোখে কেমন একটা মুগ্ধ তন্ময়তা থমথম করছে।

আশ্চর্য! -তার মনে হলো, আল্লার আশ্চর্য সৃষ্টি এই সমুদ্র! যতদূর চোখ যায়, কী বিপুলব্যাপ্ত উদ্দাম আর কী সুদূরবিস্তৃত জলবাশি! চারদিকের আকাশটা যেন পাঁশুটে বঙেব প্রাচীরের মতো নেমে এসেছে সমুদ্রের বুকের ভেতরে। দূরে—বহুদূরে কেমন একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতার ভেতর থেকে মত্ত হস্তীর মতো এক-একটা বিশাল ঢেউ ছুটে আসছে তাদের জাহাজের দিকে। কিন্তু কাছে এসেই কি এক যাতুমন্ত্রে যেন মত্ত আক্রোশ ভুলে গিয়ে মাথা নীচু করে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। সমুদ্রের একটানা সরোষ গর্জন আর বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দকেও ছাপিয়ে শুধু শোনা যাচ্ছে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। সমুদ্রের সেই অন্তহীন বিশালতা -সেই দিক্‌চিহ্নহীন বিস্তৃতিব সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভিখুর নিজেকে মনে হলো অত্যন্ত নগণ্য আর তুচ্ছ। একটা হীনমন্যতার কালো কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। মনে পড়ে গেল আলীসাহেবের কথা, রামুগোঁসাইয়ের কথা—গৌড়ের আর আর বিপুল বিত্তবান দেশী-বিদেশী সওদাগরের কথা। ওরা কি কখনও আল্লাহের এই বিশাল মহিমার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছে! সমুদ্র তো দূরের কথা, মহানগরী গৌড়েরই উপকণ্ঠে ভাতারমারীর ধূ-ধূ নিঃসীম প্রান্তরটার সেই অবারিত দৃশ্যটাই কি দেখেছে! দেখেছে গৌড়ের বিশাল গঙ্গার পরপারে পশ্চিমের

আকাশে সূর্যাস্তের সেই রঙীন সমারোহ, দেখেছে ভোরের কুয়াশাকে রাঙিয়ে দিয়ে সূর্যোদয়ের সেই দিক্‌প্লাবী উৎসব! শুধু বিপুল বৈভবের অধিকারী আলীসাহেব নয়, বেশির ভাগ মানুষকেই সংসারের ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, ছোট ছোট হাজারো স্বার্থের প্রহরীরা এমন করে নজরবন্দী করে রাখে যে, মাথার ওপরের উদার ও অন্তহীন আকাশটার দিকেও একবার তাকাতে পারে না। দুনিয়া জুড়ে গড্ডলিকা স্রোতের মতো অতি সাধারণ মানুষদের জন্য তার করুণা হলো। গভীর একটা সহানুভূতির রসে ভিজে ভিজে হয়ে উঠল তার মন আর একটু একটু করে নিবিড় একটা প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে এল তার সমস্ত চেতনা। সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা উদার, মহৎ ও বিপুল অনুভবের ভেতরে বিলীন হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সারি সারি কয়েকটা মুখের ছবি।

বাপজান।

নসীবন।

মা।

কৃষ্ণাবাঈ।

না। সে অন্যায় করেছে, গর্হিত অন্যায় করেছে। নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছে তাদের। নিমাসরাই-রোহনপুরের সংকীর্ণ পরিধির বাইরে কিছু ভাবতে পারে না বলে বাপজানকে রূঢ় আঘাত করেছে, পায়ে মাড়িয়ে এসেছে বাল্যসাথী নসীবনের নিবিড় আর অনাবিল প্রেম। তারই জন্য গভীর দুঃখ বুকে নিয়ে বেহেস্তে চলে গিয়েছেন মা। আর— আর মহানগরী গৌড়ের নগর-শোভনা সুন্দরী রমণী কৃষ্ণাবাইয়ের প্রতিও অবিচার করছে। হতে পারে সে স্বৈরিণী— হোক সে বারবধূ, থাক তার ঘরে বারবাসরের লীলা—তাতে তার কি এসে যায়! ভাবতে হবে, তাকে দেখতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, কেন নগরসুন্দরী গৌড়ের বিত্তশালী সওদাগরদের সমুদ্রযাত্রার প্রমোদ-সঙ্গিনী হওয়ার লোভনীয় আমন্ত্রণ

অগ্রাহ্য করে তার জন্য রামুগোঁসাইয়ের কাছে, আলীসাহেবের কাছে অনুগ্রহ নিতে চায়? কিসের দুর্বার বাসনায় সেই সুদূর কাস্পিয়ান-ভল্গাগামী এই দুঃসাহসী সমুদ্রযাত্রায় তার সান্নিধ্য পেতে চায়?

সমুদ্রের নিঃসীম অবারিত সেই দৃশ্য তাকে তার নিজের জীবনের যত অভিমান ও আক্ষেপ, ব্যথা-বেদনার ক্লেদ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে উদার, মহৎ এবং বিপুল একটা অনুভবের বিশাল পটভূমিতে প্রসারিত করে দেয়।

ভিখু ভাই, তোমাকে বলেছিলাম আগে সমুদ্রে পড়, দেখবে মনের ভেতরে এতটুকু আবিলতা থাকবে না। সমুদ্রের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছাড়া-ছাড়া গলায় বলল হাকিমসাহেব।

ভিখু চুপ করে থাকল। অভিভূত সেই আচ্ছন্নতার ভেতরে যেমন ডুবে ছিল তেমনি ডুবে রইল। সমুদ্রের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অস্পষ্ট গলায় বলল, ঠিকই বলেছিলেন হাকিমসাহেব—

আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে, আস্তে আস্তে বলল হাকিমসাহেব, আজ থেকে ঠিক একশো এগারো বছর আগে ঠিক যে পথ দিয়ে প্রথম রুশীয় বণিক ভারতে এসেছিল, আমরাও সেই পথ ধরে রাশিয়ায় যাচ্ছি ভিখু।

কার কথা বলছেন হাকিমসাহেব?

তোমাকে বলেছিলাম আফানাসি নিকিতিনের কথা। তিনিও রাশিয়া থেকে পারস্য হয়ে হোর্মুজ প্রণালী পার হয়ে এই ভারত মহাসাগরের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়েই ভারতে এসেছিলেন।

আপনি নিকিতিনের কথা কেমন করে জানলেন?

আমি যখন খোরাসানের রাজধানী মেসেদে ছিলাম, তখন সেখানকার এক পণ্ডিতের কাছে শুনেছিলাম এই দুঃসাহসী রুশীয় বণিকের ইতিহাস।

নিকিতিন কি গৌড়ে এসেছিলেন?

না-না, নিকিতিন ভারতে এসে প্রথমে দাক্ষিণাত্যের বিজয়-নগরের মাটিতে পা দিয়েছিলেন।

কিন্তু খোরাসানের পণ্ডিতরা কেমন করে তাঁর কথা জানতে পেরেছিল?

বাঃ! বললাম না, নিকিতিন মস্কো এবং টেভর থেকে আরও অনেক রুশীয় বণিক ও রাজদূত ভ্যাসিলি পাণিনের কাফেলার সঙ্গে পারস্যের শেমাখায়* এসেছিল। হঠাৎ থামল হাকিমসাহেব। কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে আবার বলল, মধ্য-এশিয়ার রুশীয় দূত পাঠানোর একটা কারণও ছিল।

নিশ্চয়ই শেমাখা থেকে রাশিয়ায় আগে দূত পাঠিয়েছিল?

হ্যাঁ, সে তো বটেই। শেমাখার শিরভানশাহ প্রথমে মস্কোতে দূত পাঠিয়েছিল; কিন্তু সৌজন্যমূলক পাল্টা দূত পাঠানো ছাড়াও জারের উদ্দেশ্য ছিল মস্কো থেকে ভারতে যাওয়ার সবচেয়ে নিরাপদ বাণিজ্যপথের খোঁজ করা। আর সেই কাজে প্রথম কৃতকার্য হয়েছিলেন খাঁটি ব্যবসায়ী আফানাসি নিকিতিন। একটু থেমে হাকিম-সাহেব আবার বলল, নিকিতিনের মতো উদার আর মহাপ্রাণ রুশকে মুসলমানের ছদ্মবেশ নিয়ে এদেশের শহরে নগরে ঘুরতে হয়েছিল।

সে কী, কেন?

বলব—সব বলব, সে যেমন দীর্ঘ, তেমনি করুণ এক ইতিহাস। থামে হাকিমসাহেব। তার চোখের দৃষ্টি সুদূর হয়ে ওঠে।

সে যেন দেখতে পায় বিগত শতাব্দীর দক্ষিণ-ভারতের পথে পথে এক অসহায় আর অতি সাধারণ রুশীয় বণিক খোরাসানী মুসলমানের ছদ্মবেশে ঘুরছে।

বেলা বাড়ে। গা টেনে টেনে সূর্য একটু একটু করে মাথার ওপর উঠে আসে আর নীলাভ রঙের বিশাল একটা চাদরের মতো এলিয়ে

* "ভারত-রুশ" পি. এম. কেম্প। পৃঃ ১৪-২৯

থাকা সমুদ্রের জলবিস্তারের ওপরে আলোর একটা জ্যোতির্ময় রেখা প্রসারিত হয়ে যায়। হঠাৎ যেন তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে। প্রায় একসঙ্গেই তারা পরস্পরকে প্রশ্ন করে, আলীসাহেবকে দেখছি না কেন? আলীসাহেব কোথায়?

এর নাম বঙ্গোপসাগর, মৌলিম জহর মিঞার ভাঙা-ভাঙা গলার স্বর শোনা যায়, এখন দেখছ শান্ত সুবোধ ছেলের মতো, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, কিন্তু খেপলে আর রক্ষে নেই— তখন একেবারে তার রাক্ষুসে চেহারা।

জান মৌলিমসাহেব, সারেঙ বলল, আমি একবার গৌড়ের পাঠান সওদাগর রহমতের নওয়ারায় গিয়েছিলাম। হঠাৎ থেমে যায় ননী। মাথা চুলকায়। বলে, ওই যে গো, তোমাদের ভাষায়, 'সুদকাওয়ান'—বোম্বেটেরা যাকে বলে 'পোটোগ্রাণ্ডে'—

ও, চট্টগ্রামের কথা বলছো?

হ্যাঁ—হ্যাঁ। সেই চাটগাঁ বন্দরে এই সমুদ্রের ঝড়ে পড়েছিলাম।

আচ্ছা মৌলিমসাহেব, আমরা তো মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠি। আকাশে মেঘ দেখলে আপনাকে খবর দিই। পঞ্জেরী শম্ভু বলে, কিন্তু মেঘই বা হয় কেন আর ঝড়ই বা আসে কেন?

বহুদর্শী মৌলিম কথা বলে না। কালো কুচকুচে দাড়িতে হাত বুলায় আর সমুদ্রের নিঃসীম জলরাশির দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, ওসব বুঝতে হলে দু'একবার কালাপানিতে গেলেই হয় না রে শম্ভু—আমার মতো দাড়িতে একটু একটু পাক ধরুক—

বল না মৌলিমসাহেব, সুখানজিয়ার গণি বলল, সারাটা জীবন শুধু হাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই হালকান হয়ে গেলাম।

বলব রে বলব—সব বলব। জহর তার বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস সমুদ্রের শাঁ-শাঁ বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে বলল, এই তো সবে সমুদ্দুরে পড়লাম—এখন দেখ কতদিন, কত মাস কেটে যাবে। তোমাদের বলব সমুদ্দুরের রহস্যের কথা—

সমুদ্দুরের আবার রহস্য কি? তুণ্ডীল প্রশ্ন করে।

বল্লিস কিরে গোবিন্দ? সমুদ্দুরে নেই এমন জিনিস নেই। এখানে অন্ধকারে রাত্রে ঢেউয়ের মাথায় মাথায়—হঠাৎ থেমে যায়, হাতত্থটো কপালে ঠেকিয়ে বলে, তেনাদের নাম করতে নেই—জলের জীনপরী অপদেবতা—সমুদ্রগোরু—সমুদ্রষাঁড়—সমুদ্রসন্ন্যাসী—সমুদ্রপুরোহিত—

বল—বল না মৌলিম ভাই! খালাসীরা যে-যার কাজ ফেলে মৌলিমকে চারদিক থেকে ঘিরে বসে।

উঁহু উঁহু, এখন গপ্পোসপ্পো করতে দেখলে আলীসাহেব গোঁসা করবে ভাই। জহর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

আরে ধুর, তুমিও যেমন। বুড়ো তো সেই রাত থেকে—অদূরে ভিখু ও হাকিমসাহেবকে লক্ষ্য করে—নেশা করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ফিসফিসিয়ে বলল শম্ভু।

জহর কথা বলল না। কয়েক মুহূর্ত কি চিন্তা করে বলল, ব্যাপার কি হে, বুড়োর বুকের কলিজার মতো এই জাহাজ চারখানা। দিনের ভেতরে পঞ্চাশবার আমার কাছে জাহাজের খোঁজ নেয়—আজ সকাল থেকে একবারও—

কে জানে মৌলিমসাহেব, ওসব বড় লোকদের ব্যাপার। জানিস ওই নিমাসরাইয়ের রেশমের ব্যাপারী, আলীসাহেব আর, ওই—বলেই থামল খারওয়া। দূরে কৃষ্ণাবাইয়ের কক্ষের দিকে তাকিয়ে চোখত্থটো নাচিয়ে একটু মুচকি হেসে বলল, সওদাগরী জাহাজের রাণ্ডীটার ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু চলছে ভাই!

রাণ্ডীটার ঝোঁক তো ওই খাপ্‌সুরৎ ছোঁড়াটার দিকে। আর এই বুড়ো আরবীয় সোনার বেনেটাও তেমনি কাঁচা পেয়ারার মতো ডাঁসা মাগীটার আশেপাশে ছোঁক ছোঁক করে।

হা আল্লা, লাগ ভেল্কী—লাগ। হাততালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল খারওয়া।

এই বেতমিজ উল্লুক কোথাকার! কপট রাগের ভঙ্গীতে ধমকে উঠল জহর মিঞা, কোনরকম বদমায়েসী করবি না। রাগ-রাগ গলায় কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু চাপা হাসির আলোয় তার কালো দাড়ি ভরা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নীচু গলায় আবার বলল, শোন্, আমরা খালাসী। জেনে রাখবি চোখ থাকতেও আমরা অন্ধ, কান থাকতেও আমরা কালা, মুখ থাকতেও আমরা বোবা।

কেন? আমরা বোবা-কালা-কানা হতে যাব কোন্ দুঃখে?

চুপ রও বেতমিজ কাঁহা কা! আবার খিঁচিয়ে ওঠে মৌলিম।

আবার গুজগুজ করে বুঝিয়ে বলে, তামাম দুনিয়াতেই সওদাগররা রাণ্ডী নিয়ে যায় কালাপানিতে। আর সেই মাগীকে নিয়েই গোলমাল বাধে। একটু থামে জহর। অতীত দিনের বিভিন্ন জাহাজের ঘটনাগুলো যেন তার চোখে ভাসে। আবার বলে, অনেক সময় খুন-খারাবি, লাশ মাঝ-দরিয়ায় ফেলে দেওয়া পর্যন্ত নারকীয় কাণ্ড-কারখানা হয়। সেসব দেখে-শুনে আমাদের চুপ করে থাকতে হয়। এই হলো জাহাজী কানুন। আমরা যে খালাসী।

পঞ্জেরী খারওয়া তুণ্ডীল সুখানজিয়াররা বা আর কেউ একটাও কথা বলে না। মৌলিমের প্রত্যেকটি কথা তাদের অন্তরে তীরের মতো বিঁধে যায়। দিবারাত্রি সদাসতর্ক প্রহরীর মতো কাজের বন্ধন থেকে মুহূর্তের জন্য ওরা সরস গল্প-গুজবে একটু যে অবারিত পরিবেশের ভেতরে বেরিয়ে এসেছিল, জহর মিঞার সতর্কবাণীটা যেন অঙ্কুশের খোঁচা দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল সেই শ্বাসরোধী কর্মচক্রের ভেতরে।

কোলাম্বিয়ায় টুকিটাকি জিনিসের দোকানে দোকানে বেশ ভীড় জমে উঠেছে। দোকানীরা গৌড়েরই অধিবাসী ছোটখাটো ব্যবসাদার। ক্রেতা হলো জাহাজেরই তুণ্ডীল মৌলিম সুখান-

জিয়ার অর্থাৎ খালাসীর দল আর নাখোদা ভাণ্ডারী কেরানী নাখোদা খেসব—আরও সব কর্মচারী। শুধু দোকানী নয়, ছ'-একজন যাছকর, বহুরূপী, সাপুড়ে, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফকিরও নিয়ে এসেছে আরব সওদাগর চম্বন আলী। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তিকর একঘেয়েমী দূর করতে বৈচিত্র্যের অভাব রাখে নি আলীসাহেব।

আসুন—আসুন ভাইসব, চলে আসুন। রাত্রির প্রথম প্রহরে আহার করবেন, দেখবেন দ্বিতীয় প্রহরেই আপনি নওজওয়ান হয়ে গিয়েছেন। কাঠের একটা উঁচু বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করছে ফকিরসাহেব, অথচ কিছুই না, গাধার খুরের গুঁড়ো, খেজুরফুলের—

ফকিরের কেরামতি কী দেখছেন ভাইসব, আসুন, এই দেখুন, ফকিরের কণ্ঠস্বরকেও ছাপিয়ে চিৎকার শোনা যায় যাছকরের, হেঁ-হেঁ বাবা, ভেল্কী নয়, এ রীতিমত যাছবিদ্যা। এই দেখুন, একঘটি জলে হাত ডুবিয়ে দিচ্ছি—বলতে বলতে সে একঘটি জলে তার কালো লোমশ হাত ডুবিয়ে দিয়ে উপস্থিত দর্শকদের দিকে এগিয়ে দিল ঘটিটা। বলল, একটু একটু চুমুক দিয়ে দেখুন—

বাঃ, এ যে একেবারে গুড় গোলা! আশ্চর্য তো?

এই ফকির ও যাছকরকে কেন্দ্র করে ভীড়ের পাশ কাটিয়ে প্রত্যেকটি দোকান দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে হাকিমসাহেব আর ভিখু।

না। কোলান্দিয়ার কোথাও নেই চম্বন আলী। স্বর্ণমুখীতে তার খাসকক্ষের ছয়ারটাও হাট করে খোলা। তাদের চোখে চোখে নিঃশব্দে ঘুরতে থাকে আর একটা প্রশ্ন, কৃষ্ণাবাঈ-ই বা কোথায়?

চল তো, মনোঞ্জিলে আছে ওর খাসনবীশ। হাকিমসাহেব বলল, হয়তো বুড়ো বসে বসে তার সোনাদানার হিসেব দেখছে।

ওরা এল মনোঞ্জিলে। সেখানে বসেছে গৌড়ের চৌপট্টির বিখ্যাত নর্তকী রত্নাবাঈয়ের নাচের আসর। গম্ভীর শব্দে বাজছে

পাখোয়াজ, বাজছে কাঁসি-বাঁশী আর দামামা দগড়। সেই বিচিত্র ও উদ্দাম ঐকতানের জলদ সুরের সঙ্গে মিলিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত এক উন্মাদিনীর মতো নেচে চলেছে রত্নাবাঈ। নৃত্যের মুদ্রায়, চোখের কটাক্ষে, সুপুষ্ট নিতম্বের দ্রুত লয়ের আলোড়নে আর তীব্রভাবে আন্দোলিত উদগ্র দুটো বক্ষকুম্ভের সুডৌল আভাসে ফুটে উঠছে আমন্ত্রণের হাতছানি। জাহাজের খালাসী এবং আর আর কর্মচারীরা সেই নৃত্যস্থলীর চারদিকে উদর পূর্ণ করে মধু-খাওয়া মৌমাছির মতো নিথর হয়ে বসে আছে।

না, আলীসাহেব রোজই সকালে এখানে আসে বটে, আজ আসে নি। আফিং-এর নেশায় ঢুলুঢুলু চোখদুটো তুলে ধরে কোন-রকমে বলল খাসনবীশ ইয়াসিন। তার ঘরের চারদিকে আবলুশ কাঠের থাকে থাকে সাজানো রেশমের এক-একটা থলিতে মণি-মুক্তা-প্রবাল-বৈদুর্যমণি-পুশরাগ ইত্যাদি।

আলীসাহেব নেই মনোজ্জিলের কোথাও? গেল কোথায় রে বাবা? ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে ওঠে হাকিমসাহেব। বিড়বিড় করে বলে, আরে পারস্যোপসাগরে গিয়েই আমাদের জলযাত্রা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপর কোন্‌দিক দিয়ে কোন্ কোন্ শহরের ওপর দিয়ে যাব—কোথায় কতদিন থাকব—সেসব পরামর্শ করতাম যে!

একটা কথাও বলে না ভিখু। সে শুধু দুপুরের খর রোদের তাপে সমুদ্রের ধূ-ধূ নিঃসীম জলরাশির দিকে চোখদুটো ভাসিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু সাগরের সাঁ-সাঁ বাতাসে কানের কাছে বাজতে থাকে কৃষ্ণাবাঈয়ের সেই অন্ধকারে কাতর কান্নার মতো কথাগুলো—তারপর আর কি, মা-র মতো আমারও মহানগরী গৌড়ের সওদাগরী জাহাজের মালিকদের কাছ থেকে ডাক আসতে লাগল। কৃষ্ণাবাঈ নগর-শোভনা, কৃষ্ণাবাঈ সমুদ্রবাণিজ্যের সওদা-গরদের দীর্ঘ জলযাত্রার প্রমোদসঙ্গিনী। ভাবতে না চাইলেও ভিখুর মনের ভেতরে আজন্মের বংশানুক্রমিক সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

আর ঠিক দূরে—বহুদূরের দুর্গন্ধময় গোবরের গাদায় মাছি ভন্ ভন্ করার মতো একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন তার মাথার ভেতরে উঠে আসতে থাকে। হাকিমসাহেব ভিখুর নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে বলে, কি হে ভিখু—তুমি যে একেবারে চুপচাপ!

আলীসাহেব সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ থাকতে পারে হাকিমসাহেব, আমার বিন্দুমাত্র নেই।

আরে হা আল্লা! জিভ কাটল হাকিমসাহেব। ফিস ফিস করে বলল, খবরদার! আর বলো না—যা বলেছো বলেছো। জেনে রাখ ওরই দয়াতে তুমি কাস্পিয়ান-ভল্লার দেশে যাচ্ছো।

আমি ওর মেহেরবাণী চাই নি হাকিমসাহেব, আমি যাই নি বলতে। এই কৃষ্ণাবাঈ যে কেন আমার হয়ে এই বুড়োটাকে বলতে গিয়েছিল তা আমি এখনও জানি না। এই কথাগুলোই চিৎকার করে বলতে চেয়েছিল ভিখু। কিন্তু বলল না। বলতে পারল না। তাকে যে কৃষ্ণাবাঈয়ের অনুরোধেই আরবীয় সোনার বেনেটা অংশীদার করে নিয়েছে—তার চেয়ে নির্মম সত্য আর কি আছে! তাই না-বলতে-পারা কথাগুলো যেন তার শুকনো ঠোঁটের রেখায় রেখায় কেঁপে কেঁপে থেমে গেল আর মাথা নীচু করে চলে যেতে যেতে ভিখু বলল, আমি একটু আসছি—

চম্বন আলীকে পাওয়া গেল।

পাওয়া গেল স্বর্ণমুখীরই বড় মাস্তুলের একেবারে গোড়ার দিকে—যেখান থেকে মাস্তুলটা চলে গেছে খোলের ভেতরে। সেই দিনের বেলাতেই ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার জায়গাটায় ভিখুর মালদহী রেশমের কাপড়ের গাঁটে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে আছে এতবড় একটা নওয়ারার খোদ মালিক গৌড়ের ধনকুবের স্বর্ণশ্রেষ্ঠী চম্বন আলী।

কী ব্যাপার, আপনি এখানে?

আর কি, খুব তাড়াতাড়ি তো অজরঈলের (যমদূতের) দপ্তরে যেতে হবে। কুকুরের কান্নার মতো কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ করে

হেসে উঠল চম্বন আলী। অস্পষ্ট গলায় বলল, তাই কোরানটা উল্টে-পাল্টে একটু দেখছি হাকিমসাহেব।

আশ্চর্য! আপনার হাতে কোরান? আপনি হঠাৎ এসব কি বলছেন আলীসাহেব!

কোন কথা বলল না আলীসাহেব। শুধু পাটাতনের সেই ফিকে অন্ধকারে তার চোখজুটোর কোনায় কোনায় যেন আগুন ঝিকিয়ে উঠল। হাকিমসাহেবের মনে হলো, যেন অন্ধকারের বিবর থেকে একটা আহত জন্তু জ্বলন্ত চোখে তাকাচ্ছে। কিন্তু কি হয়েছে আলীসাহেবের, কি হতে পারে! যেন অনেক—অনেক দূব থেকে বলল আলীসাহেব, চলুন হাকিমসাহেব, নাস্তা করার সময় হয়ে এল—

ভিখু হন্ হন্ করে চলছিল স্বর্ণমুখীতে তাব কক্ষেব দিকে। সমুদ্র তাব কাছে বিস্বাদ মনে হচ্ছিল। ভাল লাগছিল না এই জলেব বুকে ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে জীবনযাত্রায়। একবার ভাবল মৌলিমকে জিজ্ঞাসা করবে, কতদিন কতমাস লাগবে পারস্যে পেঁাছতে। হাকিমসাহেবকে জিজ্ঞাসা কববে পারস্য থেকে কাফেলায় কবে তার সেই সুদূর স্বপ্নের দেশ ভল্গা-কাস্পিয়ানে পেঁাছতে কতদিন লাগবে! তা না হলে যতদিন যতকাল সে এই জাহাজের বুকে থাকবে ততদিন তাকে ওই বুড়ো আলীসাহেবের মুখ দেখতে হবে। দেখতে হবে দিনেব পর দিন একই লোকেব মুখ। তার মনে হলো, সে যেন অনেক—অনেকদিন ধরে একটা নোংবা দুর্গন্ধময় আবর্জনার রাজ্য ধরে চলেছে।

তোমরা কোথায় ছিলে? সামনে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণাবাঈ। সদ্য স্নান করে এসেছে সে। ভিজে অঢেল চুলের গোছা স্তবকে স্তবকে তরঙ্গায়িত হয়ে ভেঙে পড়েছে মাজা পর্যন্ত। প্রতিমার মতো সুডৌল মুখখানা সদ্য ধোয়া অপরাজিতার মতো মনে হচ্ছে। তার স্বাস্থ্যপুষ্ট শরীরের সমুজ্জ্বল যৌবনশ্রীর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে

রইল ভিখু কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলল, কোথায় আবার! তোমার ওই আরব বেনেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল হাকিমসাহেব—আমিও তার সঙ্গে ছিলাম।

কৃষ্ণাবাঈ কোন কথা বলল না। চকিতে তার চোখে অস্বস্তির একটা ছায়া দুলে উঠল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভিখুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল বিগত রাত্রির সেই বীভৎস ঘটনাটা কি ও জানতে পেরেছে! একটু হেসে সহজ গলায় বলল, তা আলীসাহেবকে খুঁজে পেলে তোমরা?

কে জানে, কোলান্দিয়ার বাজারে, মনোজ্ঞিলের নাচের আসরে চুঁড়ে খোঁজা হলো তো! বিরক্তিতে জ্বলে-পুড়ে ভিখু বলল, আবার হাকিমসাহেব যখন আমাদের এই জাহাজে চলে এল, তখন—

তোমার খুব খারাপ লাগছে না এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা?

না-না, তোমাকে তো বলেছি—তুমি বড্ড বেয়াকুফের মতো কাজ করেছো।

কৃষ্ণাবাঈ শিলীভূত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। শুধু তার চোখের কালো তারায় তারায় ঘন বর্ষার মেঘের মতো কি যেন দুলে উঠল।

তার দুটো কালো ডাগর চোখে গভীর স্নেহচ্ছায়া, তার বিষাদ ভরা মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনে হলো—মনে হলো, নস্যু আর তার মা-র মতই একটা কঠিন বন্ধন যেন কৃষ্ণাবাঈয়ের ভেতর থেকে মূর্তি ধরে উঠে এসে চারদিক থেকে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। শুকনো গলায় বলল ভিখু, তুমি তো অনেকবার অনেক সওদাগরদের সঙ্গিনী হয়ে এই পথে গিয়েছো। তুমি বলতে পার কবে আমরা পারস্যে পৌঁছাব? কবে মাটিতে পা দেব আর উটের পিঠে পারসিক বণিকদের সঙ্গে চলে যেতে পারব অনেকদূরের অজানা দেশে? থেমে গেল ভিখু। তার বুকের ভেতরের খাঁচায় বন্দী পাখীটা অবারিত আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার ব্যাকুল প্রত্যাশায় মাথা কুটতে লাগল।

ওমা, আমরা তো সবে দ্রাবিড়দেশের উপকূল ধরে চলেছি এখন, আমাদের সামনে পড়বে ক্যামারা বন্দর, তারপরে গড়ুকা।

তারপরে ?

তারপরে সোপাটমা।

কিন্তু তুমি এই জায়গাটাকে দ্রাবিড়দেশের উপকূল বলছো—আমি যে শুনেছি এটাকে করোমণ্ডল উপকূল—

দ্রাবিড়দেশ মানেই চোল রাজ্য। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা একে বলে চোলমণ্ডলম্। পর্তুগীজরা আবার এই চোলমণ্ডলমকেই বলে করোমণ্ডল।

বল না—বল না, থামলে কেন কৃষ্ণাবাঈ ? উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ভিখু, করোমণ্ডল উপকূল ছাড়িয়ে আমরা কোথায় যাব ?

ওরে বাবা, আরও কত বন্দর কত নগর—যেমন ধর একদিকে সিংহল আর একদিকে পাণ্ড্যেরাজ্যের গা ঘেঁষে পক-প্রণালীর ভেতর দিয়ে মান্নার উপসাগর পেরিয়ে আমরা পড়ব পশ্চিম উপকূলে, মানে আরবসমুদ্রে।

তারপরে ?

এবারে আর কিছু বলল না কৃষ্ণাবাঈ। অজানাকে জানার ব্যাকুল আগ্রহে সন্ধ্যা প্রদীপের মতো উজ্জ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসির আলো ফুটে উঠল তার মুখে। কপট গাম্ভীর্যের গলায় বলল, কি হবে শুনে, তোমার তো আমাদের কাউকে ভালই লাগছে না—ভাল লাগছে না সমুদ্রযাত্রা—

না-না, বলছো কি ? একটু যেন লজ্জার ছায়া পড়ল, সসঙ্কোচে বলল, ওই আরব বেনেটার মুরুব্বিয়ানাটা আমার একেবারে সহ্য হয় না কৃষ্ণাবাঈ। তাছাড়া হাকিমসাহেবকে—তোমাকে—

যাক বাবা, মহাদেবের দয়া! কৃষ্ণাবাঈয়ের কালো চোখের তারা-দুটো যেন ঝিক করে হেসে উঠল। অদূরে চম্বন আলীর কক্ষের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, আজ পূর্ণিমা—জ্যোৎস্না থৈ-থৈ করবে

সমুদ্রে। তুমি ঠিক এইখানে এসে দাঁড়াবে—কেমন ? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। ফিক করে একটু হেসে সমস্ত জায়গাটাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখে চলে গেল কৃষ্ণাবাঈ।

খট্—ভিখুর মনে হলো দূরে আলীসাহেবের কক্ষের পাশ থেকে চোখের পলকে যেন একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

সাগরের বুকে সন্ধ্যা নামছে।

মনে হয় যেন ডানা মেলে নেমে আসছে অতিকায় একটা শকুন। আকাশে একটা-দুটো করে তারা ফুটে উঠছে। আলীসাহেবের কক্ষে সুদৃশ্য দেওয়ালগিরির আলোর নীচে ঝকমক করছে মধ্য-এশিয়ার একটা মানচিত্র আর তার চারদিকে গোল হয়ে বসেছে তারা তিনজন—

আলীসাহেব।

ভিখু।

হাকিমসাহেব।

আমার মনে হয়, এখন থেকেই আমাদের ভেবে রাখা উচিত পারস্যের কোন্ কোন্ শহরে আমরা যাব। হাকিমসাহেব বলল, রাশিয়াতেই বা কোন্ পথ ধরে যাব—

ভিখু স্থির চোখে মধ্য-এশিয়ার অজানা দেশগুলোর ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। আলীসাহেব কোন কথাই বলল না। সে উদাস চোখ দুটো জানালার বাইরে ঝাপসা অন্ধকারে আচ্ছন্ন গর্জিত সমুদ্রের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল। হাকিমসাহেব লক্ষ্য করল, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে আলীসাহেবের। তা নাহলে কেন মাঝে মাঝে অজরঈলের কথা বলে? কেন থেকে থেকে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়? আর সেই সঙ্গে তার চোখে ভেসে উঠল সেই স্বর্ণমুখীর পাটাতনের অন্ধকারে কোরান হাতে নিয়ে বসে থাকার দৃশ্যটাও।

আপনার কি মি-জাজ (স্বাস্থ্য) খারাপ আলীসাহেব?

না, কিছু না হাকিমসাহেব, আপনি ঠিক করুন কোন্ কোন্

শহরে যাবেন—আমি আর কি বলব! একটু থেমে ভিখুর দিকে চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে বলল, আমাদের রেশমের ব্যাপারীর মালদহী রেশম এবং মসলিন ইরানের যেসব জায়গায় বেশি কাটতি হবে সেইসব—

বাঃ। আপনার মালের কথা ভাবছেন না! ভিখু বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করল, আপনার সোনাদানা মণি-মুক্তা আর রকমারি পাথরগুলোকে বাক্সবন্দী করে আবার গৌড়ে নিয়ে আসবেন নাকি?

হুঁ, ঠিকই বলেছে ভিখু ভাই। তাহলে এমন জায়গার বাজারের কথা ভাবতে হবে, যেখানে আমাদের বাংলাদেশের রেশম এবং আলীসাহেবের মালেরও কাটতি আছে।

খুক খুক শব্দ করে হেসে উঠল চম্বন আলী। স্বর্ণমুখীর নীলাভ রঙের কাঠের দেওয়ালে আঁকা নিবিড় ছায়াকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে ছাড়া-ছাড়া গলায় বলল, জানেন হাকিমসাহেব, পার্শীতে সিরাজের একটা বয়েত আছে—

জঁহা বেগস্তম্ উর্দা কে শহরদত্ নাদিজম
কে খোরাসান বখৎ দরবাজার

মানে কি জানেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিলকুল জানি। যে দেশের মাটিতে জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়ে দিলাম আলীসাহেব, সেই উর্ফীর মহাকবি সিরাজের বয়তের অর্থ জানব না! সিরাজ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তামাম দুনিয়ার শহরের বাজারে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। কোথাও এমন বাজার দেখেন নি, যেখানে সৌভাগ্য বিক্রি হয়।

কিন্তু সিরাজ না কে, তার এই বুক-চাপড়ানির সঙ্গে আলীসাহেবের কি যোগ আছে? মুখখানা বিকৃত করে ভিখু বলল, উনি তো পঞ্চ-গৌড়ের বাজারে জমিয়ে বসে নসীব ফিরিয়ে নিয়েছেন।

থাক, থাক ওসব কথা, এখন কাজের কথা হোক। হাকিমসাহেব প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। মানচিত্রে হাত দিয়ে বলে, দেখুন

পারস্যোপসাগরের তীরে বুশায়ার বন্দরে কিংবা বন্দর আব্বাসে জাহাজ নোঙর করে আমরা চলে যেতে পারি ইস্পাহানে।

ইস্পাহানে মালদহী মসলিনের বাজার কি রকম ?

শোন ভিখু, বাজার কি •রকম জানবার আগে জেনে রাখ কোন্ কোন্ পণ্য পাওয়া যায় সেখানে। পারস্যেও কিছু রেশম উৎপন্ন হয়, কিন্তু আমি দেখছি বাংলাদেশের এবং চীনা রেশমের খুব চাহিদা সেখানে।

পারস্যের রেশম নিশ্চয়ই গৌড়ের রেশমের মতো মিহি নয়!

সেটাও একটা কারণ। আরও একটা গুরুতর কারণ আছে। চীন এবং বাংলাদেশের রেশম আরব, সিরিয়া আর পারস্যের বস্ত্রের ব্যাপারীরা কাড়াকাড়ি করে কিনে নেয়। পাইকারী দরে বিক্রি করে দেয় সুচীশিল্পের কারিগরদের কাছে। একটু থামে হাকিমসাহেব। ভিখুর মুগ্ধ চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, বুঝলে ভিখু ভাই, তার পরেই ভুবনবিখ্যাত সেই পারসিক সূচীশিল্পের কারিগরের দল সেই রেশমের কাপড়ের ওপরে আশ্চর্য সুন্দর এক-একটা নকসা তোলে। সেই নকসা করা রেশমের কাপড় আবার তিনগুণ কি চারগুণ দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায় রোমের সওদাগররা।

হা আল্লাহ্, তামাম দুনিয়ার হাট-বাজার একেবারে গুলে খেয়েছেন যে হাকিমসাহেব!

আর কি কি মালের চাহিদা আছে হাকিমসাহেব ?

সুগন্ধী গাঙ্গেয় জটামাংসী, মশলা, মহীশূরের সুগন্ধী চন্দন কাঠ, আবলুশ কাঠ, তামা, সোনা, রুপো, হীরা-জহরৎ, মণি-মুক্তা অর্থাৎ আলীসাহেবের মালেরও চাহিদা সেখানে প্রচুর।*

আমাদের জিনিসের চাহিদা বুঝলাম, কিন্তু আমরা ফেরার সময় কি কি সওদা কিনে নিয়ে আসতে পারি ?

*"Periplus of Erythraean Sea." P. 287

কেন? ম্যাডারাটা (পারসিক নৌকো), মুক্তা, সেরাজী, সোনাদানা আর—

আর কি?

গৌড়ের সুবেদার খান-ই-জাহান হোসেনকুলীর দরবারে, তার হারেমে কাদের ঘুর-ঘুর করতে দেখ?

ও, দাসদাসী!

হ্যাঁ, পারস্যোপসাগর পর্যন্ত যেতে হবে না। তুমি পশ্চিম উপকূলে বারিগাজা বন্দরে গেলেই দেখবে দাসদাসীর কারবারী পারসিক বণিকরা হতভাগাদের নিয়ে 'ম্যাডারাটা' বোঝাই করে পাড়ি দিচ্ছে আমাদের দেশের দিকে।

হঠাৎ ভিখু লক্ষ্য করল হাকিমসাহেবকে একটা কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চম্বন আলী। তারা দু'জনেই একটু বিস্মিত হলো। মনে হলো, ভেতরে ভেতরে কিসের যেন একটা আলোড়ন চলছে তার।

পারস্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মেসেদ থেকে কাফেলায় মরুভূমি অতিক্রম করে ওরা বোখারোয় যাবে কিংবা খুরিদস্থান হয়ে গুর্গাও থেকে অস্ত্রাবাদে যাবে কিনা সেই আলোচনায় সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ যখন ঘন হয়ে উঠছিল, ঠিক তখন জাহাজের খালাসীদের আসরও খুব জমে উঠেছিল।

তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমুদ্র। আকাশে ঝিকমিক করছে রাশি রাশি তারা। ঘন অন্ধকারে সমুদ্রের জল দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় তার তীব্র গর্জন। মনে হয় যেন হাজার হাজার দৈত্য মর্মান্তিক আক্রোশে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে।

তারপর—মৌলিমসাহেব?

জহর কথা বলে না। হালে ঠেস দিয়ে বসে গুড়ুক গুড়ুক শব্দে হুঁকো টানতে থাকে। এক-একটা টানে টিকেগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর সেই গন্‌গনে আগুনের আভায় বহুদর্শী মৌলিমের দাড়ি-

গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখখানা আলোকিত হয়ে ওঠে। খারওয়া, সারেঙ, সুখানজিয়ার, পঞ্জেরীরা তার সেই গম্ভীর আর কঠোর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যায়। তাদের চোখে চোখে থর থর করে কাঁপে আশঙ্কার একটা কালো ছায়া।

সমুদ্দুরের জীনপরীদের গল্প বলতে বলতে কি শেষপর্যন্ত 'তেনারা' কেউ মৌলিমসাহেবের ওপরেই ভর করল! তা নাহলে মৌলিমভাই বোবা হয়ে গেল কেন?

তারপর কি হলো জানিস, সমুদ্দুরের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সেই পরমাসুন্দরী জলকন্যা চলে আসতো ডাঙায়। বালুচর ছাড়িয়ে এসে পড়তো গ্রামে। নিশুতি রাত। গেরস্থরা যে-যার ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। বাইরে আকাশের নীচে তাদের ফসলের ক্ষেতে শবনম ঝরে ঝরে পড়ছে টুপটাপ করে। সমুদ্দুরের জলের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে কত মেহনত করে বেচারীরা কোথাও ধান বুনেছে, কোথাও ফলিয়েছে বাদাম—তাদের সেই খুন জল করা ফসলের ক্ষেতে দিব্যি তার সমুদ্দুরগোরু ছেড়ে দিত জলকন্যা—

সমুদ্দুরগোরু!

চুপ কর শালা, ফের যদি কথার ভেতরে কথা বলবি তাহলে তোর লাশ ফেলে দেব দরিয়ায়।

বলুন—বলুন মৌলিমভাই—আপনি বলুন—ওই বেতমিজ উল্লুক খারওয়াটাকে আমরা থামিয়ে রাখব।

আমি তোদের একবার বলেছিলাম, ডাঙায় যত রকমের জীব আছে, এই মহাসমুদ্দুরের বুকে সেই সব রকম জীব থাকে। তা এই সমুদ্দুরগোরুগুলো দেখতে যেমন বড়-সড়, তেমনি তাগড়া। জলকন্যা তো তার গোরু ছেড়ে দিয়ে মনের সুখে ক্ষেতের ধারে বসে গুন্ গুন্ করে গান গাইছে, ওদিকে মসমস করে তরতাজা ধানের শীষগুলোকে মুচড়ে খেয়ে ফেলতে লাগল গোরুটা। রাত শেষ হয়ে এল। এখুনি পাথারে এসে পড়বে চাষীদের দল। তাই গোরু

নিয়ে আবার সমুদ্দুরে ফিরে এল জলকন্যা। পরদিন সকালে উঠে ক্ষেতের ওই হাল দেখে তো গৃহস্থরা বুক চাপড়াতে লাগল। ঠিক হলো, রাত জেগে ক্ষেত পাহারা দেবে গাঁয়ের জওয়ান মরদরা।

এইবারে বুঝি জলকন্যের দফা রফা—

ফের কথা বলছিস শালা খারওয়া! এইবার একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল খালাসীরা। দাশুর বাবরি কোঁকড়ানো চুলের ধরে ঝাঁকিয়ে তারা মারমুখী হয়ে বলল, শালা, তুই জাহাজের খালাসী হয়ে সমুদ্দুরের জীনপরীদের নিয়ে তামাসা করিস—যা শালা —যা শুয়ারের বাচ্চা—

ওকে ছেড়ে দে। দরিয়ার জলকন্যেদের নিয়ে যে মাঝি মস্করা করে তার মরণ এই জলেই। কেমন দৈববাণীর মতো শোনালো জহুরের ভারী গলার স্বর। অজানিত একটা আশঙ্কায় দুলে উঠল খালাসীদের বুক। যদি জাহাজ-ডুবি হয় তাহলে তো খারওয়ার জান—

তারপরে শোন্, গাঁয়ের জওয়ান মরদরা তো স্পষ্ট দেখল, এই সমুদ্দুরের বুকের ওপর দিয়ে সাদা ধবধবে গোরু নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে এল রূপের ডালি সেই জলপরী। আল্লাহ্ যেন এই আসমানের তারা, সমুদ্রের জলের নীল রঙ, গাছগাছালির সবুজ আভা, ফজিরের শবনম, মোটের ওপর তামাম দুনিয়ার যত ভাল ভাল জিনিস দিয়ে তাকে গড়েছে। জওয়ান ছোঁড়াগুলোর তাকে দেখে মনে হলো খোয়াব দেখছে—মানে একটা স্বপ্নের মূর্তি দেখছে। কিন্তু যেই তাদের বাপ-চাচাদের জমির ধানে মুখ দিল সমুদ্দুরগোরু, অমনি খোয়াব গেল ছুটে। লাঠি নিয়ে রে-রে করে হাঁক পাড়তে পাড়তে ছুটে এল তারা। থেমে গেল বহুদর্শী, সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া মৌলিম জহুর মিঞা। প্রায় নিভু-নিভু-হয়ে-আসা হুঁকোয় জোরে জোরে টান দিতে লাগল সে।

মৌলিমসাহেব এমন মোক্ষম জায়গায় থেমে যায়—খালাসীদের ভেতরে বিরক্তির অস্ফুট গুঞ্জন উঠল। থামলেন কেন মৌলিমভাই?

জলকন্যে আর তার গাইটাকে কি গাঁয়ের জওয়ানরা কয়েদ—

চুপ কর বেয়াকুফ কোথাকার! হুঁকো থেকে মুখ·সরিয়ে আহত সিংহের মতো গর্জে উঠল জহর মিঞা, দরিয়ার জীনপরীকে কয়েদ করতে তামাম দুনিয়ার কেউ কোথাও পেরেছে!

অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য জীনপরীদের উদ্দেশে সেলাম জানিয়ে হাতজোড় করে অস্ফুটস্বরে বলল, এই বদতরিপদের, বেতমীজগুলোকে নিয়ে ঠিক ঠিক দরিয়া পার হতে দিও মা!

কয়েদের কথা বলছিস—গাঁয়ের ছেঁড়াগুলো জলকন্যেকে কয়েদ করতে গিয়ে সারা গাঁয়ের বিপদ ডেকে এনেছিল, বুঝলি! যেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে এসেছিল, অমনি দিনমানের মতো ফুটফুটে জোছনায় ভরা সমুদ্দুরের বুকে মিলিয়ে গিয়েছিল জলকন্যে। তারা কয়েদ করেছিল সমুদ্দুরগাইটাকে—

দুধেল গাই। শালা বাঁটগুলো যেন এক-একটা মর্তমান কলা। দুধের ভারে ফুলে একেবারে টসটস করছে। বাঁটে একটা টোকা দিলেই ফিন্‌কি দিয়ে দুধ পড়বে। আর দুধেরই মতো সাদা ধবধবে ভিজে ভিজে গায়ের রঙ। গায়ে হাত দিলে শালা হাত পিছলে যায়! গাইটাকে পেয়ে গাঁয়ের লোকের কী ফুর্তি! সেটাকে নিয়ে তাদের শলা-পরামর্শ সুরু হয়ে যায়। কেউ বলে–

গাইটা দুধ ছাড়লে ক্যাকারু চাচার ষাঁড়টার কাছে নিয়ে যেতে হবে পাল খাওয়ানোর জন্য—

পয়লা বাচ্চাটা যদি বকনা বিয়োয়, তাহলে কিন্তু আমি নেব ভাই—

এঁড়ে হলে আমি নেব—আমার শালা হালের একটা গোরু সেদিন হুট্‌ করে মরে গেল। থামল মৌলিম জহর মিঞা। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হুঁ-হুঁ বাবা, সমুদ্দুরগোরু নিয়ে ইয়ার্কী! বাপধনরা মজা টের পেল সেই রাত্রে—

এই, আলীসাহেব আসছে! ফিসফিসানির ঝড় বয়ে গেল

খালাসীদের ভেতরে। মৌলিম হালে ঠেস দিয়ে অন্ধকার সমুদ্রে তাকিয়ে রইল। সারেঙ মাস্তুলগুলোর মোটা মোটা রশিগুলোর দড়াদড়ি একটু টেনেটুনে দেখে নিল। ছোটখাটো হালগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সুখানজিয়াররা। কিন্তু খারওয়া দাশু পালগুলো দেখে এসে ফিসফিস করে বলল, শালা বুড়োটার কি হয়েছে ভাই, চুপ করে সমুদ্দ রের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে—

হবে আবার কি? পিচ্ করে থুতু ফেলে চাপা গলায় বলল মৌলিম, জিন্দাটাকে (পতিতা) নিয়ে কতক্ষণে ঘরে খিল দেবে—সেই তক্কে তক্কে আছে!

হুঁ-হুঁ বাবা, সে গুড়ে বালি—সে গুড়ে বালি মৌলিমভাই। ঘুরপাক খেয়ে নেচে নেচে, খুক খুক করে হেসে বলল খারওয়া, দেখ গিয়ে সওদাগরী জাহাজের জিন্দা ভিখুভাইকে নিয়ে ঘরে—হঠাৎ থেমে গিয়ে দাশু জিভ দিয়ে তৃপ্তিসূচক শব্দ করল বলল, আঃ, মজা লুটছে ভিখুভাই!

শালা বুড়োর গায়ে আরবী খুন আছে। শেষ পর্যন্ত জাহাজেই খুনখারাবি কিছু একটা না হয়ে যায়!

যা খুশি হোক, তুমি বল মৌলিমভাই, সমুদ্দ্‌রগাইটাকে আটক করাতে গাঁয়ের লোকের কি দশা হলো?

আবার কি হবে? সেই রাত্রেই সমুদ্দ্‌রে ঝড় উঠল। আর শালা মনে হলো, যেন সারা পিথিমিটাতে পলয়কাণ্ড সুরু হয়ে গেল। সমুদ্দ্‌রের ঢেউগুলো তালগাছের মতো এই উঁচু-উঁচু হয়ে ছুটে আসতে লাগল গাঁয়ের দিকে। প্রত্যেকটা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় কি ছিল জানিস?

কি???

সমুদ্দ্‌রষাঁড়!

হুঁকোটায় শেষ সুখটান দিয়ে মৌলিম বলল, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সমুদ্দ্‌রষাঁড় পাঠিয়ে জলকল্লে সারাটা গাঁ কেন, গোটা

তল্লাটের আরও বহু গাঁ একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। একটু থামল জহর। নাক-মুখ দিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, হুঁ-হুঁ বাবা, সমুদ্দুরের জলকন্যের মার দুনিয়ার বার।

দূরে—বহুদূরে সাগরের কাজলকালো জলরাশি ছাড়িয়ে পুবের আকাশে আলোর আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। দিগন্তের ঘন কালো রেখার ওপরে একটু একটু করে রক্তাভা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মনে হলো দিগন্তপারের কোন দেশে বুঝি আগুন ধরে গিয়েছে।

আজ পূর্ণিমা—চাঁদ উঠছে রে। মৌলিম বলল, দেখবি শালা এবার দরিয়ার জলে রঙের খেলা শুরু হয়ে যাবে।

ক্রমে পুবের আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়ল। গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমুদ্রের কালো ইস্পাত রঙের বিশাল জলরাশির অনেক নীচে লাল আলোর গোলক জ্বলজ্বল করতে লাগল।

সমুদ্দুরের বুকে চাঁদনী রাত খুব খারাপ রে। দূরে, বহুদূরে যেখানে গভীর জলের অতল থেকে একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সেই রক্তাক্ত আলোর বলটা, সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করার মতো করে বলল জহর, দিনমানের মতো চাঁদের আলোয় কিন্তু গাইওয়ালী সমুদ্দুর কন্যেরা আসে না।

জ্যোৎস্না রাত্রে তাহলে আবার কোন্ জলকন্যে আসে?

একটা কথাও বলল না জহর। শুধু আসন্ন একটা সর্বনাশের আশঙ্কায় ভীত চোখে তাকিয়ে রইল সাগরের জলের সেই বর্ণচ্ছটার অপরূপ সমারোহের দিকে। অস্ফুটস্বরে বলল, এইসব চাঁদনী রাত দেখলে তেনাদের খুব ফূর্তি হয়। কখনো কখনো হঠাৎ চোখে পড়ে যায়, দরিয়ার ঢেউয়ের মাথায় চেপে মনের আনন্দে নেচে নেচে বীণা

বাজিয়ে গান গাইছে হাসিন জলকণ্ঠে! একটু থামে বহুদর্শী মৌলিম। তীব্র ভয়ে জ্যোৎস্না-থৈ থৈ সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে বলল, তেনাদের সেই বীণার সুর যে খালাসীর কানে আসবে তার আর রক্ষে নেই।

কি হয়???

মাটিতে তার গোর আর খুঁড়তে হয় না।

দূর দিগন্তের জল তখনো তরল আগুনের মতো জ্বলছে আর জাহাজের ঠিক আশপাশের জলের ওপর আবছায়া অন্ধকারের পর্দা ঝুলছে। সাগরের মাঝখানের জলে কেমন কোমল বিষণ্ণ নীলাভা ছড়িয়ে পড়েছে। এমনি বুকচাপা বিষণ্ণতা আর মনের ভেতরে একটা নিঃশব্দ কান্নার হাহাকার বহন করে জাহাজের এখানে-সেখানে ঘুরছে আরবীয় সওদাগর চম্বন আলী। ঘুরছে একটা ভয়ঙ্কর কুটিল আর ধূর্ত অভিসন্ধির মূর্তির মতো। কোথায় গেল—কোথায় যেতে পারে তারা! কোলান্দিয়ার বাজারের আনাচে-কানাচে, মনোজ্বিলের মাইফেলের আসরের আশেপাশে, মালভর্তি কুঠুরীগুলোর কোণে কোণে পর্যন্ত তল্লাশি করে এসেছে—কোথাও পায় নি তাদের!

পাবে কি করে, জাহাজী জিন্দাটা যদি মক্‌বুল্‌ (সুন্দর) ছোঁড়াটাকে নিয়ে ঘরে খিল দেয়, তাহলে বাইরে তাদের দেখা মিলবে কি করে! তার বুকের ভেতরে তীব্র কামনার অগ্নিগোলক উগ্র ক্ষুধায় জ্বলতে লাগল। মনে হলো জ্বর—সারা শরীরে কম্প দিয়ে যেন জ্বর আসছে আর চেতনার ভেতর থেকে দুর্গন্ধযুক্ত ভলভলে নোংরা কাদার মতো উঠে আসতে লাগল সেই রাত্রির জ্বালাধরা দুঃসহ স্মৃতি। সেইদিন রাত্রে তাকে শক্তহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতরে জাপটে ধরেছিল। বনের ক্ষুধার্ত অজগর যেমন করে একটা আস্ত হরিণকে গ্রাস করে, তেমনি করে সে-ও পারতো অনায়াসেই তাকে

গ্রাস করতে। কিন্তু মাগীটা চিলের মতো চিৎকার করে উঠেছিল। জাহাজ-ভর্তি কুলী-কামিন, খালাসী-ভাণ্ডারী কেরাণীর দল গিজগিজ করছে—তারও পরে ডাকসাইটে পণ্ডিত খানদানী হাকিমসাহেবও আছেন। তাই ইজ্জতের ভয়েই সে পালিয়ে এসেছিল। সে গৌড়ের ধনকুবের সুবর্ণশ্রেষ্ঠী। তার খাসকামরায় আসার জন্য আসমানের পরীর মতো জেনানারা পাগল হয়ে যায় আর এই মাগীটার এত দেমাক যে, তাকে ফিরিয়ে দেয়! তবুও জবরদস্তি করে কামনার জ্বালাটা জুড়িয়ে নিতে পারতো। কিন্তু সে লক্ষ্য করেছিল, জিন্দাটার চোখে দারুণ একটা ঘেন্না। তার একটা ইমান আছে না! তাই শিকার ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল। ওর আঁখের সেই ঘেন্নার দৃষ্টিটাই তাকে যেন অঙ্কুশের খোঁচা মেরে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। সেই থেকে—

সেই থেকে কি যে হয়েছে তার! মনে হয় গৌড়ের আরব-টুলীর সওদাগর মহলে তার খুশনামের কোন অর্থই নেই। তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ তার কাঠের বারকোষ ভর্তি রাশি রাশি হীরা-জহরৎ, মণি-মুক্তা। তার মনে হয় কে যেন তাকে শাহানশা বাদশার সোনার তখৎ-এ-তাউস থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে একটা অন্ধকার খাদের অতলে, আর সেই ঘন অন্ধকারের ভেতরে চারদিকে শুধু অজরঈলের চ্যালাদের মুখ দেখতে পাচ্ছে। সেই কুৎসিত নোংরা ছায়ামূর্তির মতো কালান্তকের দল গুটি-গুটি এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে তার কলিজার ভেতর থেকে প্রাণটা ছিনিয়ে নিতে। না—সে পাগল হয়ে যাবে—তাদের মহল্লার বুড়ো আব্বাস মীর্জার মতো বাদবাকি দিন ক'টা পাগলা গারদেই কাটাতে হবে।

না। কিছুতেই জীবনটাকে এমনি করে সে বরবাদ হতে দেবে না। অনেকবার সে চেষ্টা করেছে। কোরানের একটা বয়েতও সে পড়তে পারে নি। তার মনের কোন কোণে বাসা বাঁধে নি পীর পয়-গম্বরের মতো দেওয়ানা হয়ে যাওয়ার বাসনা। তার রক্তের ভেতরে

কিলবিল করছে ভোগের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা। আজ এই রাত্রেই একটা এস্পার-ওস্পার করতে হবে। হয় জিন্দাটা খুশমনে রাজী হলো তো হলো—গররাজী হলে ওই বেতমিজ মাগীটা আর ওর কাসাঙ্গ (সুন্দর) মরদাটাকে সুদ্ধ তামাম নওয়ারাটাকে ডুবিয়ে দেবে সে। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের মতো জ্বলতে জ্বলতে সে নিঃশব্দ পায়ে ছায়ামূর্তির মতো এল কৃষ্ণাবাঈয়ের সুদৃশ্য কক্ষের সামনে।

সে কী! দুয়ার তো খোলা। ঘরে নেই কৃষ্ণাবাঈ। অস্থিরপায়ে এল ভিখু শেখের কামরায়। তারও দরজাও খোলা। ভিখু নেই ঘরে! তাহলে কি শয়তানদুটো স্বর্ণমুখীর ছাদে গিয়েছে? কিন্তু সেখানে তো হাকিমসাহেব নামাজ পড়ছিলেন একটু আগেও দেখেছে সে!

ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। তাদের ছাদে পাবে না জেনেও এবং যাব না যাব না করেও ওপরে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল চম্বন আলী।

আকাশের মাঝখানে সোনার থালার মতো চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। জ্যোৎস্না থৈ-থৈ করছে সাগরের জলে। বিপুলব্যাপ্ত আকাশ আর দিগন্তবিসারী সমুদ্র জুড়ে সে কী আলোর সমারোহ! দূরে—বহুদূরে কুয়াশা ঘেরা অন্ধকার দিগন্তে চাঁদের আলোপথের ঠিক নীচে সাগরের জল ঝিকমিক করছে আর অনেকদূর আকাশে এক-এক টুক্‌রো ছায়ার মতো ডানা মেলে উড়ছে নিশাচর দু-একটা সাগর-পাখি। যতদূর চোখ যায় শান্ত সমুদ্র জ্যোৎস্নার আলো মেখে এলিয়ে পড়ে রয়েছে বিশাল একটা চাদরের মতো। শুধু হু-হু বাতাসের একটানা মৃদু গর্জন, জাহাজের গায়ে ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দের লেশ নেই। চাঁদের আলো বুকে নিয়ে প্রশান্ত সমুদ্র যেন কোন মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে। চারদিকের এই মায়াময় দিকপ্লাবী শ্বেতচন্দনের মতো জ্যোৎস্নার অবিরল ধারা যেন তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে তার অস্থির চাঞ্চল্য, স্তব্ধ করে দিয়েছে তার মাতাল হাতির মতো এক-একটা ঢেউয়ের সরোষ

গর্জন। রাশি রাশি তারাভরা আকাশের নীচে চারদিকের সুদূর দিকচক্রবালে উধাও-হয়ে-যাওয়া সমুদ্রের বিপুল জলবিস্তারের বিশাল পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো—শুধু ভারত মহাসমুদ্র নয়, আরবসমুদ্র নয়, সারাটা জীবন তামাম তুনিয়ার সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ কেটে কেটে তার সওদার নওয়ারা নিয়ে কত বন্দরে, কত নগরে, জনপদে ঘুরে বেরিয়েছে। সমুদ্রের বুকে কত রাত কেটেছে, কত দিন কেটেছে, কেটে গেছে কত মাস—কত বছর! কৈ, কোনদিন কোন সাগরের বুকে এমন জ্যোৎস্না তো কখনো দেখে নি!

বিক্ষুব্ধ আর প্রতিহিংসায় জর্জর মনটা একটু একটু করে শান্ত হয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল স্বর্ণমুখীর ছাদের শেষপ্রান্তে ঘনিষ্ঠ তুটো ছায়ামূর্তি। তারা পরস্পরের নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘনীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিনমানের মতো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ নিঃসীম সমুদ্রের দিকে তাদের দৃষ্টি। তরুণ দেবদারুর মতো দীর্ঘ বলিষ্ঠ সেই অপরূপ সুন্দর যুবকের প্রশস্ত বুকের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে যেন শান্ত নরম আর ভিজে ভিজে এই জ্যোৎস্নারই একটি রেখার মতো সেই অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীটি। তার মনে হলো, ওরা যেন খুদাতালার সৃষ্টি এই তুনিয়ার আদিমতম মানব-মানবী—আরও মনে হলো, ওদের জন্মই সৃষ্টি হয়েছে দিকে দিকে চাঁদের আলোর এই সমারোহ, ওদের জন্যেই আকাশ বাতাস আর সমুদ্র তাদের নিরবচ্ছিন্ন চাঞ্চল্য ভুলে গিয়ে মধুর একটা অনুভবের সুখে যেন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই মুহূর্তে—ঠিক সেই মুহূর্তে সাংঘাতিক একটা বিপর্যয় ঘটে গেল তার ভেতরে। সোনাদানা মণিমুক্তা আর কামনা-বাসনার কংক্রীটে বাঁধানো তার শক্ত মনটা অকস্মাৎ ফেটে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল। নিশিরাতের সমুদ্রের শাঁ শাঁ বাতাস তার কানের কাছে অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলতে লাগল, বল চম্বন আলী অলহমত্নলিল্লা—বল বারে বারে বল অলহমত্নলিল্লা (খুদাকে

ধন্যবাদ)। বাতাস বলতে লাগল, তুমি যে বার্ধক্যের প্রান্তে এসেও খুদাতালার মহিমা দেখতে পেয়েছো। অনুভব করতে পেরেছো অর্থসম্পদ, বিপুল ঐশ্বর্যের বৈভবই শেষ কথা নয়, সৃষ্টির আদিকাল থেকে যুগ-যুগান্তের নরনারীর প্রেমের নিরবচ্ছিন্ন ধারার একটুকরো ভগ্নাংশের মতই এই ছুটো যুবক-যুবতীর অনবিল প্রেম পাথিব কোন ঐশ্বর্যের মূল্যেই কেনা যায় না—এইসব সুস্থ মানবিক আর মহৎ অনুভূতিগুলোর জন্যই বারে বারে বল অলহম্‌তুলিল্লা—অলহম্‌তুলিল্লা। তীব্র একটা আবেগে তার গলার কাছে কেমন ব্যথা করতে লাগল। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার।

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আমি জানি—আমি একটা বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই নই। ভিখুর বুকে মাথা রেখে ভার-ভার গলায় বলে কৃষ্ণাবাঈ, গৌড়ের লোকে আমাকে বলে 'সওদাগরী জাহাজের বেশ্যা', কিন্তু তাই বলে কি আমি মানুষ নই, আমার মন নেই?

কী যে আবোল-তাবোল বকবক করছো, কিছুই মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছি না ছাই!

ভিখুর রাগ-রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে তার কালো ডাগর চোখ ছুটোয় কেমন একটা নেশা মাখানো আবেশ থমথম করে। বলে, তুমি কখনো আমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছো, যে পারবে?

আচ্ছা, এসব ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কথাবার্তার অর্থ কি তুমিই বল তো? খাঁচায় বন্দী হওয়া পাখির মতো ছটফট করে বলল ভিখু, তুমি নিজেই বলছো, সওদাগরী জাহাজের বেশ্যা তুমি—তাহলে ধনকুমার, হোসেনচাচা, গৌড়ের সব ডাকসাইটে সওদাগরদের নাম শুনলে তোমার গায়ে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগে কেন? একটু থেমে মেঘে ঢাকা চাঁদের মেটে মেটে আলোয় রহস্যময় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে

আস্তে আস্তে বলল, এখানেও দেখছি চম্বন আলীকে দেখে তুমি পালিয়ে বেড়াও—

তুমি জান না গো—ওরা ব্যবসায়ী। ওরা হিসেবের কড়ি কড়ায়-কণ্ডায় আদায় করে নেয় আমার কাছে। কেউ কেউ আবার যা দেয় তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি ছিনিয়ে নেয়। তারা এক-একজন শকুনের মতো আমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। 'ইশকী' 'মহব্বত' এসব কথা তারা কখনো শুনেছে বলে মনেও হয় না। শুধু মাংসলোলুপ হিংস্র পশুর মতো খিদে পেলেই তারা কাছে আসবে আর পেট ভরে খেয়ে পরম তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে চলে যাবে। যাওয়ার সময় কেউ একটা গজমোতির কণ্ঠহার, কি প্রবাল বলয়ের অলঙ্কার ছুঁড়ে দেয়, কেউ কিছুই দেয় না। আবার কেউ 'সেরাজী' খেয়ে পৈশাচিক উল্লাসে তার ওপরে বীভৎস অত্যাচার করে, হো-হো করে হাসে—এই কথাগুলোই সে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়ে হয়ে এসব কথা কি বুঝিয়ে বলা যায়, না তাই সম্ভব? শুধু ভেতরের তীব্র অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় তার মুখখানা এঁকে-বেঁকে দুমড়ে কেমন কুৎসিত হয়ে উঠল আর চোখদুটো ভরে জল এসে পড়ল।

আরে আশ্চর্য তো, তুমি কাঁদছো!

একটা কথাও বলল না কৃষ্ণাবাঈ। শুধু তার জলভরা চোখের গভীর অনুরাগের দৃষ্টিটা ভিখুর চওড়া বুকে খেলা করতে লাগল। সেই গভীর মমতায় ভরা টলমলে চোখদুটো যেন নীরব ভাষায় বলতে লাগল, তুমি জান—তুমিই আমার পয়লা মহব্বত, তুমি আমার স্বপ্ন, আমার যা আছে সব—সব তোমাকে উজাড় করে দিয়েও আমার কখনো আশ মিটবে না।

দেখ দিকি, হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছো?

যে মুহূর্তে ভিখুর দরজার কবাটের মতো চওড়া বুকে একবার—অন্তত একবার নদী হয়ে মিশে যাওয়ার উদ্দাম বাসনাটা তার রক্তের ভেতরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে গেল কাণ্ডটা।

হঠাৎ কৃষ্ণাবাঈ ধূ-ধূ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে কি যেন শুনল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই বদ্ধ একটা উন্মাদিনীর মতো ভিখুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কানদুটো দুই হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। ভয়ার্ত গলায় চীৎকার করে বলল, চল-চল, শীগ্‌গীর ঘরে চল -বলেই হিড় হিড় করে টানতে টানতে তাকে তার ঘরে নিয়ে এসে সশব্দে খিল লাগিয়ে দিল। কিন্তু—কিন্তু তবুও যেন নিশ্চিন্ত হতে পারল না কৃষ্ণাবাঈ। ভয়ে উত্তেজনায়, প্রিয়জনের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় কি করবে—কি করলে ভাল হয় ঠিক করতে না পেরে ভিখুকে জোর করে তার পালঙ্কে শুইয়ে দিল। দারুণ উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, খবরদার, একটা কথাও বলবে না। লক্ষ্মীটি, পায়ে পড়ি তোমার—চুপটি করে শুয়ে থাক। বলেই তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভিখুর কানদুটো চেপে ধরল। তার কান থেকে কৃষ্ণাবাঈয়ের হাতদুটো ছাড়ানোর চেষ্টা করে হতভম্ব ভিখু বলল, ব্যাপাবটা কি হয়েছে বলবে তো ?

খবরদার, করছো কি বল তো—কান থেকে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা কর না। যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠল কৃষ্ণাবাঈ। তার বুকে সমস্ত দেহটা ঢেলে দিয়ে দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বলল, তুমি কোন গানের সুর শুনতে পাও নি ?

না। কিসের গান ? কার গান ?

জ্যোৎস্নাভরা সমুদ্রে জলপরী বাজনা বাজিয়ে গান করছিল যে! ওই গানের সুর যে শুনতে পায় তার আর রক্ষে থাকে না গো। বলেই ভিখুর মুখের ওপরে তার মুখখানা চেপে ধরে সাফল্যের আনন্দে উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে খুব চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, ভাগ্যিস, তোমাকে ঠিক সময়ে টেনে ঘরে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম !

ধ্যাৎ, যত সব বাজে কথা। ছেড়ে দাও তো—তুমি করছো কি বল তো ! কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে—

সর্বনাশ ! বলছো কি তুমি ! কৃষ্ণাবাঈয়ের বুকের ভেতর থেকে

তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এল। অতি অবাধ্য ছেলেকে যেমন তার মা আদর করে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে, ঠিক তেমনি ভিখুকে তার দেহের ভেতরে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল কৃষ্ণাবাঈ, আর তার গালে, ঠোঁটে, কপালে চুম্ খেতে খেতে বলল, যা বলেছো—বলেছো, আর কখনো বল না গো। সুবর্ণদ্বীপ থেকে হোসেনচাচার সঙ্গে ফেরার সময় নিজে দেখেছি, জলকন্যের গানের সুর এক ছোকরা নাবিককে নিশিডাকের মতো ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিল।

আর কোন কথা বলল না ভিখু। বলতে পারল না। বলার ক্ষমতাও ছিল না। কৃষ্ণাবাঈয়ের উগ্র যৌবনপুষ্ট দেহের কবোষ্ণ সান্নিধ্যে তার চেতনা ক্রমশ অবশ হয়ে আসছিল। মাতাল হয়ে উঠছিল তার স্নায়ুগুলো। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিল অনেক—অনেক দূর থেকে শোঁ শোঁ শব্দে যেন একটা ঝড় ছুটে আসছে; এখুনি তার বক্তের ভেতরে আছড়ে পড়বে সেই ঝড়। চকিতে তার চোখের সামনে নসীবনের, জুলিয়াবিবির মুখের ছবি ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। তাদের নিবিড় প্রীতির কঠিন বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে অবারিত আকাশে ডানা মেলে উড়তে পেরেছিল। কিন্তু এবার—এবার সে আর পারল না। একটা অতল কালো স্রোতেব ভেতরে যেন একটু একটু করে ডুবে যেতে লাগল। আর বাইরে—

বাইরে তখন বিপুলব্যাপ্ত আকাশের নীচে চাঁদের আলোয় ভরা শান্ত সমুদ্র যেন মধুর এক সুখস্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে রইল।

॥ পনের ॥

দিন কাটে। মাস যায়।

চন্দন আলী আর ভিখু শেখের নওয়ারা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসে পড়ল আরবসমুদ্রে।

বুঝলে ভিখু ভাই, এই হলো গিয়ে আমি যে মাটিতে পয়দা হয়েছিলাম, সেই দেশের সমুদ্র। চন্দন আলী শান্ত আর স্নিগ্ধ চোখে ভিখুর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, সেই কত কাল আগে দেশ ছেড়েছি—এখনও যেন আঁখের সামনে ভাসে আখদার পাহাড়, নেজেদের ধূ-ধূ মরুভূমি, তার মাঝে মাঝে শুকনো নদীর রেখা, তাকে আমরা বলি 'ওয়াদি'।

কতকাল আগে দেশ ছেড়েছিলেন আলীসাহেব?

বাপজানের সঙ্গে খুব ছেলেবেলায় গাঁও ছেড়ে গৌড়ে গিয়েছিলাম। দেশ-গাঁওয়ের কথা ভাল করে মনেও করতে পারি না ভিখুভাই। কোথায় মক্কা, কতদূরে মদিনা আর জেদ্দা, আমিও ভিন্‌দেশীদের মতো শুধু নামগুলো শুনি। একটু থামে। কেন যেন বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আবার নিভু-নিভু গলায় বলে, কতদিন ভেবেছি একবার অন্তত দেশে যাব, তা আর হয়ে উঠল না—

আপনি তো এইবারই দেশে যেতে পারেন আলীসাহেব। হাকিম-সাহেব একটু হেসে বলল, নওয়ারা বুশায়ারে নোঙর না করে পারস্য উপসাগরেরই আর একদিকে ওমানে—

আরে না-না, বলছেন কি হাকিমসাহেব, ভিখুভাই যাবে রুশ মুল্লুকে। আমি তাকে, কৃষ্ণাবাঈকে আমার জবান দিয়েছি যে—

হাকিমসাহেব আর একটাও কথা বলল না। তার মনে হলো,

ধনকুবের চম্বন আলী আর আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থসর্বস্ব চম্বন আলী যেন এক নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে। ভিখুরও চেতনার ভেতরে অস্বস্তির একটা কুয়াশা যেন একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নিশ্চয়ই শয়তানটা সেই রাত্রির ঘটনা সব জানতে পেরেছে। তাই ভেতরে ভেতরে তারই কোন চরম সর্বনাশের চক্রান্ত করছে বলেই বাইরে সাধুসন্ত সাজছে!

আপনারা সুহবত্ দস্তান (কথাবার্তা) করতে থাকুন হাকিমসাহেব, আমি একবার নওয়ারার খালাসীদের একটু তদারকি করে আসি। একটু থেমে নির্বাক এবং চিন্তিত হাকিমসাহেব ও ভিখুর দিকে তাকিয়ে বলল, ওদের নাকি কাল রাত্রে খানার কি গোলমাল হয়েছিল হাকিমসাহেব—ওরা মেহনতী মানুষ, ওদের খাওয়ায় কষ্ট হয়েছে শুনলে খুব কষ্ট হয়।

কি ব্যাপার শেখের পো? স্বর্ণমুখীর অলিন্দে ভিখুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলো কৃষ্ণাবাঈয়ের। একটু হেসে বলল, ক'দিন থেকে দেখছি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো?

কৃষ্ণাবাঈয়ের হাসি-হাসি মুখখানার দিকে তাকাতে পারল না ভিখু। লজ্জার ছায়া পড়ল তার মুখে। তীব্র একটা সঙ্কোচের ভারে আড়ষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। ধীরপায়ে কাছে এল কৃষ্ণাবাঈ। ভিখুর হাতদুটো ধরে খুব সহজ গলায় বলল, কি হয়েছে তোমার বল তো—মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

তবুও একটা কথাও বলতে পারল না ভিখু। তার গলার ভেতরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। সেই দারুণ অস্বস্তিকর পরিবেশটাকে আবার সহজ করার চেষ্টা করে অন্য প্রসঙ্গ তুলল কৃষ্ণাবাঈ, আলীসাহেবকে লক্ষ্য করেছো—কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে মানুষটার!

আবার পাথুরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে-থাকা ভিখুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, জান, সেদিন দেখি কি, খালাসীদের সঙ্গে একসঙ্গে খানা খেতে বসেছে।

তাই নাকি! আলীসাহেবের প্রসঙ্গে ভিখুর আড়ষ্টতা যেন কাটল। মুখখানা ঘৃণায় বিকৃত করে বলল, শালা বুড়োর সব

না-না, ওকথা বল না। হঠাৎ চুপ করে গেল কৃষ্ণাবাঈ। সেই রাত্রে আলীসাহেবের তীব্র লালসালোলুপ বীভৎস আচরণের ভয়ঙ্কর দুঃস্মৃতিটা তার মনের ভেতরে যেন মৃত মানুষের মতো প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ক্ষীণ গলায় বলল, মানুষের মনের পরিবর্তনও তো হয়!

কী জানি বাবা, তোমার ওসব খানদানী সওদাগরের সঙ্গে ওঠা-বসা অনেকদিনেব, তুমিই ভাল জানবে।

ভিখুর কথাটা তীরেব মতো বিঁধে গেল তার বুকে। মনে হলো—মনে হলো তার সারা দেহের রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে। আর একটা কথাও বলল না সে। মুখ ফিরিয়ে ঝড়ের বেগে তার ঘরের দিকে চলে আসতেই পিছন থেকে ছুটে এসে খপ্ করে তার হাতদুটো ধরে ফেলল ভিখু। নরম গলায় বলল, তুমি রাগ করেছো কৃষ্ণাবাঈ?

বুকের ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে ওঠা উদ্ধত কান্নাকে চেপে নীচেব ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরল কৃষ্ণাবাঈ আর চাপা বিষাক্ত গলায় বলল, তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও। বলেই ভিখুর হাতের ভেতর থেকে নিজের হাতদুটো ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে যেতে কান্নায় ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি তোমার কাছে সওদাগরী জাহাজের একটা বেশ্যা ছাড়া আর কিছু না—

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভিখু।

রুশ-মুলুকগামী পঞ্চগৌড়ের ভুবনবিখ্যাত রেশম ও মসলিনের

সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভারের পণ্যবাহী নওয়ারা আরবসাগরের উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে চলল পারস্যোপসাগরের দিকে। তারা ছাড়িয়ে গেল মালাবার কঙ্কণ উপকূলের মিউজিরি বন্দর, ছাড়িয়ে গেল নেলচিন্দা, বাকারে, আরও অনেক ছোটখাটো বন্দর। কোথাও থামল, কোথাও থামল না। সমুদ্র জুড়ে আরবিক সওদাগরদের পণ্যবাহী রাশি রাশি জাহাজের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে হাকিমসাহেব বলল, আরবীয় এই জাহাজগুলোকে কি বলে জান ভিখু?

না, আমি কি করে জানব বলুন হাকিমসাহেব? আস্তে আস্তে বলল ভিখু, জীবনে এই প্রথম কালাপানিতে এসেছি—যা দেখছি—তাই তো অদ্ভুত লাগছে।

দেখেছো, জাহাজগুলো সামনের দিকটা সরু আর কেমন সূচালো! আরবীয়রা এই জাহাজগুলোকে বলে 'ধাও'।

নিশ্চয়ই এগুলো খুব তাড়াতাড়ি বাতাস আব জল কাটতে পারে?

হ্যাঁ। প্রয়োজন হলে আবার জলদস্যুদের পানসী কি জাহাজগুলো ঢুঁ মেরে ভেঙে ফেলতেও পারে।

আচ্ছা, ওদের প্রত্যেক ধাওতেই দেখছি পাহাড়-প্রমাণ উঁচু করে রেখেছে মাল; ওগুলো কি জিনিস?

যারা আমাদের দেশের দিকে আসছে সেইসব জাহাজে আছে 'মার' নামে খুব সুগন্ধী নির্যাস (এক ধরনের গাছ থেকে পাওয়া যায়), খেজুর, প্রবাল, তামা, টিন, শীসা, সেরাজী আর—

আর?

আর ওই যে ধাওগুলোতে দেখছো মালমাত্রা কিছু নেই, শুধু গাদা গাদা ছেলেছোকরা মেয়েপুরুষ দেখা যাচ্ছে—ওরা ক্রীতদাস। আরবিক সওদাগরদের সবচেয়ে লাভের মাল। অল্পবয়সী ছেলেগুলো হলো গাইয়ে ছেলে। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজার দরবারে ওদের খুব চাহিদা।

আর যে ধাওগুলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আরবের দিকে যাচ্ছে সেগুলোতে কি মাল আছে?

তোমার নওয়ারায় যা আছে—রেশম, মসলিন, কাঁচা তুলোর পেটী, গাঙ্গেয় জটামাংসী, তাছাড়া দক্ষিণ উপকূল থেকে নিয়েছে রাশি রাশি স্বচ্ছ পাথর—যার নাম স্যাফারিস, পশ্চিম উপকূল থেকে নিয়েছে আদা, তেজপাতা, দারুচিনি আরও নানারকমের সুগন্ধী মশলা। আবার কোন ধাওয়ের পাটাতন-ভর্তি শুধু কচ্ছপের খোল।

কচ্ছপের খোল? ওগুলো দিয়ে আবার কি হয়?

বল কি, রোমের সওদাগরের কাছে খুব চড়া দামে বিক্রি করে ওগুলো।

রোমের সওদাগররা কচ্ছপের শুকনো হাড়ের খোল দিয়ে কি করে?

কি করে? শুনলে অবাক হয়ে যাবে ভিখুভাই। রোমের শিল্পীরা নিপুণ হাতে এই খোলে রঙ করে তুলি দিয়ে নানারকমের কারুকার্য ফুটিয়ে তোলে। তারপর রোমের বিলাসী ধনী অধিবাসীরা লোফালুফি করে তাদের ঘর সাজায়।

আচ্ছা হাকিমসাহেব, ধাও ছাড়াও অন্য এক ধরনের বাণিজ্য-তরীও দেখছি—তাতেও তো কম মালমাত্রা আর দাসদাসীর ভিড় দেখছি না!

ওই জাহাজগুলোর খালাসীদের কেমন লাল-লাল চেহারা দেখছো না, ওরা রোমের লোক। ওগুলোই তো রোমের সওদাগরী জাহাজ। একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল হাকিমসাহেব, হাজার হাজার বছর আগে থেকে আমাদের দেশের পণ্য আরব-সওদাগররাই চালান দিত। কিন্তু রোমের সম্রাট ক্লডিয়াসের উৎসাহে ভারতে আসার সমুদ্রপথ যেই খোলা হলো, তখন থেকেই রোমের সওদাগররা নিজেরাই আসতে লাগল। আর আসবে না কেন বল ভিখুভাই, আমাদের দেশের এক বাক্স (শ্বেত-পাথর জাতীয় এক রকম পাথরে

তৈরি একটা কাসকেট, যাকে বলা হতো অ্যালাবেস্টার) সুগন্ধী জটামাংসীর দাম ছিল কত জান?

কত হাকিমসাহেব?

তিনশো দিনার! মানে ধর তোমার তিনশো স্বর্ণমুদ্রাই* হলো। উদ্দীপ্ত হয়ে হাকিমসাহেব বলে চলল, জটামাংসী, সুগন্ধী ধূপ, আতর, অগুরু রোমের সুন্দরী বিলাসীদের জন্যে এসব প্রসাধন-সামগ্রী বিক্রি করে দক্ষিণ-ভারত অর্থাৎ চোলমণ্ডলমের দেশগুলো অঢেল স্বর্ণমুদ্রা রোজগার করে।

থামল হাকিমসাহেব।

ভিখু তার দিকে গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বিড়বিড় করে বলল, একটা জীবনে এত জানলেন কি করে হাকিমসাহেব? রুশ দেশের বাণিজ্যের কথা, কোথায় রুশ-সওদাগররা চীনা তিব্বতী হাকিমের কাছে থেকে কি গাছ-গাছড়ার ওষুধ কিনছে যেমন জানেন—তেমনি জানেন আবার ইরান রোমের বাণিজ্যের কথা।

কোন কথা বলল না হাকিমসাহেব। কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া ভেসে উঠল তার মুখে। ভিখুর মনে হলো, যেন সাবেক দিনের কোন স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল হাকিমসাহেব। দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বলল, মোগল, পাঠান, আফগান, আরবীয়, পারসিক, রুশীয়, চীনা, তিব্বতী সারা এশিয়ার এমন কোন সওদাগর নেই—যাদের সঙ্গে আমি রাত কাটাই নি ভিখু।

আপনি হাকিমী ছাড়া কোন সময় ব্যবসাও করেছেন নাকি হাকিমসাহেব?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল হাকিমসাহেব। অস্ফুট গলায় বলল, কি করেছি—কি করি নি—সেসব আর জানতে চেও না ভিখু। আর একটিও কথা না বলে মাথা নীচু করে চলে গেল।

* "Periplus of the Erythraean Sea". P. 189.

কোলান্দিয়ার টুকিটাকি জিনিসের বাজার, মনোজিলের নাচের আসর, আমোদ-প্রমোদের যাবতীয় আয়োজন আরোহীদের কাছে বিস্বাদ বিবর্ণ হচ্ছে। তারা মাটিতে পা দেওয়ার ব্যাকুল প্রত্যাশায় অস্থির হয়ে ওঠে। ধোঁয়াটে আকাশের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, বুঝলি রে খারওয়া—করোমণ্ডল থেকে মালাবার কঙ্কণ উপকূল পর্যন্ত সমুদ্দুরে কোন ভয় নেই। ভয় এই আলীসাহেবের সমুদ্দুরকে—বড় রাক্ষুসে সমুদ্দুর রে—

সুখানজিয়ার॥ আমরা, হাল-দাঁড় সব দেখে নিয়েছি মৌলিম-ভাই।

পঞ্জেরী॥ মাস্তুলের ওপরে উঠে যত দূর চোখ যায় দেখেছি, মেঘ-টেঘ কিছু নেই—

গুমটি॥ আমরা খোলের ভেতরে যেটুকু জল জমেছিল তা ছেঁচে ফেলেছি।

মৌলিম কথা বলে না। পশ্চিম উপকূলের এই সমুদ্র সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতায় হাসে। বলে, আরে শালারা, তোরা হলি গিয়ে কেমন জানিস, সেই যে কথায় বলে না, হাতি-ঘোড়া হলো তল, মশা বলে কত জল!

মানে?

মানে শালা তোদের মাথা আর মুণ্ডু। আরে বাপুরে, খুদাতালার মার দুনিয়ার বার। একটু থেমে তাদের ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল মৌলিম, আরে গোরু, তোরা খোলের জল ছেঁচে, মাস্তুলের ওপরে উঠে, আকাশের মেঘ দেখে কি পশ্চিমে রাক্ষুসে হাওয়াকে আটকাতে পারবি? তীব্র বিরক্তিতে পিচ্ করে একদলা থুতু ফেলল জহর। আবার বলল, জাহাজের খালাসী-গিরি করতে এসেছিস ব্যাটারা, কিছু জানিস না। হেঁকে বলল, এই খারওয়া, তামাক সাজ না রে শালা ব্যাটা, শুধু বসে বসে গল্প গিলবে—

সাঁ-সাঁ করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস বয়ে চলেছে। ফুঁসে ফুঁসে উঠছে আরবসাগরের জল। মত্ত আক্রোশে ছলাৎ-ছলাৎ করে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। গুড়ুক-গুড়ুক করে তামাক টানতে টানতে বলল, শুনছিস, শালা কী রকম ফুঁসছে! কেন এ রকম হয় জানিস? সারাটা দিন রোদ্দুর পেয়ে পেয়ে তেতে ওঠে ডাঙার মাটি। আর হাওয়া গরম হয়ে যেই ওপরে উঠে যায়, অমনি তাদের ফাঁকা জায়গায় ছুটে যায় সমুদ্দুরের এই ঠাণ্ডা হাওয়া, ধাক্কা লাগে পাহাড়ে। অমনি শুরু হয়ে যায় ঝড়ের মাতামাতি।

আল্লা—হ্-- আকবর— র—র—

আল্লা—হ্ র-- সু— ল— সান্ধ্য আজানের সমধুর করুণ ধ্বনি হু-হু সাগরের বাতাসের সওয়ার হয়ে চলে গেল দূরে—বহুদূরে। পঞ্চ-গৌড়ের নওয়ারার আরোহীদের চোখে চোখে একটা প্রশ্ন নীরবে ঘুরতে লাগল—কী হলো, গৌড়ের সুবর্ণশ্রেষ্ঠী ধনকুবের নিজে আজান দিচ্ছে! তাহলে কি বার্ধক্যের প্রান্তে এসে ধর্মে মতি হয়েছে? যে মানুষটা সুগন্ধী সেরাজী আর বসোরার গোলাপের মতো সুন্দরী এক-একটা নারী নিয়ে প্রমত্ত জীবনটা কাটিয়েছে, কেন সে হঠাৎ স্বর্ণখচিত বহুমূল্য রাজবেশ খুলে ফেলে দরবেশ দেওয়ানা হয়ে গেল? এসব কথা ভাবতে ভাবতে ধীরপায়ে স্বর্ণমুখীর ছাদে উঠে এল হাকিমসাহেব।

না। আলীসাহেব দেওয়ানা হয় নি। পোশাক-আসাক—এমন কি চোখের নীচে সুর্মার রেখা, কানের পিঠে আতর ভেজানো তুলোটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে। শুধু শেষ সূর্যাস্তের রঙীন আভায় তার পৌরুষ-ব্যঞ্জক প্রদীপ্ত মূর্তিটাকে পীর-পয়গম্বরের মূর্তির মতই কেমন সুদূর আর পবিত্র মনে হচ্ছে।

আজানধ্বনি শেষ হলো। শেষ হলো নামাজ পড়া।

প্রতীক্ষারত নিস্তব্ধ হাকিমসাহেবকে বলল, আজানধ্বনি দিয়ে নামাজ পড়লে নিজেকে কেমন মহম্মদ রসুলের দূত বলে মনে হয় হাকিমসাহেব।

আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমরা নওয়ারা সুদ্ধু লোক অবাক হচ্ছি!

তার কথা যেন শুনতেই পেল না চম্বন আলী। চোখদুটোকে সরু—খুব সরু করে সন্ধ্যার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু যা দেখতে চেষ্টা করল, তা পেল না বলে আবার গোঁড়ালী দুটো উঁচু করে আর দুই হাতের করতল দিয়ে চোখদুটোকে আড়াল করে ডাইনে-বাঁয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে কি যেন খুঁজতে লাগল আকাশে।

দেখছেন কি আলীসাহেব, ঝড়ো মেঘ?

না। ঈদের চাঁদ।

নওয়ারার দিকে দিকে গুঞ্জন উঠল, আলীসাহেব রোজা করছে রে—আলীসাহেব রোজা করছে! দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন সমুদ্রযাত্রার সেই ক্লান্তিকর দিন যাপনের মাঝখানে এই খবরটা যেন বহুদূরের মাটির পৃথিবীর শান্ত স্নিগ্ধ স্বাভাবিক জীবনধারার আভাস বহন করে নিয়ে এল। আরোহী বেশিরভাগই মুসলমান। তারা নিয়মিত নামাজ পড়ে। কিন্তু জাহাজের এই একটানা দোলুনি, হাড়ভাঙা খাটুনী আর জলের বুকে অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার ভেতরে রোজার সেই উষাকাল থেকে সান্ধ্য-নামাজের সময় পর্যন্ত প্রায় বারো ঘণ্টা টানা নির্জলা উপবাস তারা কল্পনা করতে পারে না।

দূর পৃথিবীর বুক থেকে ছিটকে পড়া বিশাল সাগরের জলে ভাসমান সেই মানুষগুলোর ভেতরে আরও একটা গুজব রটে গেল। চম্বন আলী নাকি এবার খুব জাঁক করে তার নওয়ারার বুকেই রমজানের উৎসব করবে।

এসব খবর ভিখুরও কানে আসে। কানে আসে কৃষ্ণাবাঈয়েরও। কৃষ্ণাবাঈয়ের সেই তীব্র ভর্ৎসনার পরে আলীসাহেবের সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব থাকলেও মুখে কিন্তু আর ভণ্ড কি বুজরুক বলে না। কৃষ্ণাবাঈয়ের চোখে নামে চিন্তার কালো ছায়া। এ যে তুলসী-দাসজীর মতো কাণ্ড রে বাবা! স্ত্রীর প্রেমে উন্মত্ত, কামুক তুলসীদাস পত্নীর অদর্শন সহ্য করতে না পেরে তার পিত্রালয়ে যেয়ে হাজির হয়েছিল। সেই সময় স্ত্রীর চরম ধিক্কারের আঘাতেই তুলসীদাসজীর কামনার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মনে ঈশ্বর প্রেমের প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। হঠাৎ চম্বন আলীর জন্য গভীর মমতা অনুভব করল আর বুকের ভেতর থেকে একটা তীব্র ব্যথা পাক খেয়ে উঠতে লাগল তার গলার কাছে।

আর হাকিমসাহেবের!

হাকিমসাহেবের রীতিমত ভয় করতে লাগল। এই বয়সে দীর্ঘ জলযাত্রার অনিয়মে অত্যাচারে যখন শীর্ণ হয়েছে তার শরীর, বায়ু যখন কুপিত হয়ে আছে, তখন কি আলীসাহেব বারো ঘণ্টা উপবাসের ধকল সহ্য করতে পারবে?

রমজানের বিপজ্জনক উপবাস থেকে তাকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করতে ভিখু এল না। এল না কৃষ্ণাবাঈ। কিন্তু এল হাকিমসাহেব। হাতদুটো ধরে অনেক অনুনয়-বিনয় করল। করল কাতর অনুরোধ। কিন্তু—

কোন ফল হলো না। আলীসাহেবের ধনুকভাঙা পণ। সে এবার রোজা করবে। রমজানের উৎসব করবে ধুম করে। রোজার একমাস শান্ত শুদ্ধ পবিত্র জীবন যাপন করবে। হাকিমসাহেবের মনে হলো—মনে হলো আলীসাহেব যেন তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মলিনতা-গুলোকে পবিত্র রমজানের কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার কঠিন শিলাপটে আছড়ে আছড়ে নিজেকে নির্মল করতে চায়।

দিন কাটে। নওয়ারা ধীরগতিতে ওমান উপসাগরের দিকে

এগিয়ে যায়। আলীসাহেব সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে একবার মাত্র সামান্য কোন আহার্য গ্রহণ করে আর সারাটা দিন নির্জলা উপোস করে কাটায়।

কিন্তু আশ্চর্য! কেন যেন নিজের সেই সুদৃশ্য কক্ষ থেকে বেরোয় না। স্বর্ণমুখীর আরোহীরা কৌতূহলে জ্বলে যায়। সারাদিন দরজা বন্ধ করে নির্জন ঘরে বসে বুড়ো করে কি! কেউ বলে, আলীসাহেব আল্লাহ্ রসুলের কাছে প্রার্থনা করে। বাইরে এলে পাঁচজনের পাঁচ রকম কথায় মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে, তাই রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিজেকে বন্দী করেছে।

আরে না-না, বুড়ো বসে বসে ওর সোনাদানার হিসেব করছে—এই তো একটু আগে বুড়ো তাব ভাণ্ডারীর সঙ্গে গুজগুজ করছিল।

আজীবন গোস্ত, শিককাবাব, মুরগী-মসল্লম খেয়ে খেয়ে যার পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে, সে কখনো নির্জলা উপোস করতে পারে! তাই বুড়ো লুকিয়ে লুকিয়ে খায়।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল আরবীয় সওদাগর চম্বন আলী। স্বর্ণমুখীর ছাদে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে ক্ষীণ চাঁদের রেখা খুঁজতে লাগল। পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সাগরের জল তরল অগ্নিধারার মতো জ্বলছে আর অস্তমান সূর্যের আলো পুণ্যের আলোর মতো ঝরে ঝরে পড়তে লাগল তার মুখে। গুটি-গুটি ছাদে উঠে এল হাকিম-সাহেব, এল ভিখু শেখ, এল কৃষ্ণাবাঈ। এল খালাসীদের অনেকে। চোখদুটোকে কুঞ্চিত করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উল্লসিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল চম্বন আলী, ওই যে—ওই যে—ময়ূরপঙ্খীর মতো একটুকরো লাল মেঘ ভাসছে—তার ওপরের নীল আকাশে তাকিয়ে দেখুন হাকিমসাহেব—বলতে বলতে হাকিমসাহেবের হাত ধরে কাছে টেনে এনে উচ্ছ্বসিত গলায় আবার বলল, দেখছেন, দেখতে

পাচ্ছেন—ওই যে—ওই যে সাদা ধোঁয়ার রেখার মতো চাঁদের ফালি!

হ্যাঁ—হ্যাঁ। ঠিকই তো। হাকিমসাহেবের কথা আর শোনা গেল না। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, আল্লাহ্—আকবর—লা—হি—ল্লা—রসুল—

এইবার আলীসাহেব, রোজা ভঙ্গ করুন—সেই ভোর থেকে না খেয়ে আছেন। হাকিমসাহেব অনুরোধ করল। পাশেই আলীসাহেবের খাস খানসামা, হাতে স্বর্ণপাত্রে কয়েক টুক্রো ফল আর রৌপ্যখচিত শ্বেত-পাথরের গ্লাসে সুগন্ধী সরবত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণাবাঈও স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলল, আর দেরী করবেন না আলীসাহেব। বলেই, শরবতের পাত্র তার মুখের কাছে তুলে ধরল। নিঃশব্দে কৃষ্ণাবাঈয়ের হাতটা সরিয়ে দিল আলীসাহের। তার চোখের দৃষ্টি কেমন সুদূর হয়ে উঠল। শেষ সূর্যের লাল আলোর গোলকটা তার মাথার চারিদিকে জ্যোতির্ময় রেখার মতো জ্বলতে লাগল। গম্ভীর হয়ে বলল, এখনও একটা কাজ বাকী আছে। একটু থেমে বলল, যে যেখানে আছে প্রত্যেককে ডেকে পাঠান হাকিমসাহেব।

কি পাগলামি করছেন বলুন তো? আগে কিছু খান তো—

না-না, ডেকে পাঠান আগে—তারপর আমি উপোস ভাঙব।

আলীসাহেবের কথা মতো কোলান্দিয়ার বাজারের দোকানীরা, মনোজ্জিলের মাইফেলের আসবের গাইয়ে-বাজিয়েরা, ভাণ্ডারী, কেরানী, খালাসীরা যে যেখানে ছিল, এল স্বর্ণমুখীতে। আসতে হলো। নওয়ারার খোদ মালিকের হুকুম। তারপর—

তারপর উপস্থিত প্রত্যেককে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে তার ভাণ্ডারীকে বলল আলীসাহেব, তোমাকে যা বলেছিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন কুলী নিয়ে ভাণ্ডারী ছুটল কোলান্দিয়ায়।

আরোহীদের চোখে তীব্র কৌতূহল জ্বলজ্বল করছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা মেহগিনি কাঠের সুদৃশ্য বারকোষ নিয়ে এল

ভাণ্ডারী। নিঃশব্দ পায়ে আলীসাহেব এসে তার ডালা খুলতেই ঝকমক করে উঠল আশরফী (স্বর্ণমুদ্রা)। প্রত্যেকের হাতে একটি করে আশরফী দিয়ে আচ্ছন্নের মতো বলল আলীসাহেব, বল ভাই, আল্লাহ্ আকবর—আশ্হাদু আল্লাইলাহাইল্লাহ্। স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে তারাও পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করল, আল্লাহ্ আকবর, আশ্হদু আল্লাইলাহাইল্লাহ্—

দূর বিদেশে যাচ্ছেন, অর্থের কত প্রয়োজন। এতগুলো আশরফী খামোকা—

দান্ না করলে যে রমজানের উৎসবের অঙ্গহানি হবে হাকিম-সাহেব!

কেউ কোন কথা বলল না। তাদের মনে হলো, স্বর্ণমুখীর ছাদ নয়, ধনকুবের স্বর্ণশ্রেষ্ঠী চন্দন আলী নয়, যেন মসজিদের শান্ত স্তব্ধ পরিবেশে দাঁড়িয়ে পীর ফকির কোরান শরীফের পবিত্রবাণী পাঠ করছেন।

রাত ফুরিয়ে দিন আসছে। সেই দিনও আবার দেখতে দেখতে শেষ হয়ে রাত নামছে। পঞ্চগৌড়ের নওয়ারা এবার আরবসাগরে তার পাড়ি শেষ করে পড়বে ওমান উপসাগরে। সঙ্কীর্ণ সেই জল-বিস্তারের একদিকে আরব আর একদিকে পারস্যের স্থলভূমি। আরোহীদের মনে উল্লাসের ঝিকিমিকি—দীর্ঘ জলযাত্রার কাল শেষ হয়ে এল। ওমান থেকে পারস্যোপসাগরের মুখে হোর্মুজ প্রণালী মাত্র ছ'দিনের পথ।

বুঝলে ভিখুভাই, ওমান উপসাগরে গেলেই দেখবে, বন্দরে বন্দরে আমাদের দেশের পণ্য স্তূপাকৃতি হয়ে আছে। এখান থেকেই স্থলপথে সেই মাল ভূমধ্যসাগর হয়ে চলে যায় ইউরোপে।

ভিখু যেন হাকিমসাহেবের কথা শুনতেই পেল না। সে নতুন দেশের নতুন সমুদ্রের দিকে মুগ্ধ আর অপলক চোখদুটো ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চম্বন আলী সারাদিন ঘুরে ঘুরে জাহাজের খালাসীদের কাজ দেখে। তদারকি করে। ওমানের জলে নওয়ারা পৌঁছনোর পর বলল আলীসাহেব, কি রে জহুর, হু'দিনে হোর্মুজ পৌঁছতে পারবি তো?

হ্যাঁ কত্তা, যতক্ষণ জহুর মিঞা আছে আপনার নওয়ারায়, ততক্ষণ আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

কোন কথা বলল না আলীসাহেব। শুধু বিড়বিড় করে বলতে লাগল, অলহ্‌মদুল্লিলা—অলহ্‌মদুল্লিলা! কেন যেন আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলে গেল। জহুব খুক খুক করে হেসে বলে, শালা বুড়োর ভয় হয়েছে রে খারওয়া—দেখেছিস—

একটু ভয় পাওয়ারই কথা মৌলিমভাই। এখানকার জল খুব গভীর। সারেঙ ননী বলল, আর দূরে দূরে কত খাড়ি আর চর দেখেছো! জাহাজ চালানো এখানে খুব বিপদ।

আরে চুপ কর শালা, ওটা তো আলীসাহেবের দেশের দিক। শুধু খাড়ি আর চর নয়। জলের নীচে আছে চুম্বকের ডুবো পাহাড়। ওদিক দিয়ে জাহাজ নিয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু আরব উপকূলের দিক দিয়ে যাচ্ছে কোন্ শালা! পিচ করে একদলা থুথু ফেলল মৌলিম। বিড় বিড় করে বলল, এই ওমান আর হোর্মুজ পার হয়ে হয়ে চুল পাকিয়ে ফেললাম—শালা ইবলিশের বাচ্চা এসেছে আমাকে শেখাতে—

নিশিরাত ঘন হয়ে নেমেছে ওমান উপসাগরের জলে। আলী-সাহেবের দরজায় মৃদু শব্দ হলো—টক—টক—টক!

কে? দরজা খুলল আলীসাহেব, আর বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি! অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণাবাঈ। পরনে ঘন নীলাম্বরী মলমল শাড়ি। উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন আঁকা তার প্রতিমার মতো সুডৌল মুখে। আলীসাহেব শুকনো গলায় বলল, এত রাত্রে তুমি?

কিছু না—এমনি এলাম।

না-না, তুমি যাও। যাও নিজের ঘরে চলে যাও কৃষ্ণাবাঈ। ছিঃ ছিঃ, আমার একটা 'ইমান' আছে না! চারদিকের অন্ধকারে আলী-সাহেবের কথাগুলো কাতর আর্তনাদের মতো শোনালো। কৃষ্ণাবাঈকে বিদায় করে দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

প্রহরে প্রহরে রাত্রি বেড়ে চলল। রাত্রির কালোছায়ায় ওমানের জল হয়ে এল নিকষ কালো। তারপর কখন যেন একফালি মেঘ এসে হীরের কুচির মতো চিকচিকে তারাগুলোর ওপর দিয়ে ঘন একটা পর্দা টেনে দিয়ে গেল। হঠাৎ রাত্রির নিথর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে কোলান্দিয়ার খালাসীদের আর্ত চিৎকার শোনা গেল—জাহাজে জল ঢুকছে—জাহাজে জল ঢুকছে—

পাঁচ পীর বদর বদর!

সামাল—সামাল ভাই! হেঁকে বলল মৌলিম, তোদের খারওয়াকে দিয়ে জল ছেঁচে ফেলতে শুরু কর।

লা—ইল্লাহা—র সু লা ল্লা—খুদাতালা—বাঁ চা ও—বাঁ চা ও—আমাদের বাঁচাও—ঘন অন্ধকারে কোলান্দিয়ার যাত্রীদের করুণ আর্তনাদ সমুদ্রের হু-হু বাতাসে পাক খেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ছুটে বেরিয়ে এল হাকিমসাহেব, এল ভিখু শেখ। তারা ঘুমে ভরা চোখদুটো রগড়ে নিয়ে দেখল আকাশে জমেছে থরে থরে ঘন কালো মেঘ। সারাটা আকাশকে কালো লোহার পাতের মতো মনে হচ্ছে আর সেখানে ঝড়াং ঝড়াং করে লাল-বিদ্যুতের এক-একটা শিখা তার আগ্নেয়বাহু এদিকে-ওদিকে বাড়িয়ে দিয়েই আবার ঘন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। বিদ্যুতের সেই উগ্র আলোয় তারা দেখল, তাদের স্বর্ণমুখী, গার্ভিণী আর মনোজ্জিল যেমন ঝড়ো বাতাসে ফুঁসে-ওঠা এক-একটা বিশাল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ঘোড়ার মতো জোর কদমে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে—তেমন করে কোলান্দিয়া যেতে পারছে না। কে যেন তার গতি কেড়ে নিয়েছে। একটু একটু করে সে কাত হয়ে সমুদ্রের অতল কালো জলের ভেতরে

নেমে যাচ্ছে। তার মৌলিম, সারেঙ, খারওয়া আর্তনাদ করছে, আমাদের জাহাজ ফুটো হয়ে গেছে! শীগ্‌গীর—আরও ছোট পানসী পাঠিয়ে দাও!

বাইরে হাজারো মানুষের আর্তকলরবে আর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অশান্ত গর্জনে আলীসাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। দড়াম্ করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসা মাত্র কে যেন তাকে বলে, ফুটো হয়ে গিয়েছে কোলান্দিয়া—

অ্যাঁ! আমি জানতাম—এরকম যে হবে তা আমি জানতাম। কোলান্দিয়ায় যে লোহার পাতের জোড় আছে। আর এই রাক্ষুসে ওমানের জলে আছে চুম্বকের ডুবো পাহাড়! বলতে বলতে হঠাৎ ঘন অন্ধকারে গর্জিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল, ভাণ্ডারী কোলান্দিয়ার তিনটি ছোট নৌকো করে তার সোনারত্নের পণ্য নিয়ে আসছে স্বর্ণমুখীতে। মর্মান্তিক ক্ষোভে চীৎকার করে উঠল আলীসাহেব, আরে মূর্খ বেয়াকুফ, আগে মানুষের জান—না সোনাদানা আগে? হেঁকে মনোজ্জিল আর গর্ভিণীর পানসী নামাতে বলল সে। সেই নৌকোগুলো যেই ডুবন্ত কোলান্দিয়ার কাছে গেল, অমনি তার অসহায় যাত্রীদের ভেতরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—নিশ্চিত ও অনিবার্য মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য কে আগে নৌকোয় উঠবে, তাই নিয়ে মারামারি কান্নাকাটি, সব মিলিয়ে শুরু হয়ে গেল দারুণ বিপর্যয়!

লা—ইল্লাহা—রসুলাল্লা—হা আল্লা—

গজরাচ্ছে ওমানের জল। মেতে উঠেছে ফেনায় ফেনায়। আকাশের লোহার চ্যাপ্টা পাতের ভেতরে বজ্র ঝলকাচ্ছে। কালো জলের ভেতরে লিকলিক করে উঠেছে যেন হাজারো প্রেতাত্মার রক্তাক্ত কঙ্কাল হাত। আরোহীদের আর্ত চীৎকার, ঝড়ো বাতাসের অশান্ত গর্জন, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের হুঙ্কার, সব মিলিয়ে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল। আর স্থির থাকতে পারল না আলীসাহেব। চীৎকার করে বলল, আরে নৌকোগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি, একটু তুরন্ত যাও—ওরা

যে ডুবে গেল—বলে নিজেই একটা ছোট পানসী নামিয়ে নিয়ে ছুটল কোলান্দিয়ার দিকে।

হাঁ-হাঁ করে উঠল জহর; চীৎকার করে বলল হাকিমসাহেব, যাবেন না—আপনি যাবেন না আলীসাহেব।

তাদের আর্তনাদ ঝড়ো বাতাসের গর্জনে ডুবে গেল। পাহাড়প্রমাণ এক একটা ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলল আলীসাহেবের পানসী।

যে মুহূর্তে আলীসাহেব কোলান্দিয়ার পাটাতনে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল উঁচু একরাশ ঢেউ শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যের মতো মত্ত আক্রোশে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের পলকে তলিয়ে দিল তাকে।

হা-আল্লা—ডুবে গেল আলীসাহেব! সমবেত কণ্ঠের করুণ হাহাকার ঝড়ো বাতাসের অশ্রান্ত আর্তনাদের ভেতরে মিলিয়ে গেল। আরবসাগরের জলের গর্জনে তার বিকট আর নিষ্ঠুর অট্টহাসি দিকদিগন্ত জুড়ে বাজতে লাগল।

॥ ষোল ॥

সকালের মিষ্টি নরম রোদে ধুয়ে যাচ্ছে আকাশ। সোনা ঝলমল করছে ওমানের জলে। কোথাও গত রাত্রির দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু—

দুর্যোগ নেমে এসেছিল পঞ্চগৌড়ের পণ্যবাহী সেই নওয়ারায়। স্বর্ণমুখীর অলিন্দে সারি সারি দাঁড়িয়েছিল তারা তিনজন।

হাকিমসাহেব।

ভিখু শেখ।

কৃষ্ণাবাঈ।

নির্বাক শোকম্লান মুখ। চোখে শূন্যদৃষ্টি। সে-দৃষ্টির কোন ভাষা নেই। অথচ সাগরের জল কেটে কেটে চলেছে স্বর্ণমুখী, চলেছে গর্ভিণী, চলেছে মনোজ্ঞিল। রাত্রির সর্বনাশা দুর্যোগের ঘন অন্ধকার কেটে গেছে। ভোর হয়েছে! সূর্য উঠেছে। কোথাও নেই এতটুকু ব্যতিক্রম। আছে—আছে, সব ঠিক আছে। নেই শুধু একজন—নেই তার বড় সাধের কোলান্দিয়া। কী অবিশ্বাস্য আর নিষ্ঠুর এই না থাকা! এই তো এখানে—ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে সেই দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ মানুষটা পবিত্র রমজানের উৎসবে মেতে উঠেছিল! আর দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিল আল্লাহ্ আকবর -আশাহাদু আল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা—লা—ইলাল্লা—রসুলাল্লা—আর কেমন একটা আরত্রিক আভায় উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল তার মুখাবয়ব! বড় বড় দুটো নীল চোখে ফুটে উঠেছিল পুণ্যার্থীর মতো সুদূর আর উদাসীন দৃষ্টি! যে মানুষটা সারা নওয়ারায় ঈশ্বরের মতো মহিমায় বিরাজ করছিল সেই মানুষটাকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না, আর কখনো দেখা যাবে না!

তাই বলে পৃথিবী থেমে থাকবে না। থাকে না। মৃত্যু কখনো জীবনকে স্তব্ধ করতে পারে না। তাই সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় কেটে গিয়ে প্রসন্ন প্রভাতের আলোয় ঝিলমিল করছিল সাগরের জল। প্রতিটি জাহাজের মৌলিম-পঞ্জেরী-সুখানজিয়ার-সারেঙ আর খারওয়ারা নির্বাক পুতুলের মতো নিঃশব্দে যে-যার কাজ করে চলছিল। ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল। অতএব অনুকূল বাতাসে পাল খাটালে তীব্র হবে নওয়ারার গতি। তাই তারা পাল তুলেও দিয়েছিল। দাঁড়িরা দাঁড় টানছিল। হালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিল মৌলিমরা। করতে হয়, করতে হবে, তাই করছিল সব কাজ।

কিন্তু কেমন প্রাণহীন আর নির্জীব তাদের সেই কাজের ছন্দ। কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছিল তাদের মুখে। চোখের কোণায় কোণায় জল চিকচিক করছিল। সেই কতদিন আগে পাঁচ পীরকে সিন্নি খাইয়ে গৌড়ের গঙ্গায় যাদের সঙ্গে নাওয়ারা ভাসিয়েছিল, তাদের অনেকেই এই সাগরের বুকে ঘুমিয়ে রইল। দেশে ফিরে গিয়ে তাদের স্বজন-পরিজনের কাছে কি বলবে— কেমন করে দাঁড়াবে তাদের সামনে, সেই দুশ্চিন্তার জ্বরে ভেতরে ভেতরে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছিল তাদের মন।

খুব চাপা গলায় তাদের ফিসফিসানিও শোনা যাচ্ছিল— যাও মৌলিমভাই, তুমি বল, আমরা যাব না।

পাঁচ পীরের ইচ্ছা নয় যে, আমরা যাই।

হ্যাঁ, হয়তো পারস্যোসাগরে আবার কোন বিপদে পড়ব। কি ফেরার পথেই কোথাও।

আর নওয়ারার মালিক নেই। কে দেবে আমাদের পাওনা-গণ্ডা ?

স্বর্ণমুখীতে আলীসাহেবের সেই সুদৃশ্য কক্ষের দিকে তাকিয়ে বুক উজাড় করে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলল বহুদর্শী মৌলিম জহর। চোখদুটো বুজে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। ' আস্তে আস্তে বলল,

কিন্তু পথের মধ্যে থেকে ফেরা যায় কি করে? জাহাজগুলোর বিশ্রাম দরকার। আমাদেরও একটু জিরানো—

তাহলে ওমানের বন্দরেই নোঙর করা যাক না!

ওমানে! কথাটা মন্দ নয়।

না, আর ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা আর যাব না।

হাল ছেড়ে টলতে টলতে উঠে এল জহর। বাজপড়া ঠুঁটো তাল-গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকা হাকিমসাহেবের সামনে এসে নিভু-নিভু গলায় বলল, আমরা আর যেতে চাচ্ছি না হাকিমসাহেব, একটু থামল, কয়েকটা ঢোক গিলে আবার বলল, এত বড় একটা দুর্ঘটনার পরে আর যে নওয়ারার মাথা নেই।

হাকিমসাহেব কোন কথা বলল না। শুধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ভিখুর মুখের দিকে। ভিখুর মনে হলো, তার সেই ভল্লা-কাস্পিয়ানের সুদূর দেশে যাওয়ার যে স্বপ্নটা বুকের ভেতরে এতকাল হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছিল, সেই স্বপ্নটা মৃত-বৎসার সন্তানের মতো হঠাৎ অকালে মরে গেল। সে কোন কথাই বলতে পারল না। ডুবন্ত মানুষের মতো দু'চোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখের দিকে। কিন্তু কৃষ্ণাবাঈও কোন কথা বলল না। অস্বস্তিকর স্তব্ধতার ভেতরে জাহাজের গায়ে ঢেউয়ের একটানা ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ শুধু চাবুকের আঘাতের মতো শোনা যেতে লাগল। মাথা নীচু করে চলে যেতে যেতে অস্পষ্ট গলায় বলল জহর, আপনারা ভেবে-চিন্তে ঠিক করুন—আমরা আমাদের কথা জানিয়ে গেলাম।

জহর ভাই, একটু দাঁড়িয়ে যাও। মৃদু গলায় বলল কৃষ্ণাবাঈ। ধীর পায়ে আবার সামনে এল জহর। জহর ভাই, যে মানুষটা বেহেস্তে চলে গিয়েছে, তার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করবে না?

জহর ভ্যাবাচাকা খেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। হাকিমসাহেব ও ভিখুর চোখেও বিস্ময় ছটফট করতে লাগল। হাকিমসাহেব অস্ফুটস্বরে বলল, তোমাকে কি কিছু বলে গিয়েছিল?

মাথা ঝাঁকালো কৃষ্ণাবাঈ। ভিখুর দিকে ইঙ্গিত করে সসঙ্কোচে বলল, আপনারা তো জানেনই, উনি আলীসাহেবের অংশীদার।

হ্যাঁ-হ্যাঁ জানি, আলীসাহেরের অবর্তমানে এখন ভিখুই— হাকিমসাহেব উৎসাহ ভরে আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কৃষ্ণাবাঈ বলল, একটু দাঁড়ান—আমি এখুনি আসছি। বলেই তার নিজের ঘরে গেল এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল। হাতের মুঠোয় আলীসাহেবের হিসেবের খাতার একটা ময়লা, জীর্ণ পাতা। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল কৃষ্ণাবাঈ, কাগজের এই টুক্‌রোটা আজ আলীসাহেবের ঘরে পেয়েছি।

হাকিমসাহেব এবং ভিখু দু'জনেই ঝুঁকে পড়ে দেখল, তাতে আরবী ভাষায় কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষরে লেখা আছে, ভেতরে ভেতরে কেন যেন অজরঈলের ডাক শুনতে পাচ্ছি। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। কখন কি হয় বলা তো যায় না। আমার অবর্তমানে আমার চারটে জাহাজ এবং মণিমুক্তা সোনারত্নের পণ্যের সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার অংশীদারের ওপর বর্তাবে। তার নীচে দ্রুত অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে, আমি গোনাগার—আমি গোনাগার (পাপী) - আমি জুলমকার (অত্যাচারী) বাদশা।

এখন বুঝতে পারছি বন্ধ ঘরে বসে আলীসাহেব কি করতো। আপনমনে বলল হাকিমসাহেব। আবার জহরকে বলল, জহর ভাই, তোমরা যেতে আপত্তি কর না—এখন থেকে নওয়ারার কর্তা হবে এই ভিখু শেখ, আলীসাহেবের সেই ইচ্ছাই ছিল।

আর একটা কথাও বলল না জহর মৌলিম। মাথা নীচু করে অবসন্ন পায়ে নিজের কাজে গেল। শুধু বিড় বিড় করে অস্ফুটস্বরে বলল হাকিমসাহেব, শেষের দিকে কেন যে অজরঈলের চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছিল—

কয়েকদিন পর। পঞ্চগৌড়ের নওয়ারার আরোহীরা দেখল আকাশে ডানা মেলে উড়ছে সমুদ্রপাখির ঝাঁক। খালাসীদের ভেতরে

গুঞ্জন উঠল আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্—ডাঙায় পা দিতে পারব খুব শীগ্গীরই।

আলীসাহেব নেই। তাই ভিখুর মনের ভেতরটা খচ খচ করছে ঠিকই—কিন্তু তীব্র উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে তার বুক। এখুনি, এখুনি সে পৌঁছে যাবে পারস্যে। হাকিমসাহেব বলল, বুঝলে ভিখুভাই, মানুষ যেদিন প্রথমে সাগরে নৌকো চালাতে শিখল, সেই যীশুর জন্মের হাজার হাজার বছর আগে থেকে নাম শোনা যায় এই পারস্যোপ-সাগরের। একটু থেমে আবার বলল, রোম, মিশর, আবিসিনিয়া, গ্রীসের সওদাগররা শুধু আমাদের দেশের রেশম আর মসলিনের লোভেই এই সাগর পাড়ি দিত।

কৃষ্ণাবাঈ কোন কথা বলল না। শুধু ভিখুর মুগ্ধ আর তন্ময় মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

কয়েকদিন পর পঞ্চগৌড়ের নওয়ারা বুশায়ার বন্দরে নোঙর করল। ভিখু খালাসীদের ডেকে তাদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে মৌলিম জহরকে বলল, জহর ভাই, তোমরা এখানে কিছুদিন বিশ্রাম কর—জাহাজগুলোর টুকিটাকি মেরামত সেরে নাও—আমরা আবার ফিরে আসব।

শুকুর অল্হম্‌দুলিল্লা—বিড় বিড় করে বলল জহর।

পারসিক, রুশ, আরবীয়, রোমীয়, মিশরীয় আরও দূর-দূরান্তরের বহু জাহাজের ভিড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে রইল গৌড়ের বাণিজ্যতরী স্বর্ণমুখী, গর্ভিণী আর মনোজ্জিল। জেটীতে অপেক্ষমান নানা দেশের ব্যবসায়ী দালাল পাইকারদের ভেতরে গুঞ্জন শোনা গেল—জাহাজী বাঙ্গালা আমেদী—জাহাজী বাঙ্গালা আমেদী (বঙ্গদেশ থেকে জাহাজ এসেছে)। আর শোনা গেল দুটো কথা—'মসলিন'—'রেশম'।

তীব্র একটা উত্তেজনা ভিখুর স্নায়ুতে স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। জাহাজঘাটে কত দেশের কত বিচিত্র পোশাক পরা কত রকমের হাজারো মানুষের এক রঙীন সমাবেশ! কারো মাথায় কালো পশমে বোনা ফেজটুপী, কারো মাথায় পাগড়ী কারো কোমরে গোলাপী সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা রুশ তরবারি (ঠিক যেমন হোসেনচাচা বাগদাদ থেকে রপ্তানী করেছিল), কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা।

কালো বোরকার ভেতর থেকে ফিসফিসিয়ে বলল কৃষ্ণাবাঈ, সাবধান, তোমার কাছ থেকে কিন্তু পাইকারী দরে মাল কিনতে চাইবে, এখানে কাউকে বিক্রি করবে না।

কেন? যদি বেশি দাম দেয়?

তাও না। ইস্পাহানে, তেহরানে, তাব্রিজে আমরা অনেক বেশি দাম পাব।

হঠাৎ ভিখুর নজরে পড়ল, জাহাজঘাট ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা খোলা মাঠে সারি সারি অনেক উট দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের পিঠে বাঁধা আছে নানা রকমের পণ্যসামগ্রী। উত্তেজনায় ফেটে পড়ে ভিখু বলল, ওখানে অত উট কেন হাকিমসাহেব আর অত মালই বা কোন্ দেশের?

ভিখুর কৌতূহলী দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল হাকিমসাহেব, এখান থেকেই যে নানা দেশের জাহাজে উঠবে ওই মালগুলো আর ওই উটগুলোর পিঠে বাঁধা রাশি রাশি বস্তার ভেতরে যে কি নেই আর কি আছে, তা বলে শেষ করা যায় না ভিখুভাই। ইস্পাহানের পশমে রেশমে বোনা বিচিত্র কারুকার্য করা গালিচা, খোরাসানের দুম্বার চামড়া থেকে শুরু করে কাবুলের আঙুর, কান্দাহারের চেরী, বোখারা সমরখন্দের পুস্তিন (পশুর লোম), মজার-ই-শরীফের নানারঙের সূতী কাপড়ের ছিট, বদখ্শানের লালরুবি, মেসেদের তসবী, রুশ-মুলুকের টবোলস্কের গাছ-গাছড়ার দাওয়াই,

বুলজার খাজারের (ভল্গানদীর বন্দর) শনের দড়ি, পশম, মধু, শীলমাছের দাঁত, তলোয়ার আর কত বলব— থামল হাকিমসাহেব। কোথায় টবোলস্ক, কোথায় বুলজার খাজার, দূরান্তবর্তী দেশের এই নামগুলো যেন ভিখুর বোধরাজ্যের কুয়াশার ভেতরে এক-একটা টোকা দিয়ে ছোট ছোট এক-একটি সূর্য জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু—

বেশি চিন্তা-ভাবনা করার সময় ছিল না। তারা যেই মালদহী সিল্কের আর চন্দন আলীর সোনাদানার বারকোষগুলো নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল, অমনি পাইকার-দালালদের ভেতরে কলরব উঠল, জুদ্‌কুন্—জুদ্‌কুন্—জুদ্‌কুন্ (জলদি কর)— বেঙ্গলাকা মসলিন খরিদ—

শুকুর অল্‌হম্‌দুলিল্লা (খুদাতালাকে ধন্যবাদ), আপনি কি রকম আছেন ? একটু বেশি বয়সী সওদাগর ব্যাপারীরা অনেকেই হাকিম-সাহেবকে সম্ভাষণ জানালো। হাকিমসাহেবও উদ্দীপ্ত হয়ে একবার কাউকে বলতে লাগল 'ভাই', কাউকে 'বেরাদর', কাউকে জানেমন (আমার জান), কাউকে আগাজান্ আর তাদের প্রত্যেকের হাল-হকীকৎ নিতে লাগল। তাদের ভেতরে একজন বলল, এতদিন কোথায় ছিলেন হাকিমসাহেব ? সঙ্গের এই মকবুল জওয়ান কে ? আপনার—

না-না। তাজ্জব কী বাত বলছেন যে! সাদী করলাম কবে যে, আমার লড়কা হবে! ও হলো মালদাই মসলিনকা সওদাগর আর—

কালো রঙের মলমলের বোরকার নীচে কৃষ্ণাবাঈয়ের পদ্মপাপড়ির মতো নরম আর রক্তিম পাতুটোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল হাকিমসাহেব। কিন্তু সেই বয়স্ক সওদাগররা উল্লসিত কণ্ঠে বলল, বেশ করেছে— বহুৎ আচ্ছা—মসলিন সওদাগর বিবিকে নিয়ে এসেছে আমাদের দেশ দেখাতে—

কিন্তু কেউ দেখতে পেল না, বোরকার আড়ালে কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখে কে যেন মুঠো মুঠো আবির ছিটিয়ে দিল। পাইকার-দালালদের

ভেতর থেকে একজন বলল ভিখুকে, দেখুন সাহেব, ইনসান বড়ই খুদ পরস্ত্ (সংসার বড়ই স্বার্থপর)। আর আপনি পরদেশী, কে কোথায় ঠকিয়ে দেবে! একটু থামে সে। তার সুর্মাটানা চোখে অনুনয় ফুটে ওঠে, তাই বলছি, খুদা আপনাকে খুশ্-নসিবী (সৌভাগ্য) দেবে যদি আপনি মালদাই রেশমকা সামান পাইকারী দরে বিক্রি করে দেন—

ভিখু জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায় বোরকার আবরণে ঢাকা কৃষ্ণাবাঈয়ের দিকে। দেখতে পায় প্রবলভাবে কৃষ্ণাবাঈ মাথা ঝাঁকাচ্ছে! পাইকার আবার ব্যাকুল হয়ে বলে, খুদার কসম খেয়ে বলছি খোদাবন্দ্ (প্রভু), তেহরানে, ইস্পাহানে এই মালের যা দাম পাবেন তার চেয়ে জ্যায়দা তোমুয়ান (পাশীমুদ্রা) দেব।

না ভাই, মেহেরবাণী করে মাফ করুন। আপনাদের দেশে এলাম, এখানকার পাঁচটা বাজার ঘুরে দেখতে দিন ভাই!

এল সবাইওয়ালা। সেলাম জানিয়ে বলল, সাহেব, আমার সরাইতে চলুন। আমার সরাইয়ের 'ঘিজা' (আহার্য) খুব আচ্ছা। নান, দহী, পোলাও, আলু-গোস্ত, শিককাবাব, মুর্গী-মসল্লম, বকরীর সিনা কলিজাকা কালিয়া—

বাবু, আমি 'জাম্মাল' (উটের মালিক) আছি। সওদা নিয়ে যদি ইস্পাহানে, তেহরানে, তাব্রিজে যান, তাহলে সুটুর (উট) জরুর লাগবে।

না-না খোদাবন্দ, আর একজন জাম্মাল লাফিয়ে এল, ওর সুটুর দুবলা আছে, কারুন নদীর পাড়েই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

আহা, তোমরা কাজিয়া করছো কেন? সরাইওয়ালা বিব্রত হয়ে বলল, এঁরা পরদেশী খুশ্-বখ্ত (ধনী) সওদাগর আমাদের দেশে মেহমান—

আচ্ছা ভাই, তোমাদের সুটুর কতদূরে যেতে পারে? ভিখুর চোখদুটো কেমন উৎসুক আর স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। দুই জাম্মালই

হাত-পা নেড়ে যে দীর্ঘ ফিরিস্তি দিল, ভিখু তার খানিকটা বুঝল, খানিকটা বুঝল না। হাকিমসাহেব তাদের বক্তব্যটা বিশদ করে বলল, বুঝলে ভিখুভাই, উট হলো এদেশের একমাত্র যানবাহন। উটের কাফেলা বুশায়ার থেকে তাব্রিজ, তাব্রিজ থেকে কাস্পিয়ানের পশ্চিমতীর দিয়ে আস্ত্রাখান হয়ে চলে যেতে পারে রুশ-মুলুকে। একটু থেমে আবার অদূরে রুশ-সওদাগরদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এই ওদের ভেতরে কেউ এসেছেন উটের পিঠে চড়েই উরাল পাহাড় পেরিয়ে, কেউ এসেছেন নভগোরোদ থেকে স্মোলেনস্ক থেকে, কীয়েভ থেকে, ভল্গা— হাকিমসাহেব যেন আরও কি বলতে চাইছিল। কিন্তু সরাইওয়ালা বলল, চলুন বাবুসাহেব, অনেক মেহনত করে এসেছেন, পহলে তো আরাম করবেন।

সওদাগর, ব্যাপারী, পাইকার, দালাল আর জাম্মালদের ব্যূহ পেরিয়ে তারা যখন সরাইয়ে পৌঁছল তখন চারদিক ঝাঁপিয়ে নেমে আসছে সন্ধ্যায় অন্ধকার। সরাইয়ের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো ভিখু, এ কী রকম সরাইখানা রে বাবা! তার মনে হলো, আবছায়া অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে তার দেশের একডালা দুর্গের মতো বিশাল একটা দুর্গ। তার চারদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেই দুর্গের ভেতরে যাওয়ার দরজাটা এত উঁচু যে, একটা উট সওয়ারী আর তার মালমাত্রা সুদ্ধ ভেতরে চলে যেতে পারে। তারাও সেই দরজা পেরিয়ে মস্তবড় একটা খোলা উঠোনে পা দিল। ভেতরে যেতেই ভিখুর চোখদুটো বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই ফাঁকা চত্বরে যে তার দেশের ধলদীঘির মেলায় যেমন বসে উট, গোরু-বাছুর, ঘোড়া আর বলদের হাট, সেই রকম জন্তু-জানোয়ারের হাট বসে গেছে! দেশ-দেশান্তরের যাত্রীরা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে তাদের ভেতরে ঘুরে ঘুরে আপন আপন জানোয়ারের তদারক করছে। কেউ বা খড়-বিচালী দিয়ে তাদের 'জাবনা' দিচ্ছে। কেউ বা তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে। জানোয়ারদের ভিড় কাটিয়ে এসে ভিখু দেখল, তাদের

চিড়াইবাড়ির গোঁসাইয়ের জাহাজকারখানার মতো খুব লম্বা একটা ঘর। তার ভেতরে আবার কবুতরের খোপের মতো সারি সারি এক-একটা ছোট ছোট খোপ। সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে অনেক দর-কষাকষি করে হাকিমসাহেব তাদের জন্য একটা খোপ ভাড়া নিল। কৃষ্ণাবাঈয়ের জন্য একটা দড়ির চারপাইও যোগাড় করা হলো। ঠিক হলো ঘরের ভেতরে থাকবে কৃষ্ণাবাঈ আর বাইরে বারান্দায় থাকবে তারা দু'জন।

এখানেও সরাইখানার যাত্রী আফগান, পাঠান, আরবীয়, পারসিক, রুশীয় সওদাগরদের নানা ভাষায় নানারকমের প্রশ্ন ঝাঁক ঝাঁক তীরের মতো ছুটে আসতে লাগল তাদের দিকে।

বুশায়ারের বাজারেই কিছু কেনাবেচা করবেন, না সওদা নিয়ে চলে যাবেন ইস্পাহানে, তেহরানে, মেসেদে? গেলে খুব সাবধানে যাবেন। কাফেলা (ক্যারাভান) ঠিক করেছেন?

কোন্ জাম্মালের কোন্ 'সারওয়ান' দেখেশুনে নেবেন কিন্তু!

জানেন ইস্পাহানের রাহ (রাস্তা), যেটা কুহের (পাহাড়) ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে, সেখানে খুব রাহজানি (ডাকাতি) হয়!

হাকিমসাহেব কাউকে জী হাঁ, জী না বলে, কখনো বা শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে লাগল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভিখু উৎসুক হয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল, কিন্তু ডাকাতির কথা শুনেই হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল। দৌড়ে গিয়ে তাদের মালপত্রের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এল পাকা বাঁশের একটা তেল চকচকে লাঠি। তার গিঁটগুলো আবার পিতলের পাত দিয়ে বাঁধানো। উদ্দীপ্ত হয়ে ভাঙা-ভাঙা পার্শী ভাষায় বলল, (গৌড়ের পারসিক জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে পার্শী ভাষা খানিকটা জানতো) দেখেছেন, আমার মীরাভাড (লাঠি), এ বাবা যে-সে মীরাভাড নয়, রীতিমত নিমাসরাইয়ের ভালকা বাঁশের ঝোপ থেকে কাটা বাঁশের লাঠি, এই মীরাভাড আমার হাতে থাকলে—

কী যে ছেলেমানুষী করছো! চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল কৃষ্ণাবাঈ। কিন্তু থেমে গেল দেশ-দেশান্তরের সেই সওদাগর ব্যাপারী দালালদের হাজারো সওয়াল। তারা বিস্মিত আর মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ভিখুর দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার দিকে। তাদের ভেতরে অস্ফুট গুঞ্জন উঠল, বহুত হাসিন জওয়ান—

কেউ দেখতে পেল না, জানতে পারল না, বোরকার আড়াল থেকে ভিখুর সেই কেয়াফুলের মতো দীর্ঘ, ঋজু আর সুঠাম তনুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কৃষ্ণাবাঈয়ের চেতনা কেমন অবশ হয়ে এল। ঝিমঝিম করতে লাগল তার মাথার ভেতরটা।

বাতাসে মশালের ছায়া কাঁপা-কাঁপা আলো আর আঁধারিতে আচ্ছন্ন সরাইয়ের সেই সওদাগরদের আসরের অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা সচকিত করে দিয়ে ভারী জুতোর শব্দ বেজে উঠল—খট—খট—খট—

সরাইওয়ালার সঙ্গে এল লম্বা-চওড়া মজবুত চেহারার একটা মাঝবয়সী লোক। তার পায়ে দুম্বার চামড়ার পয়জার। পরনে রেশমের শিলওয়ার। কিন্তু এমন ময়লা আর বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে যে, সহজে বুঝতে পারা যায় না যে সেটা রেশমের তৈরি। সরাইওয়ালা কিছু বলার আগেই লোকটা হেঁড়ে গলায় বলল, বাবুসাহেব, আমার নাম মীর্জা আব্দুল রেজাক—আমি কাফেলার সর্দার আছি। একটু থেমে বলল, আমার কাফেলা ইস্পাহানে রওয়ানা হচ্ছে কাল—আপনারা—

রেজাকের কাফেলায় গেলে কুহিস্তানী (পাহাড়ী) রাহজান (ডাকাত) কিছু করতে পারবে না। সরাইওয়ালা মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল। হাকিমসাহেব তাকালো কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখের দিকে। উৎসাহের আতিশয্যে ভিখু কলকল করে বলল, চলুন—চলুন না হাকিমসাহেব, কালই ইস্পাহানে রওয়ানা হওয়া যাক!

হাসি ঝিকমিক করতে লাগল কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখে। তীব্র উৎসাহে

উদ্দীপ্ত ভিখুর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, হাকিম-সাহেব, কাফেলার সরজগুকে বলুন, আমরাও কাল ভোরে রওনা হব।

কৃষ্ণাবাঈয়ের কথাটা বুঝতে পেরে রেজ্জাক উল্লসিত হয়ে বলল, তাহলে বাবুসাহেব, আপনারা সামান নিয়ে বুশায়ারের বাজারে চলে আসবেন। একটু থেমে গর্বিত চোখে হাকিমসাহেব আর ভিখুর দিকে তাকিয়ে বলল, বাবুসাহেব, রেজ্জাকের কাফেলা কখনো দির্ ওক্ত (দেরী) করে না। বুশায়ার থেকে ইস্পাহান তামাম মুলুকে বি-সারি মওকী (ঠিক সময়ে) রওয়ানাকে লিয়ে খুব খুশনাম্ আছে-- আচ্ছা বাবুসাহেব, সালাম—

রাত্রি নামল ঘন হয়ে। গভীর স্তব্ধতায় সরাইখানার চারদিক থম থম করতে লাগল। তখনো কোন কোন ঘর থেকে যাত্রীদের অস্ফুট দু'টি-একটি টুক্‌রো টুক্‌রো কথা কানে আসছিল। সরাইয়ের সেই চত্বর জুড়ে নানা রকমের জানোয়ারের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল—

ওরা দু'জন।

দূরে তমসাস্তীর্ণ সাগরের জল ভোঁতা ছুরির মতো ঝিকমিক করছে। বন্দরের দেশ-দেশান্তরের জাহাজের আলোগুলো চার-দিকের অন্ধকারে আগুনের ফুলের মতো ফুটে রয়েছে।

ঘর থেকে হুড়-হুড় করে তো টেনে নিয়ে এলে, এখন কোথায় যাবে বল তো?

ভিখু চুপ করে থাকে। শুধু গভীর আবেগে তার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে। আস্তে আস্তে বলে, চল—ওই মাঠটায় গিয়ে বসবে একটু—

ওরে বাবা, না-না, ওখানে না। কৃষ্ণাবাঈ যেন আঁতকে উঠল। মাঠের চারদিকের ওই কালো কালো গাছগুলো দেখছো তো—ওগুলো এদেশী খেজুর গাছ। ওখানে পাহারাদার জেগে বসে রয়েছে—

তাহলে, বালুচরের দিকেই চল।

ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বলল, চল যেখানে হয়, ঘর আর ঘরের দেওয়াল আর ভাল লাগছে না।

তরল অন্ধকারে কৃষ্ণাবাঈয়ের চোখদুটো নক্ষত্রের মতো চিক চিক করে ওঠে। তার মনের ভেতরে ভেসে ওঠে সেই অনেকদিন আগে চম্বন আলীর সঙ্গে অংশীদারী সর্তে জাহাজ জোগাড় করার জন্য ভিখুর সেই তীব্র বিরক্তিভরা রাগ-রাগ মুখখানা। মুখ টিপে হেসে বলে, কার জন্য এই নতুন দেশে আসতে পেরেছো—সেটা মনে রেখো!

বল কি কৃষ্ণা, সেটা মনে রাখব না! প্রতি মুহূর্তেই আমি তোমার কথা ভাবি। একটু থেমে যায়। আবার কৃষ্ণাবাঈয়ের হাসি-হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার জন্যই নতুন দেশে আসতে পেরেছি—এসব বললেই তো তুমি ফোঁস করে ওঠ। তাই মুখে কিছু বলি না।

খিল খিল করে হেসে উঠল কৃষ্ণাবাঈ। ভিখুর বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো। ক্ষীণ আলোয় যেমন করে পুঁথি পড়ে, তেমনি করে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি—তুমি খুব ভালো গো। বলেই ভিখুর ডান গালের একটা ছোট ফুস্কুড়ি একটু খুঁটে দিয়ে মৃদু গলায় বলল, জান আজকের এই রাত—এই মুহূর্তটির স্বপ্ন দেখেছি সেই কতদিন আগে থেকে—

সে কী গো! তুমি কি গোনাপড়া জান নাকি! চোখদুটো কুঞ্চিত করে গভীর আবেশে স্নিগ্ধ মুখখানার দিকে তাকালো ভিখু। বলল, তুমি জানতে আমরা এই নিশিরাতে পারস্যোপসাগরের তীরে বালুচরে এসে দাঁড়াব?

হ্যাঁ।

কী আশ্চর্য! আচ্ছা বল তো, আমাকে নিয়ে আর কি কি স্বপ্ন দেখেছো?

ভিখুর ছেলেমানুষী সরলতা দেখে হাসল কৃষ্ণাবাঈ। ম্লান হাসি। ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট গলায় বলল, সেসব কথা কি বলা যায়!

বল না—বল না লক্ষ্মীটি—বলতে বলতে কৃষ্ণাবাঈকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এল। ফিসফিস করে তার কানে কানে বলল, জান কৃষ্ণা, তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাব, কেন এত ভালোবাস আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয়!

কৃষ্ণাবাঈ কোন কথাই বলল না। বলতে পারল না। শুধু তীব্র একটা আবেগ ঢেউয়ের মতো তার বুকের ভেতরে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। চোখের পাতাত্মটো ভিজে গিয়ে চিক চিক করে উঠল। ভিখুর বুকে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে নিথর হয়ে বসে রইল। পরমস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল ভিখু, তুমি কাঁদছো কেন বল তো?

না, কিছু না—চল যাই—কাল আবার খুব ভোরে রওনা হতে হবে।

ভিখু যেন তার কথা শুনতেই পেল না। দূরে—বহুদূরে রাশি রাশি তারায় ভরা আকাশের গায়ে আঁকা অতিকায় পাহাড়ের দিকে চোখত্মটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, মাঝে মাঝে ভাবি, তোমার সঙ্গে আমার কী অদ্ভুতভাবে পরিচয় হলো, তুমি আমার জন্য কত করলে! একটু থামে, নিজের মনকেই যেন শুনিয়ে শুনিয়ে আবার বলে, ত্ম'জনে ত্ম'জনকে ভালও বাসলাম। কিন্তু—থেমে যায় ভিখু। যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে মুখে। ভিখুর সেই মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে অভিমানে ভারী—খুব ভারী হয়ে উঠল কৃষ্ণা-বাঈয়ের চোখের পাতাত্মটো। শুকনো গলায় বলল, তোমাকে ভালোবেসে ভবিষ্যতে কষ্ট পাব এই কথা বলতে চাও তো!

না-না, বলছো কি কৃষ্ণাবাঈ! তা কেন হবে—অপ্রতিভ হয়ে গেল ভিখু। অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে গাঢ় গলায় বলল, তবে আমার কি মনে হয় জান কৃষ্ণা—ভালোবাসাটাই বড় ত্মঃখের।

ধক করে উঠল কৃষ্ণাবাঈয়ের বুকের ভেতরটা। ভিখুর কথাটা যেন তার নিজেরই ঘা-খাওয়া জীবনের তটভূমি থেকে সাঁ-সাঁ বাতাসের মতো অনেক কান্নাকে বহন করে নিয়ে এল। কেউ আর একটা কথাও বলল না। বলতে পারল না। শুধু সেই নিশিরাতে জনমানবহীন বালুচরে তারাজ্বলা আকাশের নীচে ওরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল—বসে রইল প্রেম যে আনন্দের নয়—দুঃখের, এই কালজয়ী মহাসত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা কোন নিপুণ চিত্রকরের ছবির মতো।

হে—হে—বি—রাভিম্-(এস, চল, তাড়াতাড়ি যাই)—

হে—হে—বি—রাভিম্—ভোরের অন্ধকারে আচ্ছন্ন বুশায়ারের বাজারের চারদিকে গাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে কাফেলার যাত্রীদের অস্ফুট গুঞ্জন ফুটে উঠল। ইস্পাহানগামী ব্যবসায়ী দালালদের প্রত্যেকের কাছে যেয়ে যেয়ে বলছে রেজাক, সামান ঠিক ঠিক বাস্তান (বাঁধবে) করবেন।

জুদ্‌কুন্—জুদ্‌কুন্—জুদকুন্ (তাড়াতাড়ি)—আঞ্জা, আভেলী বাজারস্ত্ (যখন বাজার বসে যাবে) তখন কাফেলা নিয়ে বেরুনো যাবে না। হিলহিলে সাপের মতো লম্বা একটা লোক কাফেলার সর্দারকে বলল।

হঠাৎ সে ছুটে এল হাকিমসাহেবের কাছে। ভিখু আর বোরকা-পরা কৃষ্ণাবাঈয়ের দীঘল চেহারার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, সেলাম বাবুসাহেব—অল্‌হম্‌দুল্লিলা— আমি ইস্পাহানের বাজারে দালালী করছি বিশ বরষ ধরে।

তাতে কি হয়েছে? ভিখুর ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে।

ইস্পাহানের তামাম বাজারের আফগান, পাঠান, রুশী, আরবীয়, আর হিন্দুস্তানী সওদাগররা আমাকে বিশ্বাস করে। একটু থেমে বলল, আমি যার কাছে মাল বেচতে বলব, তার কাছে বিক্রি করলে আপনাদের বহুত নাফা (লাভ) হবে বাবুসাহেব।

আচ্ছা—আচ্ছা, ঠিক আছে। চলুন, ইস্পাহানে তো যাই, প্রয়োজন হলে আপনার সাহায্য নেব।

হ্যাঁ রে রেজাক—সাহাব (ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে) হওয়ার আগেই রওয়ানা হতে পারবি? না আমি নামাজটা সেরে

নেব? মক্কাফেরত হজযাত্রী এক মৌলানা হেঁকে বলল আর দূরে একটু একটু করে ফরসা-হয়ে-আসা পুবের আকাশের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে মেসেদের তসবী জপতে লাগল। চীৎকার করে বলল রেজাক, আমি কি করব হাজীসাহেব—আমি তো সওদাগরদের সেই কখন থেকে ইন্ টিফ্ল খায়েলী ফীর্জ অস্ত্ (দ্রুত কাজ করা) ইন্ টিফ্ল খায়েলী ফীর্জ অস্ত্ করতে বলছি।

আরে বাবা, এ হচ্ছে আমাদের বহুত মেহনতের সামান, স্তুটুরের পিঠে ভাল করে বাঁধতে হবে না? মোটা-সোটা বেশ গোলগাল চেহারার এক পারসিক সওদাগর মৌলানার দিকে চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে নেচে নেচে একটা ঘুরপাক খেয়ে বলল, সেই কথায় বলে না—

হালুয়াই কী দুকান
আর বাবাজী কো ফতদেহা

(মালের আসল মালিক থাকলে যেমন তার যত্ন হয়, তার অবর্তমানে অন্য লোকের হাতে দোকানের পণ্য তছনছ হয়ে যায়।)

আমাদের তো আর তা নয়—এ আমাদের খুনের সামান।

হো-হো করে হাসির ছররা ফুটল যাত্রীদের ভেতরে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হাজী। তীব্র উত্তেজনায় বুক অবাধ লুটিয়ে-পড়া পাকা দাড়ি-গুলো টেনে টেনে বলল, আরে মূর্খ, তোদের কি হয়েছে জানিস?

—আশরফী কী লুঠ করলে পর মোহর।

(স্বর্ণমুদ্রার মতো মূল্যবান সামগ্রী অর্থাৎ খোদার দিকে নজর নেই, তুচ্ছ পার্থিব জিনিসের দিকে তোদের নজর।)

আরে ভাই, বেরাদর, আমার জানেমন্—রেজাক, তোর কাফে-লাকে একটু তাড়াতাড়ি রওয়ানা করা আমার দিলজান্। দুম্বার চামড়ার কারবারী এক মাঝবয়সী আরবীয় সওদাগর ব্যাকুল হয়ে বলল, আরে সামকে জুল্মত্ (সন্ধ্যার অন্ধকার) হওয়ার আগেই দেমাভেন্দ কুহ্ পার হতে পারবি তো?

কেন চাচা, তোমার কী জীনের (ভূতের) ভয় হচ্ছে ? হো-হো করে হেসে বলল সেই রসিক পারসিক সওদাগর, দেমাভেন্দ কুহের আহ্রিমন্ (অপদেবতা) চাচার ঘাড় মটকাবে রে।

আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে এক স্নুটুরের পিঠে থাকব কৃষ্ণা। ভিখু কৃষ্ণার কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে।

আলবৎ। আলীসাহেবের সোনাদানার সেই বাক্সগুলোও আমার কাছে থাকবে তো, তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতেই হবে।

হঠাৎ ভিখুর নজরে পড়ে, সেই আবছায়া অন্ধকারে অনেকগুলো ছায়ামূর্তির জটলার মতো কাফেলার যাত্রীদের ভীড়ের ভেতরে ঘুরে ঘুরে হাকিমসাহেব কাকে যেন উৎসুক হয়ে খুঁজছে।

হাকিমসাহেব কাকে খুঁজছে কৃষ্ণা ?

হয়তো তার চেনাশোনা কোন লোক ইস্পাহানে যাচ্ছে কি না তাই দেখছে।

কিছুক্ষণ পর একটু যেন হতাশ হয়ে ফিরে এল হাকিমসাহেব। তার গম্ভীর আর চিন্তাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে সাহস করল না তারা।

পুবের আকাশে ভোরের রেখা জাগল। রেজাক তার সুদীর্ঘ কাফেলার সবচেয়ে আগের স্নুটুরের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে হেঁকে ধ্বনি তুলল, আল্লাহ্ আকবর।

আল্লাহ্ আক্‌বর—শতকণ্ঠের ধ্বনিতে আল্লার কাছে তাদের নিরাপদ যাত্রার জন্য ব্যাকুল অনুনয় ফুটে উঠল।

কাফেলা চলতে শুরু করল।

ডিং—ডং—ডিং—ডং—ডিং—ডং—সুষুপ্ত বুশায়ারকে সচকিত করে উটের পিঠে বাঁধা ঘণ্টা বেজে চলল।

কৃষ্ণা, আমরা তাহলে সত্যিই ইস্পাহানে যাচ্ছি !

আলবৎ। নিবিড় আবেশে ভিখুর হাতদুটো জড়িয়ে ধরল

কৃষ্ণাবাঈ আর কেমন স্নিগ্ধ চোখে ভিখুর হাস্যোচ্ছল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দেশ-দেশান্তরের পণ্যসম্ভার আর মানুষের বোঝা নিয়ে দুলে দুলে চলেছে শত শত উট। ভিখু তার উদাস চোখদুটো ছড়িয়ে দিল দূরে দিক্‌বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছাড়িয়ে সেই খেজুরগাছের নিবিড় কালো বন-রেখার দিকে। ওই খেজুরবন ছাড়িয়ে ওই যে দূরে—বহুদূরে অতিকায় ঘাতকের মুখের মতো বিশাল একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে—কি আছে—কি আছে তাব ওপারে! ইস্, এখুনি যদি সে ওই পাহাড় ছাড়িয়ে আরও দূবে—অনেক দূরে চলে যেতে পারতো! অসহ্য একটা অস্থিরতায় তার বুকের ভেতরটা যেন ছিঁড়ে পড়তে লাগল।

এই ও বেতমীজ কোথাকার! থেকে থেকে এক-একটা সারবানের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, ফরমান বরাদর (আদেশ পালন করবি। অথবা বাধ্য হবি) হয়ে চলবি।

এই পথ দিয়েই হয়তো আফানাসি নিকিতিনও ইস্পাহান থেকে বুশায়ারে এসে পারস্যোপসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। হঠাৎ বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছাড়া-ছাড়া গলায় বলল হাকিমসাহেব। কেন যেন দূরে পুবের রাঙা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, কে যে কিসের প্রেরণায় কখন ঘর ছাড়ে—

হাকিমসাহেব, মেহেরবাণী করে আপনার স্নুটুরটা পাশে নিয়ে আসতে বলুন সারবানকে! ভিখু বলে, তা না হলে আপনি কি বলছেন, শোনা যাচ্ছে না।

কৃষ্ণাবাঈয়ের চোখে অনুযোগ ঘনিয়ে আসে।

ভিখু হাসে।

হাকিমসাহেবের উট তাদের প্রায় পাশাপাশি চলতে থাকে। ভিখু বলল, প্রায় একশো বছর আগে এই যে রুশ-বণিক এসেছিল, তার কথা যতবার বলতে চেয়েছেন ততবার কোন-না-কোন বাধা এসেছে। এবার বলুন না!

হাকিমসাহেব যেন তার কথা শুনতেই পেল না। নিজের মনেই ডুব দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, মেসেদের মাদ্রাসার সেই মৌলানার কাছেই শুনেছিলাম, নিকিতিন রাশিয়ায় ফেরার পথে স্মোলেনস্কে মারা গিয়েছিল। শুনেছিলাম দেশে ফেরার পথেই শেমাখায় তাতার-দস্যুরা তাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল। একটু থামল, পরে বলল, আরও শুনেছি নিকিতিন নাকি পার্শী, আরবী আর তুর্কী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতো। কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা কথা বলেন নি মেসেদের মৌলানা, বুঝলে ভিখুভাই। হঠাৎ থেমে গেল হাকিমসাহেব। বিষাদের ছায়া থমথম করতে লাগল তার মুখে।

কী সেই কথাটা হাকিমসাহেব?

হাকিমসাহেব কোন কথা বলল না। গভীর চিন্তার ভেতরে যেমন মগ্ন হয়ে ছিল, তেমনিই রইল। কিন্তু ভিখুর কৌতূহলটা তাকে অস্থির করে তুলল। মাঝে মাঝে কথাবার্তা বন্ধ করে, গুম হয়ে যান কেন বলুন তো? ভিখুর গলায় বিরক্তির সুর ফুটে ওঠে।

কিছু একটা আছে হাকিমসাহেবের। কৃষ্ণাবাঈ চাপা গলায় ফিসফিস করে বলতে বলতে ভিখুর পিঠে একটা চিমটি কাটে।

জান ভিখুভাই, নিকিতিনের* জন্মস্থান টেভর শহরটা ছিল খুব সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু দু'শো বছর আগে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) মস্কোর অভ্যুত্থানের ফলে টেভর ম্লান হয়ে যায়। এই মধ্য-এশিয়া থেকে ভল্গা-উপত্যকার বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর পথের ওপরে ছিল জায়গাটা। একটু থামে হাকিমসাহেব। কিছুক্ষণ কি ভেবে বলে আবার, টেভর

*Nikitin, Afansiy : "India in XV Century" in "Voyages to India".

থেকে বলাবাহুল্য বুলজার, খাজার শহরও ছিল কাছাকাছি। তাই নিকিতিন ছোটবেলা থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশেই বড় হয়েছিল বলেই হয়তো ব্যবসার উদ্দেশেই সুদূর ভারতবর্ষে পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু—

কিন্তু কি ?

আছে ভিখুভাই—অনেক কিন্তু আছে, অনেক ভাববার আছে। রুশীয় সওদাগররা বেশির ভাগ যেত বোখারা, কি বড় জোর কাবুল পর্যন্ত। কিন্তু নিকিতিন দেশ-বাড়ি-ঘর ছেড়ে একেবারে ভারতের দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর পর্যন্ত পাড়ি দিল কেন ?

কেন, ব্যবসা করতে ?

না, ভিখুভাই, তা নয়। হাকিমসাহেব ডাইনে-বাঁয়ে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, বেশ, বিজয়নগরে না হয় ব্যবসা করতেই গিয়েছিল, ব্যবসায়ী কখনো খোরাসানী মুসলমান সেজে শহরের গরীব দুনো অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে ? তাদের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেয় ? গল্পগুজব করে ?

তার হয়তো আমাদের দেশের গরীব-দুঃখীদের ভালো লেগেছিল।

নিশ্চয়ই। ভালো লেগেছিল মানে—মেসেদের মৌলভীর মুখে তার বিবরণ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যেতে ভিখুভাই। নিকিতিন গরীব মুসলমানদের চেয়েও নাকি হিন্দুদের বেশি পছন্দ করতেন—তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন অতি আপনার জনের মতো। সেই বিচিত্র রুশীয় সওদাগর নাকি সাধারণ জনতার ভীড়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখতো রাজকীয় শোভাযাত্রা।

কোথাও হয়তো রথযাত্রা কি রাসপূর্ণিমার মেলা হচ্ছে - তিনি ঢুকে পড়তেন মেলায়। কোন মন্দিরে সান্ধ্য আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে। মন্দিরের চাতালে বসে ছেলেপুলের দল হুল্লোড় করে প্রসাদ খাচ্ছে। নিকিতিনও বসে পড়ত তাদের পাশে।

আশ্চর্য তো ! ভিখুর মুখ থেকে অস্ফুটস্বর বেরিয়ে এল।

শুধু কি তাই? নিকিতিন ভারতের রাজরাজড়া আর ধনী-বড়লোকদের অগাধ ঐশ্বর্যের পাশাপাশি গরীব হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের করুণ ছবিও দেখেছিলেন। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় হাকিমসাহেব—বিগত শতাব্দীর জনদরদী মহৎ ও উদার মনের সেই রুশীয় ব্যবসায়ীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তার চোখদুটো অগাধ হয়ে ওঠে। আবার উদ্দীপ্ত হয়ে বলে, তিনি দেখেছিলেন, বিজয়নগরের পথে পথে বিদেশী মুসলমান সৈন্যরা ঝলমলে পোশাক পরে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, আর তারই পাশে খালিপায়ে দুপুরের সেই চাঁদিফাটা রোদ মাথায় করে হেঁটে হেঁটে চলেছে পথচারী সাধারণ মানুষেরা।

গরীব দুনো সাধারণ মানুষের জন্য নিকিতিনের এত দরদের কারণ কি হাকিমসাহেব? ভিখুর চোখে বিস্ময় ছটফট করে; উৎসুক হয়ে আবার বলে, আর মুসলমান রাজপুরুষদের প্রতি এত ঘেন্নারই বা কারণ কি?

কেন ঘেন্না করবে না বল ভিখুভাই? বিজয়নগরের রাজা তখন মহম্মদ গভন। সারা ভারতজুড়েও তখন চলছে মুসলমান রাজত্ব; তাই নিকিতিনকে খোরাসানী মুসলমানের ছদ্মবেশ নিতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও তাদের হাত থেকে কি নিস্তার পেয়েছিল?

কেন, কি করেছিল?

কি করে নি তাই বল? একবার বিজয়নগর রাজ্যের কোন শহরের ফৌজদার তাকে চিনে ফেলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার রুশীয় ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করেছিল আর জোর করে জিজিয়া কর আদায় করে নিয়েছিল। থেমে যায় হাকিমসাহেব। নিকিতিনের জন্যে ভিখুরও মন গভীর সহানুভূতির রসে ভিজে ওঠে।

বেলা বাড়ে।

কাফেলা চলে।

বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তার ঘণ্টার শব্দ—ডিং-ডং-ডিং-ডং-ডিং-ডং—

যাত্রীদের খুক খুক হাসির ফাঁকে ফাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো কথাও শোনা যায়। সেই তুস্বার চামড়ার কারবারী আরবীয় সওদাগর কাকে যেন কি প্রসঙ্গে ভার-ভার গলায় বলে, আরে ভাই, যে 'মিশকিণ' (গরীব) তার দুঃখ চিরকাল। সেই যে কথায় বলে না—কাহার দরবেশ বরজান দরবেশ—

বুঝলে ভিখুভাই, টেভরের অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীদের তুলনায় নিকিতিনের পরিবার তেমন সঙ্গতিপন্ন ছিল না। হাকিমসাহেব আস্তে আস্তে বলে, বেশ গরীবই বলতে পার, তাই দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তার দরদ খুব স্বাভাবিক। আর—

আর কি হাকিমসাহেব?

ছোটবেলা থেকে দেখেছিলেন মোগল-তাতার দস্যুরা টেভরের আশপাশে দল বেঁধে নেকড়ে বাঘের মতো রাশিয়ার সীমানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠতরাজ, খুনজখম করে চলে যেত। তাই তার অবচেতন মনে মুসলমানদের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিলই।

কিন্তু হাকিমসাহেব, একটা কথা বুঝতে পারছি না! ভিখু চিন্তিত হয়ে বলে, সাধারণতঃ একটু অবস্থাপন্ন সওদাগররাই দূর বিদেশে বাণিজ্য করতে যায়, কিন্তু আফানাসি নিকিতিন অত দূরে—

ঠিক এই কথাই তো আমি একটু আগে বলছিলাম ভিখুভাই। দপ করে জ্বলে উঠল হাকিমসাহেব চোখের তারাদুটো। তীব্র উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে বলল, কিসের প্রেরণায় ঘর ছেড়ে দূর বিদেশে গিয়েছিল নিকিতিন—কেন মন্দিরে, মসজিদে, মেলায় সাধারণ মানুষদের ভীড়ে কি খুঁজতেন তিনি? হঠাৎ গলাটা একটু নামিয়ে ভিখুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, এমন কি বেশ্যাপল্লীতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কামনার তাড়নায় নয়, তাদের কাছে বসে তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নিতেন, আবার কখনো-সখনো তাদের ভেতরে কেউ গান-টান শুনিয়ে কি নাচ দেখিয়ে তাকে খুশি করতে চাইলে নিকিতিন

হা-হা করে নিষেধ করে বলতো, না-না, এসব গান নয়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার গান গাও—

আশ্চর্য !

না, একটুও আশ্চর্য নয় ভিখুভাই, তারও মনে কোন জ্বালা—ভয়ঙ্কর কোন জ্বালা ছিল। হয়তো কোন দুঃস্মৃতি আর দুঃখই তাকে ঘরছাড়া করেছিল। ভিখু লক্ষ্য করল তীব্র ব্যথার উজান ঠেলে হাকিমসাহেব আর কিছু বলতে পারল না। কৃষ্ণাবাঈয়েরও নজরে পড়ল কেন যেন গভীর ব্যথার ছায়া ফুটেছে হাকিমসাহেবের চোখে! তাদের মনে হলো—মনে হলো, ঠিক এই মুহূর্তে হাকিমসাহেবের বুকের ভেতরে যে বেদনার সমুদ্র উথলে উঠেছে সেটা শুধুই নিকিতিনের ঘা-খাওয়া জীবনের জন্য নয়।

এই ও বেয়াকুফ—কোন স্টুরের সারবান চেঁচিয়ে ওঠে, ফরমান্ বরাদর না করবি তো তোর খুন নেব।

কারো কোন অসুবিস্তা কি 'মুস্কিলি' হলে খোলসা করে বলবেন বাবুসাহেব। হেঁকে বলে জাম্মাল রেজাক, আবার নিজের চওড়া বুকে এক থাবড়া মেরে বলে, এই মীর্জা আব্দুল রেজাকের খুশ্‌নাম আছে কাসান কাশবীন (ইস্পাহানের অন্তর্গত ব্যবসাকেন্দ্র) থেকে শুরু করে তামাম ইস্পাহানে—

হ্যাঁ রে রেজাক—তুই তো খুব বাহাদুর 'জাম্মাল' আছিস, করুণ গলায় বলল সেই আরবীয় সওদাগর, তা তুই দেমাভেন্দ কুহ্‌টা সারি সাহবের (সন্ধ্যার আগে) পার হতে পারবি তো রে বাপজান ?

হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল সেই হাসিখুশি পারসিক সওদাগর। হাসির রেশ টেনে টেনে বলল, আরে চাচাকে এবার আহ্রিমন ঘাড় মটকাবে নির্ঘাত—

আরে হাওয়াইজা কুহ্ পার হতে হতেই তো ঘুরব (সূর্যাস্ত) হয়ে যাবে। কে আর একজন সায় দিল তাকে।

ওরে মূর্খের দল, হাজীর তসবীর ওপরে আঙুল থেমে গেল, দেমা-

ভেন্দ কুহতে শুধু আহ্রিমনই থাকে না, ওটা আহুর মজ্দার (মঙ্গলময় ঈশ্বর) ডেরা, তা জানিস? চীৎকার করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, দেমাভেন্দের এক অন্ধকার গহ্বর (গুহায়) আহুর মজ্দার তার রুশান (আলো) জ্বালিয়ে রাখে—সেই রুশান বহুদূর থেকে দেখা যায়। একটু থামে মক্কাফেরত হাজীসাহেব। দূরে ফাঁকা মাঠের ওপর থেকে বয়ে আসা হু-হু বাতাসে তার সাদা দাড়িগুলো ফুরফুর করে ওড়ে। মেসেদের তসবী জপতে জপতে আবার বলে, তোরা ব্যবসার ধান্দাতেই জিন্দগী নাদ্রদ্ তু-লি উমর (দীর্ঘ জীবন) কাটিয়ে দিলি—

ডিং-ডং-ডিং-ডং—

কাফেলা মন্থর গতিতে চলতে থাকে।

দূরে, অনেক দূরে করূণ নদীর নীলিম আভাসে কালো দিগন্তে হারিয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে দিক্‌বিস্তীর্ণ প্রান্তরের এখানে-সেখানে খেজুরগাছগুলো বাতাসে ডাইনীর মতো মাথা নাড়ে।

মাঠে মাঠে যাযাবর উপজাতিদের ঘোড়া, গরু, উট চরে বেড়াচ্ছে। ভিখুর চোখের পলক পড়ে না। সে দু'চোখ ভরে দেখছে নতুন দেশের বিচিত্র দৃশ্য। তার বুকের রক্তে বাজছে তীব্র উল্লাসের কলধ্বনি।

আরে তোরা গুণাহ্ (পাপ) আর নেকের (পুণ্য) কি বুঝবি? কাফেলার যাত্রীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে হাজীসাহেব, তাহলে শোন্ তোদের একটা কিস্সা (গল্প) বলি—

বলুন—বলুন হাজীসাহেব, তা নাহলে এতটা রাহ্ যাব কি করে?

শোন্, এক গৃহস্থের দুই ছেলে। এক ছেলে গিয়েছিল মসজিদে নামাজ পড়তে। আর এক ছেলে গিয়েছিল কুস্থানে—

কী চাচা, তার কি জিন্দার বাড়ি যাতায়াত ছিল? পিছনের স্টুর থেকে সেই মোটা-সোটা চেহারার পারসিক ব্যবসাদার হেঁকে বলল, ওসব তো উমর কি ধরম্—

চুপ কর, কথার ভেতরে ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস না। খেঁকিয়ে উঠল

হাজীসাহেব, তুই ইস্পাহান, তেহরানের বাজারে বাজারে পুস্তিন বিক্রি করে বেড়াস তুই বেহেস্ত্ দোজেখ্ গুণাহ্ নেকের কি বুঝবি রে ?

ওর কথা ছেড়ে দিন—আপনি বলুন।

শোন্, যে ছেলেটা মুয়াজ্জীন (যে নামাজের জন্য ডাক দেয়) হয়ে মসজিদের ছাদে উঠে চিৎকার করে—

হাইয়া আলাছ ছালাহ্
হাইয়া আলাছ ছালাহ্
হাইয়া আলাল্ ফালাহ্
হাইয়া আলাল্ ফালাহ্

বলে বেশ পরিপাটি করে নিখুঁতভাবে আজানের ডাক দিল – সেই ছেলেটাই বাড়ি ফেরার পথে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল। বোধ হয় কোন দুস্তের বাড়িতে তামাক-টামাক খেতে গিয়েছিল। হঠাৎ জ্বলন্ত টিকের টুক্রো পড়ে তার কামিজের খানিকটা গেল পুড়ে।

আহা, কী বদ্-নসিব্ (দুর্ভাগ্য) রে বাবা! বাতাসে ভেসে উঠল অনেকগুলো আক্ষেপসূচক শব্দ।

আর যে ছোঁড়াটা জিন্দা-ই-হাজার (বারবণিতা) নিয়ে বেশ ফুর্তি-টুর্তি করে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে আসছিল, সে রাহের ওপর কী যেন একটা পড়ে থাকতে দেখল। সে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে দেখল একটা থলি—সেই থলি বোঝাই আশরফী।

গুণাহ্ (পাপ) কাজের জন্য খুশ্-নসিব্ (সৌভাগ্য)! বিস্ময়ের ঝড় বয়ে গেল কাফেলার যাত্রীদের ভেতরে।

এক ভাই এল কামিজ পুড়িয়ে মুখ কালো করে, আর এক ভাই আশরফীর তাঞ্জাম (থলি) হাতে নিয়ে খুশ্ মেজাজে এল বাড়িতে। হাজীসাহেব যন্ত্রের মতো তসবী জপে আর বলে যায়, দুই ভাই-ই গেল এক কহ্নতে্র (গণক, ভবিষ্যৎ বক্তা) কাছে। আজান দিয়ে এসেছে যে, সে বলল, ঠাকুর, এ রকম কেন হলো বল তো ? আমি রীতিমত মুয়াজ্জীন হয়ে আজান দিয়ে এলাম, আমারই

কামিজ গেল পুড়ে, আর ও 'জিন্দা' নিয়ে ফুর্তি করে এল, ও পেল আশরফী!

কহ্‌নত্‌ কী বলল?

শোন্‌ না—হাত তুলে চুপ করতে বলে হাজীসাহেব। আবার বলে, কহ্‌নত্‌ মাটিতে অনেক আঁকজোক করে, চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ কি ভেবে বলল, শোন, তুমি জিন্দেগী নাদরদ্‌ তুলি-উমর ধরে যত গুনাহ্‌ কাজ করেছো তাতে তোমার সমস্ত দেহই একেবারে পুড়ে ঝলসে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মুয়াজ্জীন হয়ে আজান দিয়ে এসেছো। ওই যে 'নেক' কাজটুকু করে এসেছিলে, তাই প্রাণে বেঁচে গিয়েছো, শুধু কামিজের ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেল।

আর যে ছোঁড়াটা জিন্দা-ই-হাজারে নিয়ে শাম্‌ কাটিয়ে এল, তাকে?

আঃ বলছি তো, ধমকে উঠল হাজীসাহেব। দুপুরের খর রোদে জ্বলে-যাওয়া ধূসর আকাশের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য আল্লাহের দিকে তাকিয়ে খওনদান (প্রার্থনা) জানিয়ে বলল, সেই বেতমীজ ছোঁড়াটাকে কহ্‌নত্‌ বলল, তুমি জিন্দেগীভর অনেক 'নেক' কাজ করেছিলে, আল্লাহ্‌ তোমাকে এই রাজ্যের শাহানশাহ বাদশা করে দেবে ঠিক করেছিল, কিন্তু ওই যে 'জিন্দা' সংসর্গ করে এসেছো, সেই গুণাহের জন্য তখৎ-এ-তাউস আর পেলে না, বাদশাহও হলে না, পেলে শুধু এক তাঞ্জাম আশরফী।

তোবা—তোবা—ইস্পাহানের দালাল উচ্ছ্বসিত হয়ে চীৎকার করে বলল, খু-উব আচ্ছা কিস্‌সা হাজীসাহেব!

বেলা পড়ে এল। কাফেলা এসে দাঁড়ালো মুহম্মেরার (এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম) সরাইখানার সামনে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে কাফেলা আবার রওনা হবে। জাম্মাল মীর্জা আব্দুল রেজাক হেঁকে বলল, সুটুরের পিঠে সামান যেমন বাস্তান্‌ করা আছে তেমনি থাকবে।

হ্যাঁ জাম্মাল ভাই, স্টুরগুলোকে দানাপানি খাইয়ে আর আমাদের নাস্তা সেরে নিয়েই রওয়ানা হয়ে পড়বে, বুঝলে। বাঁকা চোখে ভিখুরদের স্টুরের দিকে তাকিয়ে দালাল একান্ত অন্তরঙ্গের মতো বলল, সামনে পড়বে খেরকিমিশান, মেন্দেলি, দৌরিয়াকান 'বোয়াত' (গ্রাম) আর তারপরেই দেখা যাবে ধু-ধু করছে দশ্‌ত্‌ (মরুভূমি)।

আরে সব্বোনাশ, তারপরেই তো দেমাভেন্দ কুহ্‌! আঁতকে উঠল আরবীয় সওদাগর। হাততালি দিয়ে বলে উঠল রসিক পারসিক ব্যবসায়ী, এবার দেমাভেন্দের জোহকের (দৈত্য) সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যাবে চাচা।

দুশ্চিন্তার ছায়া নামল বহুদর্শী ইস্পাহানী দালালের এবড়ো-খেবড়ো মুখে। কেমন অস্পষ্ট গলায় বলল, শুধু জোহক্‌ নয়—ওই কুহের রাহতে আরও ভয় আছে।

কাফেলার যাত্রীদের চোখে চোখেও ভয় শিউরে উঠল মুহূর্তের জন্য। পরম আবেশে ভিখুর হাতে হাত রেখে কৃষ্ণাবাঈ চাপা গলায় বলল, তুমি কাছে থাকলে আমার আর কিছুতেই ভয় নেই।

ভিখু কোন কথা বলল না। তার আবার নজরে পড়ল, সেই বুশায়ারের সরাইখানার ফাঁকা চত্বরে আবছা অন্ধকারে হাকিমসাহেব কাফেলার যাত্রীদের ভীড়ের ভেতরে যেমন কাউকে খুঁজছিল, ঠিক তেমনি করে দিনের আলোয় তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাকে খুঁজছেন হাকিমসাহেব? এবার আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না!, আপনাকে বুশায়ারেও—

সিমোনভকে—যাত্রীদের ভীড়ের দিকে চোখ রেখেই বলল হাকিমসাহেব। কৃষ্ণাবাঈও উৎসুক হয়ে বলল, সিমোনভ কে হাকিমসাহেব? সে কি ব্যবসাদার?

হাকিমসাহেব কোন কথা বলল না। তার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন

ফুটে উঠল। তার গম্ভীর আর কঠোর মুখের দিকে তাকিয়ে তারা আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

মুহম্মেরা থেকে কাফেলা রওনা হওয়ার সময়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। কাফেলার সামনে দাঁড়িয়ে যেই রেজ্জাক ধ্বনি তুলল, বল ভাই আল্লাহ্ আকবর—আশ্‌হাদু আল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্—আর চলতে শুরু করল কাফেলা, অমনি সরাইখানার গায়ে আছড়ে পড়ল একটা ব্যাকুল চীৎকার—রে—জ্জা—ক ভা—ই—আগা-জান—দিলজান—একটু—একটু দাঁড়িয়ে যাও ভাই—মেহেরবাণী করে একটু—দাঁ—ড়ি—য়ে যা—ও—

রওনা হওয়ার মুখে এ কী উট্‌কো যন্ত্রণা রে বাবা! যাত্রীদের ভেতরে বিরক্তির গুঞ্জন উঠল। সরাইখানার সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এল একটা মাঝবয়সী লোক। সঙ্গে কুড়ি-বাইশ বছরের একটা মেয়ে। তার হৃষ্টপুষ্ট দেহে যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল লোকটা, রেজ্জাক, দেখলাম তোর কাফেলা যাচ্ছে, তাই এলাম। শোন্ রেজ্জাক, আমার দিলজান, তুই জেনানাটাকে ইস্পাহানে নিয়ে যেয়ে বাজারে বিক্রি করে দিস তো।

ও তোমার কে হয় মুস্তাফা?

কে আবার—আমার পাঁচনম্বর 'সিগা' (অল্পদিন বিয়ে-করা বৌ)। বিরক্ত হয়ে মুহম্মেরার জমিদার খানদানী আর খুশ্‌বখত্ (অবস্থাপন্ন) মুস্তাফা বলল, ইস্পাহানের, মানে শহর-বাজারের মেয়ে যেমন হয় আর কি, আদব-কায়দায় একেবারে কেতাদুরস্ত, নাচতে পারে, গাইতে পারে—কিন্তু ঘরের কাজকম্ম কিছু জানে না। ও আপদ রেখে আমি কি করব! একটু থেমে সুটুরের পিঠে বোরকাপরা কৃষ্ণাবাঈয়ের রাঙা টুকটুকে সুডোল পাদুটোর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, তার চেয়ে ও যেখানকার মাল সেখানেই—

জুদ্‌-কুন্—জুদ্‌-কুন্—জুদ্‌-কুন্—দেমাভেন্দ কুহের ভয়ে

আরবীয় সওদাগর তাড়া দেয়। জাম্মাল আর কথা বাড়ায় না। তার নিজের স্তুটুরের পিঠে মেয়েটিকে চাপিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে।

ডিং-ডং—ডিং-ডং—ডিং-ডং।

ইস্পাহানের বাজারে বিক্রি-হতে-যাওয়া সেই ইরানী মেয়েটিকে দেখে ভিখুর মনে পড়ল—মনে পড়ল নিমাসরাই থেকে গৌড়ে যেতে রাস্তার বাঁদিকে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার কথা। এক-একদিন হু-হু উত্তুরে বাতাসে তার লাল লাল ফুলের পাপড়িগুলো ঝর ঝর করে ঝরে পড়তো সড়কের ওপরে। সেই রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়ার একটি পাপড়িই যেন বাতাসে উড়ে এসে পড়েছে রেজাকের উটের পিঠে। পরনে খাটো লাল রঙের ঘাগরা। বাতাসে আর উটের চলার তালে তালে দুলে দুলে উঠছে ঘাগরার নীচের দিকটা। মনে হয়, ওটা যেন ওর গায়ের পালক। নিটোল দুটো পায়ের পাতা যেন রক্তপদ্মের দুটো পাপড়ি। রুক্ষ বেণী ঝুলছে কোমরের নীচ পর্যন্ত। গায়ে বেগুনী জামা, চুড়িদার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত। মাথায় কপাল চেপে সবুজ রুমালের ফেট। তার নীচে লালচে মুখ, টিকালো নাক আর দু'পাশে সুর্মাটানা ডাগর দুটো চোখে কাস্পিয়ান সমুদ্রের নীলিম আভাস। কিন্তু—

মেয়েটি ভিখুর দিকে তাকাতেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার মনে হলো, তীব্র রোদে যেন কোন আয়না ঝকমক করে উঠল। একটা অস্বস্তি ধোঁয়ার মতো একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ল তার চেতনার ভেতরে। আস্তে আস্তে বলল, মেয়েটা বোরকা পরে নি কেন কৃষ্ণা?

দেহাতী মেয়েরা কাজকম্মের সুবিধার জন্য পরে না, আর—হঠাৎ কেন যেন চুপ করে গেল কৃষ্ণাবাঈ। দুর্ভাগিনী সেই মেয়েটির মিষ্টি চেহারার দিকে তাকিয়ে ভার-ভার গলায় বলল, আর শুনলে তো—ও তো ইস্পাহানের বাজারে বিক্রির পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়, তার আবার বোরকা!

আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে এল দিগন্ত। আর দূরে—অনেক দূরে সেই কাজলকালো উত্তর দিগন্তের মাঝখানে দেখা গেল সাদা কুয়াশার রেখার মতো বরফে ছেয়ে থাকা দেমাভেন্দ পাহাড়ের চূড়া।

ওই যে—ওই যে দেমাভেন্দ কুহ্—কাফেলার যাত্রীদের ভেতরে কলগুঞ্জন উঠল। কুকুরের কান্নার মতো অদ্ভুত শব্দ করে বলল আরবীয় সওদাগর, সেই কুহের সামনেই সাম হয়ে গেল, হায় আল্লাহ্!

ডিং-ডং—ডিং-ডং—

কাফেলার বেগ বাড়ে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ পেয়ে উটগুলো তাদের চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। ভিখুর কানে আসে ইস্পাহানের দালাল আর হাসিখুশি সেই তুম্বার চামড়ার কারবারীর ভেতরে ওই মেয়েটাকে কেন্দ্র করে খুব গল্প জমে উঠেছে।

বহুত হাসিন আছে তো মুস্তাফার 'সিগা'! তা ওকে বেচে দিল কেন?

দালালের চোখদুটো দপ করে জ্বলে ওঠে। অদৃশ্য মুস্তাফার উদ্দেশে একটা অশ্লীল গালাগাল করে বলে, তুমি জান, চান্দ্ আন্দারুন্ দারাদ্ (কত গণ্ডা বিবি আছে ওর)? একটু থেমে আবার সে বলে, আরে বাবা, আসল ব্যাপার হচ্ছে ইস্তিসার (বংশ-বিস্তার)।

তাজ্জব! অমন খুশ্-মঞ্জর (সুন্দরী) মেয়ে হামিলা (সন্তানসম্ভবা) হয় নি?

তা মুস্তাফা ভাইয়ের সব ঠিকঠাক আছে তো?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা নাহলে ওর জা-নি বুজুরুগ্ (প্রধান বিবি) কি করে দু'গণ্ডা বাচ্চা পয়দা করেছে?

শোন, শোন, এই ইস্তিসারের কথায় একটা মজাদার 'কিস্‌সা' মনে পড়ে গেল। স্ফূর্তিবাজ সেই পারসিক সওদাগর বলতে শুরু করে, শোন ভাই, এক গাঁয়ে থাকতো মাদারজান (মা) আর ছেলে। খুব বদ্-নসিব্ তাদের। বাপজান বেহেস্তে চলে গেছে। কায়ক্লেশে

তাদের দিন কাটে। ছেলেটার এক আম্মু (কাকা) তাদের মুভাজ্জাবাত্ (দেখাশোনা) করতো। মা-র মনে সুখ নেই। ছেলেটা একেবারে আবলাহ (বোকা), যাকে বলে একেবারে আস্ত আহম্মক।

কি রকম ?

আরে শোনই না। গাঁয়ের লোক বলল তার মাকে, ছেলের সাদী দিয়ে দাও, তাহলে যদি ওর আহম্মুকী একটু কমে। কথাটা মাদার-জানের মনে ধরল। দিল সাদী। বৌ এল ঘরে। মা বলল ছেলেকে, বাবা, তুমি বৌ নিয়ে ঘরে খুফতান্ (শুয়ে থাকো) কর, আমি বাইরে বারান্দায় থাকব। সে কী মাদারজান! ছেলে যেন আসমান থেকে পড়ল, বলল, বৌ কি এমন খানদানী ঘরের বেটী এসেছে যে, তাকে ঘরে শুতে দিতে হবে ?

বাবা, ইস্তিসার করতে হবে। সাদী হলে একসঙ্গে থাকতে হয়। এসব কথা জেনানা হয়ে মুখ ফুটে আর কি করে বলে মাদারজান! তবুও ছেলেকে বুঝিয়ে ঠারেঠুরে বলে, বাবা, জান্-বুর্দা (বিবাহিত) হলে বৌ নিয়ে শুতে হয়। একটু থেমে লজ্জার মাথা খেয়ে বলে, তা নাহলে ইস্তিসার হবে কেমন করে ?

ব্যাটা পয়লা নম্বরের আহম্মক—শ্রোতারা ফিসফিস করে।

কিছুতেই গুণধর ছেলে আর মাথা কাত করে না দেখে মরীয়া হয়ে বুড়ী বলল, আরে আবলাহ, তুই মেয়েটাকে নিয়ে খুফ্তান না করলে ও শিকামদার (সন্তানসম্ভবা) হবে কি করে ? ছেলেপুলে হবে কি করে ?

বা! আমি ওকে নিয়ে শুলেই ছেলে হবে! একেবারে নিরেট আবলাহটা খেঁকিয়ে উঠল বুড়ীর ওপর। তারপর মা-র ওপর গোঁসা করে পা আছড়ে বাইরে চলে যেতে যেতে আবলাহটা কি বলেছিল জান ? থামল পুস্তিনের ব্যাপারী।

কি—কি ???

বলেছিল, আমি তো পুরো চারবছর বাইরে আম্মুর কাছে শুতাম, আমার কয় গণ্ডা ছেলে পয়দা হয়েছে ?

হাসির রোল পড়ে গেল কাফেলায়।

ভিখুও হাসতে হাসতে কৃষ্ণাবাঈয়ের পিঠে মৃদু চাপ দেয়। বোরকার আড়ালে খিল খিল করে হাসতে হাসতে সে বলে, লোকটা কিন্তু খুব রসিক।

আচ্ছা, দালালটা মাঝে মাঝে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে ? হঠাৎ ভিখু তাদের পিছনের উটের পিঠে ইস্পাহানের দালালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, লোকটার চালচলন একটু যেন কেমন কেমন !

আরে না-না, ওরও হয়তো দেমাভেন্দের জীনের ভয় আছে। কৃষ্ণাবাঈ হেসে ভিখুর দুর্ভাবনা উড়িয়ে দেয়। হাকিমসাহেব নির্বিকার।

দেখতে দেখতে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। ওরা পার হয়ে গেল খের কি মিশান, পার হলো দৌরিয়াকান। তারপরেই দেখা গেল দশ্‌তের অভিশপ্ত বালির বিস্তার। মরুভূমির ওপর দিয়ে বয়ে-আসা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকটা তাদের চোখে-মুখে আছড়ে পড়তে লাগল চাবুকের মতো। রাস্তার পাশে পাশে কলম্ (পপলার জাতীয়) গাছের নীচে নীচে যেন এক-একটা অতিলৌলিক ছায়া কেঁপে উঠতে লাগল থরথর করে।

ওরে—ও রেজ্জাক, আমার যে কেমন ভয়-ভয় করছে বাবা ! আরবীয় সওদাগরের চিঁ-চিঁ গলার স্বর শোনা যায়, এইসব আন্ধেরা সা-রি সহবে শুধু আহ্রিমন নয়, জোহক্ নয়, আঙ্গরামাইন্যু নয়—(জোহকের মতো আর এক অপদেবতা) আল্ও আসে।

আল্ আবার কে ? যাত্রীরা উৎসুক হয়।

ওরে বাবা ! শুকুর অল্‌হম্‌দুলিল্লা ! তার কথা আমি এই দশ্‌তের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বলতে পারব না।

আমরা তো সবাই আছি, বলুন না চাচা, ভয় কী ?

শোন, আল্ হলো গিয়ে মানুষের মাজারত (অনিষ্টকারী) অদ্ভুত এক দৈত্য। আমার নানী বলতো, তার এলাকা নাকি পশ্চিমে কি একটা সাগর আছে, কৃষ্ণসাগর না কি যেন, সেইখান থেকে একেবারে আর্মেনিয়া হয়ে কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে আস্ত্রাখান নামে নাকি একটা শহর আছে, সেই পর্যন্ত। তার নাকি যেমন বদ্-গিল (কুৎসিত) চেহারা, তেমনি কুয়াবীন্ (খুব খারাপ) তার স্বভাব।

চেহারাটা কেমন ?

তার দেহের ওপরের দিকটা মানুষের মতো আর নীচের দিকটা জানোয়ারের মতো। মাথায় আবার দুটো বড় বড় শিং। শিং দুটোর পিছনে রুক্ষ চুলের গোছা। গোটা দেহটা সাপের মতো পিছল। বড় বড় আঁখ (চোখ) দুটো যেন দুটো আফ্রুখ্তান্ (আগুনের পিণ্ড)।

কাফেলার সওয়ারীদের মুখে কথা নেই।

সামনে মরুভূমি। তারপরেই পাহাড়। এই অন্ধকার রাত। সঙ্গে এত মেহনতের সামান। অজানা আশঙ্কায় তাদের বুক টিপ টিপ করে। তবুও তারা শুকনো গলায় বলে, সেই আল্ মানুষের কি অনিষ্ট করে ?

লাইলাহা—ইল্লাল্লাহ্—আমি বলতে পারব না—মাফ কর। তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বুড়ো যেন আর্তনাদ করে ওঠে। কেউ আর কিছু বলে না।

ডিং—ডং—ডিং—ডং—একটানা সেই ঘণ্টাধ্বনিও তাদের কানে হাঁতুড়ি পেটার বিশ্রী অস্বস্তিকর শব্দের মতো মনে হতে লাগল। শুধু তসবী জপতে জপতে হাজীসাহেব হেঁকে বলল, আরে মূর্খ, তোরা রসুলাল্লাহের ওপর বিশ্বাস রাখ রে—শোন্, মনে রাখিস—

চূণ আহঙ্গে রফ্তন কুনদ্ জানে পাক্,
চি বর তখৎ মুরদন চি বর্ সরে খাক্ ?

আরে, মৃত্যু যখন হওয়ার তখন হবেই, তা সে তুমি সিংহাসনেই থাক আর পথের ধুলোতেই থাক। রাতের অন্ধকারে সেই নির্জন মরুপ্রান্তরে হাজীসাহেবের কথাগুলোর ভেতরে কিন্তু অমোঘ মৃত্যুর কাছে অসহায় মানুষের সেই নিরুপায় আর করুণ দীনতাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

দেশ-দেশান্তরের মূল্যবান সামগ্রীর পসরা বহন করে রেজাকের কাফেলা খুদাতালার দয়ায় নির্বিঘ্নে অতিক্রম করল মরুভূমি। ভিখু অপলক চোখে পিছনে ফেলে-আসা রাতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই বিশাল মরুবিস্তারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, সমুদ্র, মরুভূমি, পাহাড় কত কি দেখলাম—সব—সব তোমার জন্য কৃষ্ণা!

ছি! বল খুদাতালার জন্য। নিবিড় আবেশে ভিখুর হাতদুটো টেনে নিজের হাতের ভেতরে নিল কৃষ্ণাবাঈ।

ভিখু কোন কথা বলল না। মনের ভেতরে সারি সারি উঁকি দিয়ে গেল কতগুলো মুখের মিছিল। কেমন ঘষা ঘষা ছবির মতো ম্লান আর অস্পষ্ট সে-সব মুখ; নসীবন, জুলিয়াবিবি আর তার মা। মুহূর্তের জন্য তার বুকের ভেতরটা একটু খচ খচ করে উঠল। কিন্তু দূর আকাশে রাত্রির বাতাসে স্নানকরা ঝাঁক ঝাঁক উজ্জ্বল তারার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হলো, মনে হলো - যেন অনেক, অনেকগুলো বছর আর অনেক বয়সের দুঃস্মৃতি ভুলে গিয়ে সে একটা উজ্জ্বল জীবনের ভেতরে অবতরণ করেছে।

ডিং—ডং—ডিং—ডং—ডিং—ডং—

সামান-উমান এবার দেখে নিন ঠিক বাস্তান আছে কিনা! সুটুর এবার কুহে উঠবে। জাম্মাল হাঁকে—

আল্লাহ্ আকবর—আশ্হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্—

শক্ত করে দড়ি ধর ভিখু। হাকিমসাহেব সতর্ক করে দেয়, এখন কিন্তু পাহাড়ের চড়াই-উৎরাইতে উঠবে।

যেই কাফেলা সেই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথের একটা বাঁকে পৌঁছল, অমনি ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা।

হঠাৎ উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ইস্পাহানের বাজারের সেই দালাল, আর মুখে হাতচাপা দিয়ে তীব্র শব্দে শিষ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রগাঢ় নিস্তব্ধ গিরিপথকে সচকিত করে বেজে উঠল ঘোড়ার খুরের শব্দ—খট্—খট্—খট্!

রাহজান্—রাহজান্—রাহজান্—মুহূর্তে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল কাফেলার যাত্রীদের ভেতরে। কিন্তু সওয়ারীরা বেশির ভাগই বহুদর্শী সওদাগর। তাই তারা কেউ তলোয়ার, কেউ বল্লম, যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হলো আসন্ন রক্তাক্ত সংঘর্ষের জন্য। চীৎকার করে বলল জাম্মাল, ওই ইস্পাহানী দালাল রাহজানের দোস্ত।

ওই যে—ওই যে আস্পে (ঘোড়া) করে আসছে!

হ্যাঁ—সাম্সীর জান্—সাম্সীর জান্ (খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে) আসছে।

কি হবে আলীসাহেবের সেই গহনা?

তুমি শক্ত হয়ে বসে থাক তো!

খট্—খট্—খট্—শব্দটা দ্রুত খুব দ্রুত—এগিয়ে আসছে।

হা আল্লা! আমারই বদ্-নসিবের জন্যে কাফেলার এত বড় সর্বনাশ হলো। মুস্তাফার 'সিগা' ডুকরে কেঁদে উঠল।

সবচেয়ে মুস্কিল হবে যদি ডাকাতরা কশাক হয়। হাকিমসাহেব উটের পিঠে উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল। বিড়বিড় করে বলল, ওরা খুব নিষ্ঠুর।

তার কথা আর শেষ হলো না। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল দস্যুরা। রেজাকের উটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই তরল অন্ধকারে যমদূতের মতো চেহারার রাহজানদের আড়ালে সরীসৃপের মতো লুকিয়ে থেকে সেই দালাল ফিসফিস করে বলল, ওই যে, ওই স্মুটুরে আছে 'বেঙ্গলা'র সওদাগর—ওদের কাছেই আছে বহুত

দামী পিরিয়া (সোনা-রুপোর গহনা), আছে বেঙ্গলার খু-উ-ব মক্‌বুল (সুন্দর) রেশম।

হা আল্লাহ্‌ আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও! মোকানে জা-নি বুজুরুগ্‌ আছে—ছেলেপুলে আছে। উটের পিঠে দুম্বার চামড়ার বস্তাগুলো জাপটে ধরে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে আরবীয় সওদাগর। প্রত্যেকটা স্তুটুর থেকে আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে, আমরা গরীব সওদাগর—

চুপরও! কাফেলার যাত্রীদের সমবেত করুণ আর্তনাদকে স্তব্ধ করে দিয়ে দস্যু-সর্দারের গলার স্বর পাহাড়ের গায়ে গায়ে খান্‌ খান্‌ করে বেজে উঠল, আমরা তোমাদের ওই দুম্বার চামড়া, বকরীর চামড়া, কি পশম, ওসব আজেবাজে সামান চাই না। একটু থেমে ভিখুদের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোমাদের কাছে বহুত পিরিয়া আছে, সেসব দিয়ে দাও যদি জানে—

কিছু দিয়ে দেব ভিখু! ভিখুকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল কৃষ্ণাবাঈ। ভিখুর স্নায়ুতে স্নায়ুতে তীব্র উত্তেজনা তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। মাথার ভেতরে আছড়ে পড়ছে রক্তের উচ্ছ্বাস।

খবরদার, তুমি কিছু বলবে না, তুমি নামবে না, লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি। কৃষ্ণাবাঈয়ের কথাগুলো আর্তনাদের মতো শোনায়। তাদের চুপ করে থাকতে দেখে রাহজানরা যেই গুটি-গুটি এগিয়ে এল ভিখুদের উটের দিকে, অমনি ভিখু চীৎকার করে বলল, এই—ও কুকুররা, এক পা এগোবি না বলছি—বাংলাদেশ থেকে মালদহী রেশম আর পিরিয়া তোদের দেওয়ার—বলতে বলতে সে বদ্ধ একটা উন্মাদের মতো লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে আর বোঁ-বোঁ করে চক্রের মতো তীব্র গতিতে লাঠি ঘোরাতে লাগল। ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল কৃষ্ণাবাঈ; আর্তনাদ করে উঠল কাফেলার যাত্রীরা।

ঠন্—ঠন্—ঠন্—দস্যুদের অনিবার্য মৃত্যুর মতো এক-একটা তলোয়ারের ঘা লাঠিতে প্রতিহত হয়ে শব্দ উঠছে।

আঃ—উঃ—থেকে থেকে দস্যুদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। ভিখুর লাঠি পড়ছে তাদের কারো মাথায়, কারো পিঠে, কারো বুকে। তাজা রক্তে ভিজে যাচ্ছে পাথুরে পথে।

সাবাস—সাবাস বাঙ্গালা সওদাগর—কি রকম মীরাভাদ (লাঠি) ঘোরাতে পারে দেখেছো!

হা আল্লা ? অল্‌হমদুলিল্লা!

তোকে আজ জান রেখে যেতে হবে।

ডাকাতের হুঙ্কারে, যাত্রীদের কারো আর্তনাদে, কারো জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল নির্জন গিরিপথ। ভিখুর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তীব্র উত্তেজনায় তার হাত-পায়ের পেশীগুলো এক-একটা লোহার বলের মতো ফুটে ফুটে উঠছে। সে সমানে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে দস্যুদের ব্যূহের ভেতরে এগিয়ে চলেছে। রাহজানরা এক পা এক পা করে পিছু হটছে—

ঠকাস্—রাহজানদের সর্দারের মাথায় পড়ল লাঠির ঘা। আর্তনাদ করে যেই লুটিয়ে পড়ল সর্দার, অমনি রাহজানেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে তাকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

শান্তি নামল দেমাভেন্দ পাহাড়ে।

॥ আঠারো ॥

ডিং—ডং—ডিং—ডং—

কাফেলা আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু খুব মন্থর আর অবসন্ন তার গতি। আকস্মিক সেই বিপর্যয় যেন বিকল করে দিয়েছে ইস্পাহানগামী সওদাগরদের চেতনা। ভিখুও তার ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণাবাঈয়ের কোলে। তারও পিঠ ও বুকের জায়গায় জায়গায় ছড়ে গিয়েছে। কৃষ্ণাবাঈ ঝুঁকে পড়ে তার ক্ষতস্থানগুলোতে পরমযত্নে জলে ভেজা ন্যাকড়া বেঁধে দিচ্ছে। হাকিমসাহেবও চলে এসেছে ভিখুকে দেখতে। দু'দিকে ধূ-ধূ রুক্ষ ন্যাড়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, একটা গাছের বংশ নেই। ইস্, এই সময় যদি বিশল্যকরণীর দুটো পাতাও পাওয়া যেত!

বাঙালী সওদাগরের মীরাভাদের জন্য আমরা জানে বেঁচে গেলাম। অস্ফুট গুঞ্জন চলছে কাফেলায়। শাঁ-শাঁ বাতাস পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে ভেসে উঠল একটা চাপার কান্নার আওয়াজ, আমার খোয়াফ (ভয়) লাগছে। ও জাম্মাল, শুনছো?

মেয়েটা কাঁদছে। অস্ফুটস্বরে ভিখু বলল। অদূরে রেজাকের উটের পিঠে এক টুক্‌রো কালো ছায়ার মতো জবুথবু-হয়ে-বসে-থাকা মুস্তাফার 'সিগা'—ইস্পাহানের দাসদাসীর হাটের সেই পণ্যের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাবাঈয়ের মনটা ভারী হয়ে ওঠে। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে, আমাদের উটে ডেকে নিয়ে আসব ভিখু?

তাই আন কৃষ্ণা, বেচারী হয়তো কত ভয় পাচ্ছে!

মেয়েটা আসে ভিখুদের সুটুরে। কেমন জড়োসড়ো হয়ে কৃষ্ণা-বাঈয়ের পাশে বসে। কুহিস্তানী (পাহাড়ী) রাহজানের সঙ্গে

লড়াই করে হারিয়ে দেওয়া হাসিন জওয়ানের (সুন্দর যুবকের) দিকে আড়ে আড়ে তাকায়।

তোমার নাম কি ? কৃষ্ণাবাঈ আলাপ জমায়।

আমার নাম জোবেদা। মাথা নীচু করে বলে মেয়েটি আর তার গলায় ঝোলানো লাল লাল কাঁচের বুটির জীর্ণ মালাটা খুঁটতে থাকে। আবার বলে কৃষ্ণাবাঈ, ইস্পাহানে তোমার বাপজান কি মাদারজান কেউ নেই ?

জোবেদা মাথা ঝাঁকায়। কান্নার আভাসে তার মুখখানা কুৎসিত হয়ে ওঠে।

আচ্ছা, ইস্পাহানে যদি কোন বেতমীজ লোকের কাছে তোমাকে বিক্রি করে দেয় জাম্মাল ? কৃষ্ণাবাঈ তার নিজের মনের আতঙ্কটাকেই যেন প্রশ্ন করে, আর লোকটা যদি তোমার ওপরে—

ভিখু বলে, আমাদের বাইশবাজারের কাজী তো তার বাঁদীগুলোকে দেখেছি ঘরের চালে ঝুলিয়ে বেত মারে।

বল না ভিখু—আর বল না। মেয়েদের শুধু বেত মেরেই সন্তুষ্ট হয় না। হঠাৎ চুপ করে যায় কৃষ্ণাবাঈ। হয়তো মনে পড়ে যায় যে, সেও মেয়ে। কামনাজর্জর পুরুষের বীভৎস ও পৈশাচিক অত্যাচারের নমুনাও তার অজানা নয়। জোবেদা কান্নায় ভার-ভার গলায় বলে, আমি তো বদ্-নসিব্ নিয়েই পয়দা হয়েছি।

কৃষ্ণাবাঈ, ও আমাদের কাছেই থাকুক না ! আচমকা বলে বসে ভিখু, ও ইস্পাহানের মেয়ে—সব জানে শোনে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে কৃষ্ণাবাঈ।

কেমন অপ্রতিভ হয়ে যায় ভিখু। সংকোচের ছায়া পড়ে তার চোখে। অস্ফুটস্বরে বলে, সেটা বুঝি ভাল দেখাবে না—না কৃষ্ণা ?

আরে না-না, এদেশের বাজারে দাসী-বাঁদীর খুব দাম জান। ব্যাপারীরা যে দামে ওকে কিনবে তার তিনগুণ কি চারগুণ বেশি

দামে বিক্রি করবে আমাদের দেশের দাসদাসীর সওদাগরদের কাছে। তারপরে তারা আবার চেষ্টা করবে আকবর বাদশাহের হারেমে চালান দিতে। সেখানে একবার বিক্রি করতে পারলে তো আর কথাই নেই।*

ভিখু যেন তার কোন কথাই শুনতে পাচ্ছে না। তার মনে খটকা লাগে— কৃষ্ণাবাঈ অমন করে হেসে উঠল কেন?

ওদিকে টুক্‌রো টুক্‌রো আলাপ আর পাঁচ রকম কথার ভেতর দিয়ে একটু একটু করে কেটে যায় জোবেদার আড়ষ্টতা। বলে, তুমি বোরকা পরে আছো কেন আঘাবাজি (দিদি)?

চারদিকের নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে বোরকার ভেতর থেকে নিজেকে মুক্ত করে কৃষ্ণাবাঈ। জোবেদার চোখে ফুটে ওঠে কেমন একটা মুগ্ধ তন্ময়তা। অস্ফুটস্বরে বলল, ইস, কী মহ্‌রু (সুন্দরী) তুমি আঘাবাজি! একটু থামে, আবার ভিখুর দিকে ইঙ্গিত করে বলে, যেমন তুমি—তেমনি তোমার—

কৃষ্ণাবাঈ কোন কথা বলে না। বিচিত্র একটা লজ্জার শিহরণ তরঙ্গিত হয়ে বয়ে যায় তার মেরুদণ্ড বেয়ে।

কয়েকদিন পর।

রেজাকের কাফেলার যাত্রীদের কণ্ঠে বেজে ওঠে উল্লসিত ধ্বনি, —শুকুর অল্‌হম্‌দুলিল্লা—আমরা রসিদন (পৌঁছে) যাচ্ছি ইস্পাহানে।

ভিখু দেখল দূরে—বহুদূরে ভোরের আবছায়া অন্ধকার আকাশের গায়ে আঁকা ঝাপসা ছবির মতো ইস্পাহানের হাজারো মসজিদের মীনার আর প্রাসাদ-শীর্ষ। গুর্ গুর্ করে উঠল ভিখুর বুকের ভেতরটা কে একজন চীৎকার করে বলল রেজাককে, জাম্মালভাই—জুদ্-

লেখকের "দাসদাসীর" হাট গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

কুন্—জুদ্-কুন্—জুদ্-কুন্—আল্লা, আভেলী বাজারস্ত্ হওয়ার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে।

হে-হে-বি-রাভিম্—হে-হে-বি-রাভিম্—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর গন্তব্যস্থান দেখতে পেয়ে যাত্রীরা অস্থির হয়ে ওঠে।

কাফেলা এসে থামল ইস্পাহানের বাজারে।

থেমে যায় বাজারের একটানা কলগুঞ্জন। তুর্কী, ইরানী, রুশী, কাবুলী, চীনা, তাজিক্, উজবেক্, তাতার বণিক আর ব্যাপারীরা ভীড় করে এসে দাঁড়ায় বুশায়ারের সেই কাফেলার চারদিকে। তারা জানে —জানে দূর-দূরান্তরের দেশের বিচিত্র পণ্যসম্ভার সাগর পাড়ি দিয়ে ওই বন্দর হয়েই আসে এই ইস্পাহানে, তেহরাণে, তাব্রিজে। ব্যবসায়ীদের ভেতরে গুঞ্জন শোনা যায়, বাঙ্গালা-বাঙ্গালা—রেশম—মসলিন!

ভিখু দেখল ইস্পাহানের বাজারটা অদ্ভুত। একটা মখমলের মতো নরম আর সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠের এখানে-সেখানে তাদের দেশের যাদুকররা নানারকমের ভেল্কী দেখাচ্ছে। সাপ খেলা দেখাচ্ছে সাপুড়েরা বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে। সেই মাঠের চারদিকে মাটির উঁচু দেওয়াল। সেই দেওয়ালের গায়ে গায়ে এক-একটা ছোট ছোট দোকানঘর। দোকানের চালাগুলোর ছায়ায় ছায়ায় সেই মাঠকে বেড় দিয়ে সংকীর্ণ রাস্তায় কুলি-কামিন সওদাগর ব্যবসায়ী-ব্যাপারীদের জমাট ভীড়ের ভেতর দিয়ে বহু কষ্টে তারা এল মাঠের দক্ষিণদিকে। হাকিমসাহেব বলল, তোমরা কেনাবেচা কর—আমি সিমোনভকে একটু খুঁজে আসি।

দিদি, এখানে বিদেশী সওদাগরদের জন্য ডুরসানা-মঞ্জেল (দোতলা তাঁবু) ভাড়া পাওয়া যায়। জোবেদা তাদের খবর দেয়। দূর দেশের এই আমিন্ (সৎ) ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য তার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এখানকার হাল-হকীকৎ সব যেন তার নখদর্পণে। তাই দেখতে দেখতে ডুরসানা-মঞ্জেল ঠিক হয়ে

যায়। ক'দিন থাকবে—কত ভাড়া—সব জোবেদাই ব্যবস্থা করে দেয়।

শোন, আমরা কিছু সামান বিক্রি করব। তাঁবুতে বসে ভিখুকে পরামর্শ দেয় কৃষ্ণাবাঈ, সেই খোরাসানী তোমায়ুন দিয়ে আমরা আবার এমন জিনিস নেব—যার চাহিদা আছে তাব্রিজে, আস্ত্রাখানে—বুঝলে?

তোমরা তাহলে এখানে বেশিদিন থাকবে না! নিভু-নিভু গলায় বলে জোবেদা। কৃষ্ণাবাঈ তার মাথায় সস্নেহে একটা হাত রেখে বলে, দূর পাগলী, আমরা বাড়ি ফিরব না—বুশায়ারে আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে না!

জোবেদার মুখখানা ম্লান হয়ে যায়। কৃষ্ণাবাঈ বলে, তোর ঘর এখানে কোথায়—কার আছে ছিলি তুই? একটু থামে। আবার ভিখুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে। বলে, যদি চালচুলো কিছু না থাকে, মালিকের যখন ইচ্ছে, তখন থাক্ আমাদের সঙ্গে। হেসে হেসে বলে কিন্তু বুকের ভেতরটা চিন্ চিন্ করে জ্বলে যায়। জোবেদা দূরে বাজারে ভীড়ের জটলার দিকে কেন যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলে, বাবুসাহেব আগে বেচাকেনা করে আসুক—তোমাদের বলব আমার বদ্-নসিবের সেই কিস্সা দিদি।

জোবেদা, তুই বাবুর সঙ্গে যা—তুই তো এখানকার হাল-হদিস সব জানিস।

সর্বনাশ! তুমি যাবে না। তাহলে আমি আলীসাহেবের সেই বৈদূর্য, মুক্তা, প্রবাল, মাণিক কি করে বিক্রি করব?

ভিখু ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণাবাঈয়ের হাত ধরে বলে, চল—চল, তুমি না হয় বোরকা পরেই আমার পাশে বসে থাকবে।

গৌড়ের মালদাই রেশমের সওদাগর ভিখু আর কৃষ্ণাবাঈ চলেছে ইস্পাহানের বাজারের দিকে। জোবেদাও সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিক তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। কত দেশের কত রকমের

পণ্য আর উট ঘোড়া গাধার ব্যূহ এড়িয়ে আমীর-ওমরাহ-মোল্লা-মৌলভী-সওদাগর-দালালদের ভীড়ের ভেতর দিয়ে তারা চলেছে। দোকানে দোকানে থরেথরে সাজানো আছে রেশম, তুলো, সাটিন, মখমল, গালিচা, ঘোড়ার জীন, রেকাব, রঙবেরঙের রুপোর পাত্র আরও কতরকমের সেরা সেরা পণ্য। রুশী বণিকের বিপণিতে ঝকমক করছে রাশি রাশি তীর, বল্লম, তলোয়ার, লোহার শিকল; আবার কারো দোকানে আছে সুদৃশ্য পশম, দুম্বার চামড়া, শীলমাছের দাঁত; পার্শী সওদাগররা সাজিয়ে বসেছে তাদের বিচিত্র পসরা—ডুরাসানা·মঞ্জেলের সুদৃশ্য বস্ত্র, চৌবীনরৌতী, সরাপর্দা, সামিয়ানা, তার সুলতানী বনাত আর কিংখাপ ও মখমলে আঁটা খসখসের বেড়া, গালীম-কালীম গালিচার ওপরে তাকিয়ানেমীর; ঝলমল করছে সোনার চাঁদির আউরঙ্গ, মণিমুক্তার ঝালর দেওয়া ছত্র।

এত সব সুন্দর জিনিসের ভেতরে আমাদের দেশের রেশমের কাপড় যে কারো চোখেই পড়বে না কৃষ্ণা।

বলছো কি তুমি গৌড়ের রেশম ব্যাপারীর ছেলে হয়ে—জান না বাংলার রেশম আর মসলিন ভুবনবিখ্যাত!

কৃষ্ণাবাঈয়ের কথার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল। ভিখু তার বাক্স খুলে বের করল মালদাই রেশমের রকমারি বস্ত্রসম্ভার—খামরু, মটকা, অ্যাণ্ডি, গরদ, মুগা, কোরা, বাফতা। বের করল নানারকমের মসলিন—তঞ্জেব, আলবাল্লে, তরন্দাম, নয়নসুখ, সরবন্দ, কুমীশ। বিচিত্র আর সুদৃশ্য সেই বস্ত্রসম্ভার দেখেই মধুর লোভে যেমন মৌমাছিরা ছুটে আসে, তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে এল পারসিক, আরবীয়, তুর্কী, কাবুলী আর রুশী বণিকদের দল।

কী খুশ্ মঞ্জর (কি সুন্দর) সামান্! কলরব উঠল তাদের ভেতরে। কত—কত তোমায়ুন এক-একটা ?

এগুলো কি শিরভান কিংবা জিলান রেশমের কাপড়? ভিড়ের

ভেতর থেকে খয়েরীরঙের আলখাল্লা পরা এক রুশী-বণিক লাল মুখখানা বাড়িয়ে দিল।

না, মালদাই, মানে বাঙ্গলার রেশম।

আমি ঠিক এইরকম মকবুল রেশমের কাপড় দেখেছি সরাইবাটুর বাজারে। পরিষ্কার পার্শীতে বলল সেই রুশীয় সওদাগর।

সরাইবাটু কোথায়?

হা আল্লাহ্, সরাইবাটু জান না তুমি হিন্দুস্তানী সওদাগর হয়ে? তার ধূসর চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

আহা কী কাসাও (সুদৃশ্য), কী মক্‌বুল পিরায়া দেখেছো! আলীসাহেবের সেই স্বর্ণখচিত মেহগিনি কাঠের বারকোষের ডালা খুলতেই দেশ-দেশান্তরের সওদাগরদের ভেতরে জেগে উঠল তীব্র চাঞ্চল্য। তারা দেখল, ঝলমল করছে কত রকমের বৈদূর্য, মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল—

এটা কোন্ নির্গিন (পাথর) আছে?

নিগিন নয়—বোরকার আড়াল থেকে ফিসফিস করে বলে কৃষ্ণাবাই, ওটা মানিক—সোনার সুতোয় গেঁথে পরতে হয় মানিকের মালা।

কত—কত তোমায়ুন দাম নেবেন? মেহেরবাণী করে বলুন।

আরে—আরে কি মালিহ্ (সুন্দর) মুক্তা!

না-না, মুক্তা নয় সাহেব, ওগুলো বৈদূর্যমণি।

এই মণি দিয়ে কি করে?

বলছেন কী সাহেব, রক্তবর্ণ সুতোয় বৈদূর্যমণি গেঁথে দিতে হয়—আচমকা থেমে যায়। মনে পড়ে সে স্বর্ণশ্রেষ্ঠী নয়, সে স্ত্রীলোক। নেহাতই অবস্থা বিপর্যয়ে স্বর্ণ ও রত্নভাণ্ডার নিয়ে ইস্পাহানের হাটে পসরা সাজিয়ে বসতে হয়েছে। কিন্তু—

ভিখুকে যেমন তার মালদাই রেশমের সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভার নিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে হলো না, তেমনি কৃষ্ণাবাঈকেও কর্কেতের, পদ্মরাগ,

মরকত ইত্যাদি নানা বিচিত্র রত্নসম্ভার সম্বন্ধে একটা কথাও বলতে হলো না ক্রেতাদের। দু'হাতে মালদাই রেশমের কাপড় আর বিভিন্ন রত্নরাজি বিক্রি করে ফুরসৎ পেল না দু'জনে। কৃষ্ণাবাঈয়ের মসলিনের তাঞ্জাম মুহূর্তে রাশি রাশি তোমায়ুনে ভরে গেল।

যখন তাদের দোকানে তখনও কয়েকটা কোরা, কিছু মটকা আর কিছু গরদের কাপড় অবশিষ্ট আছে ; বাকী আছে অল্প কিছু সোনা-রত্ন, ঠিক সেইসময় মাথায় ফেজটুপী আর চোগা-চাপকানপরা এক খানদানী আরবী খরিদ্দারকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে হঠাৎ জোবেদা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল—হা আল্লাহ্, আমার অজরঈল আসছে! বলেই ঝড়ের মতো চলে গেল সে দোকানঘরগুলোর পিছনের সেই ফাঁকা মাঠের দিকে।

এখানে একটা 'হাসিন' মেয়ে ছিল না? ঘোড়ার পিঠে বসেই লাগাম টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করল সেই লোকটি। ভিখু ভেবে পায় না, কি বললে ঠিক হবে। কৃষ্ণাবাঈ বোরকার ভেতর থেকে মাথা ঝাঁকায়।

সে আবার ভিখুর সরল ও সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তাজ্জব! তোমরা বাঙ্গালা থেকে আসছো না! কেমন কর্কশ শোনালো তার গলা। বিড়বিড় করে আবার বলল, আমি যে বাজারে শুনে এলাম, তোমাদের সঙ্গে আছে ঠিক তার মতো—থামল সে। চলে যেতে যেতে আবার পিছন ফিরে বলল, তোমরা তাকে এখানকার নাখ্‌খাসে (দাসদাসীর হাটে) বিক্রি করে দাও নি তো—

আমরা মানুষ কেনাবেচার কারবার করি না। দৃঢ় গলায় ভিখু বলল। লোকটা আর দাঁড়ালো না। যেই বাজারের ভীড়ের ভেতরে মিশে গেল, অমনি এল জোবেদা। তখনো—তখনো তার সেই কাস্পিয়ান নীলিমায় টলমলে দুটো ডাগর চোখে আতঙ্কের ছায়া

কাঁপছে থরথর করে। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে সেই লালচে মুখ।

লোকটা কে রে জোবেদা ?

ও-ই তো আমার এই বদ্‌-নসিবের জন্য দায়ী দিদি, আমার— বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সে। কান্নার ভেতরে তলিয়ে গেল তার বাদবাকী কথাগুলো।

তুই কি ওর বাঁদী ছিলি ?

জোবেদা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় এল এক বুড়ো ইরানী খরিদ্দার। বলল, শুকুর অল্‌হম্‌দুলিল্লা ! তোমাদের 'কুমীশ' কাপড় আছে, না ফুরিয়ে গিয়েছে ? একটু থামে বৃদ্ধ। খক্‌ খক্‌ করে একটু কেশে বলে, আমার নবিরাটা (নাতিটা) এমন বায়না ধরেছে, বাঙ্গালার কুমীশ কাপড় দিয়ে তাকে কোর্তা বানিয়ে দিতেই হবে।

কুমীশ একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে কত্তা।

আরে ! এই হাসিন মেয়েটা কে ? হঠাৎ জোবেদার দিকে নজর পড়ল বুড়োর। কয়েকমুহূর্ত কি যেন ভাবল। যেন কোন দুঃস্মৃতির ভারে ভারী হয়ে উঠল তার চোখের পাতাদুটো। কেমন ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, ঠিক আমার বেহেস্তে চলে-যাওয়া নাভার (নাতনীটার) মতো দেখতে। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। হঠাৎ ভিখুর হাত ধরে বলল, তোমরা ওকে কোথায় পেলে ? তোমরা তো বাঙ্গালা থেকে—

ভিখু চুপ করে থাকে। বৃদ্ধের শোকম্লান আর স্নিগ্ধ মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়—মনে হয় এই ইস্পাহানের বাজারে বিক্রির পণ্য হয়েই তো এসেছে জোবেদা। বুড়োর কাছে ওকে বেচে দিলে জোবেদা অন্তত সুখে থাকবে।

ও কি তোমাদের বাঁদী ?

না। কৃষ্ণাবাঈ বলল।

ওকে আমার কাছে বেচবে ? আমি দশ তোমায়ুন দেব—

দাও না কৃষ্ণা, জোবেদা খুব ভাল থাকবে।

কৃষ্ণাবাঈ কিছু বলল না। জোবেদার জন্য গভীর সমবেদনায় ভরা ভিখুর নরম আর স্নিগ্ধ মুখাখানার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সে। বলল, না, ওকে বিক্রি করব না।

জোবেদার আতঙ্কিত মুখে হাসি ফুটল।

তবুও ভিখু কেন যেন ব্যাকুল হয়ে বলল, আপনার 'মঞ্জিলটা' (মোকামটা) কোন্‌দিকে? যদি—

ও, আমার মঞ্জিল! ওই যে 'চাহর বাগ', তার পুবদিক দিয়ে যে রাহটা বেরিয়ে গেল, সেখানে গিয়ে বললেই হবে হাজী মির্জা আব্বাসের—

ও! আপনি হাজী! শ্রদ্ধায় ভিখুর চোখতুটো অগাধ হয়ে উঠল।

তঞ্জেব—তুরন্দাম কাপড় সব ফুরিয়ে গেছে? আবার একঝাঁক তুর্কী, তাজাকি, কাবুলী, চীনা সওদাগর এসে দাঁড়ালো। ভিখু তাদের অপেক্ষা করতে বলে কৃষ্ণাবাঈকে বলল, কি করব, তাঁবু থেকে আরও কিছু মাল—

না-না, আমরা তেহরাণে, তাব্রিজে, আস্ত্রাখানে বিক্রি করার জন্য কিছু মাল রাখব না?

আমরা যা মাল এনেছিলাম সে-সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে ভাই-সাহেব। ভিখু হেসে হেসে বলল, মেহেরবাণী করে আমাদের মাফ করবেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামল ইস্পাহানের বাজারের সেই গোল চত্বরের চারদিকে। দোকানে দোকানে জ্বলে উঠল আলো। ভিখু দেখল, আলোগুলো কিন্তু গৌড়ের দোকানগুলোর দেওয়ালগিরি কি ঝাড়বাতির মতো নয়। প্রায় তু'হাত লম্বা একটি কাঁচের নলের ভেতরে জ্বলছে আলোর শিখা। সেই স্বচ্ছ নলের চারদিকে সুদৃশ্য মসলিনের সরু বনাত। তু'পাশে সেই বনাত-ই একটু বাড়িয়ে তার

হাতল করা হয়েছে। দোকানঘরের মাঝখানে নক্সাকাটা রঙীন সুতোর সঙ্গে জ্বলছে সেই বিচিত্র দীপাধার।

আলো-ঝলমল আর লোক-গমগম বাজারের ভেতরে দিয়ে উঁচু উঁচু পাথর ছড়ানো রাস্তা ধরে ভিখুরা তাদের ভুরসানা-মঞ্জেলের দিকে এগোতে লাগল। জোবেদা কৃষ্ণাবাঈয়ের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বলল, তোমাদের সামানের তো এখানকার বাজারে খুব পুরুষীদান (চাহিদা)। একটু থামে, তার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হয়তো ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট গলায় বলল, তোমরা আবার তেহরানে, আস্ত্রাখানে—

তোর চিন্তা কি—তুই আমাদের সঙ্গে যেমন আছিস তেমনি থাকবি। ভিখুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অস্পষ্টস্বরে বলল কৃষ্ণাবাঈ।

ভিখু কিছুই বলল না। শুধু তার চেতনার ভেতরে কুয়াশার মতো একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে একটা অস্বস্তি। কেন—কেন তাদের মাঝখানে বারে বারে জোবেদাকে আটকে রাখতে চাইছে কৃষ্ণাবাঈ! তাহলে—তাহলে কি—

চুপ করে থাক্ তুই। জানিস এখানে আমার দু'কুড়ি দশ বছরের দোকান! একটা বিক্ষুব্ধ আর তীব্র গলার স্বর বাজারের কলরবকেও ছাপিয়ে শোনা গেল। আবার সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তুই ব্যাটা কিরগিজ, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস এখানে ?

মুহূর্তে লোক জমে যায় সেখানে। ভিখুও কৌতূহলী হয়ে সেই ভীড়ের ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দেয়।

তোমাদের দেশে সওদাগরী করতে এসেছি বলে তুমি—

এসেছিস—এসেছিস, আমার দোকানের গা ঘেঁষে বসেছিস কেন ?

কেন, আমার গায়ে কি 'উফুনাত্‌দস্তন' (দুর্গন্ধ) আছে ?

হ্যাঁ, আছেই তো! জানিস আমি খাঁটি সাচ্চা ইরানীর বাচ্চা—

আমরা—আকাশের দিকে হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আমরা প্রভু জর-অস্তর (জরথস্ত্রু) সন্তান! আমার গায়ে সাচ্চা আরীয় (আর্য) খুন বয়ে চলেছে। একটু থামে। প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে তীব্র ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করে বলে, তুই তো ব্যাটা তুর্কীস্তানের কিরগিজ আছিস—দস্‌তে আর কুহ্‌তে কাফেলার ওপর চড়াও হয়ে রাজহানি করিস।

ফের যদি আর একটা কথা বলবি, তোর আমি—তীব্র ক্রোধে সে আর কিছু বলতে পারল না। তার দু'চোখে চকচক করে উঠল সেই আদিম যাযাবর মরুদস্যুর হিংস্রতা। কোমর থেকে বের করল একটা ধারালো ছুরি।

আঃ, করছো কি? চলে এস। কৃষ্ণাবাঈ হিড়হিড় করে টেনে ভিখুকে নিয়ে এল। ওদিকে দর্শকরাও সেই খাঁটি আর্য-সন্তান আর মরু-সন্তানের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনিবার্য রক্তপাত থেকে তাদের রক্ষা করল।

হাকিমসাহেব আসছে না কেন?

সারাদিন পরে ডেরায় ফিরে এসে তাদের খেয়াল হলো, সেই কোন্ সাত-সকালে হাকিমসাহেব কোথাকার কোন্ সিমোনভকে খুঁজতে বেরিয়ে গিয়েছে, এখন পর্যন্ত তার দেখা নেই।

ভিখুর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া নামে। দূরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন অচেনা অজানা শহরের আলোর দীপালির দিকে কেমন অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে। জোবেদা বলে, তোমাদের এত তরাদ্দুদের (দুশ্চিন্তার) কি আছে? 'বাগি-ই-তখৎ'-এর পাশে ওই রুশী সওদাগরদের তাঁবুতে গেছে নিশ্চয়ই। একটু থেমে আবার কৃষ্ণাবাঈয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি দেখে আসব দিদি—যাব? আমি সব চিনি।

না-না, তুই তো আবার চোগা-চাপ্‌কানপরা সেই লোকটাকে দেখ্‌লেই ভিরমী খাবি।

ও কে জোবেদা? কৌতূহলে ভিখুর চোখত্নটো জ্বলজ্বল করে।

জোবেদা মাথা নীচু করে। কেন যেন তীব্র ঘৃণায় দড়ির মতো পাকিয়ে যায় তার মুখখানা। অস্পষ্টস্বরে বলল, ওরই মোকামে আমি বাঁদী ছিলাম বাবুজী। এই ইস্পাহানের বাজার থেকেই আমাকে পঁচিশ তোমায়ুন দিয়ে কিনেছিল লোকটা।

তারপর?

আমাকে রাকস্‌ মুসিকান (নাচ-গান) শেখালো—তারপর ওর খুশ্‌-মঞ্জিলে আমাকে নিয়ে রাত ভোর—তীব্র আগ্রহভরা ভিখুর হুটো উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল জোবেদা। সংকোচের ছায়া পড়ল তার চোখে।

তাহলে তো বেশ ভালই ছিলি! মুহম্মেরার ওই লোকটার পাল্লায় পড়লি কি করে?

সে আমার বদ্‌-নসিবের লম্বী 'কিস্‌সা' দিদি।

তার কথাগুলোর ভেতরে যেন হাহাকার বেজে উঠল। ডুরাসানা-মঞ্জেলের সেই অস্বস্তিকর পরিবেশটাকে যেন একটু সহজ ও স্বাভাবিক করার জন্যেই জোবেদা বলল, রাত অনেক হলো দিদি—তোমাদের নাস্তার ব্যবস্থা করব না? একটু থেমে বাঁকা চোখে ভিখুর দিকে তাকিয়ে বলল, কি খাবে বল, রস্থই পাকাব—না মকবুলচাচার দোকানে খুব ভাল পোলাও, মুরগী-মসল্লম বানায় আর গোলাপের গন্ধভরা মধু শর্করা, হুধের সর দেওয়া কত রকমের সুগন্ধী মেঠাই—

কৃষ্ণাবাঈ কথা বলে না। বুঝতে পারে, জোবেদা তার জীবনের সবচাইতে গূঢ় বেদনার কথাটা হয়তো ভিখুর সামনে বলতে চাইছে না।

হাকিমসাহেব এলে নাস্তার কথা ভাবা যাবে, একটু থেমে

ভিখুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এস আমরা ততক্ষণে হিসাবটা করে ফেলি।

ভিখুর যদিও হাকিমসাহেবের জন্য মনটা খুঁত খুঁত করছিল, তবুও বাধ্য ছেলের মতো দড়ির চারপাইয়ের ওপর কৃষ্ণাবাঈয়ের কাছে এসে বসল। দূরে তাঁবুর অন্ধকার কোণে বসে জোবেদা লক্ষ্য করতে লাগল তাদের। দু'জনে দু'জনের নাম ধরে ডাকে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো মেলামেশা করে। কী—কী সম্বন্ধ হতে পারে এদের ভেতরে? শওহ্‌র্‌-জানের (স্বামী-স্ত্রী) নিশ্চয়ই নয়।

শোন, মোট আশী খণ্ড মটকার ভেতরে চল্লিশটা নিয়ে গিয়েছিলাম। খামরু নিয়েছিলাম—

উঁহু-উঁহু, অত খুঁটিয়ে কে শুনতে চাচ্ছে তোমার কাছে? মোট কত সিক্কা টাকার মাল নিয়ে গিয়েছিলে আর কত তোমায়ুন পেয়েছো, তাই দেখ।

ভিখু হিসাব কষে। কৃষ্ণাবাঈও আলীসাহেবের বারকোষ খুলে লম্বা খেরোবাঁধা খাতা বের করে। এইখানে লেখা আছে মোট কত বৈদূর্যমণি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি ছিল।

আমি পাঁচহাজার সিক্কা টাকার মাল নিয়ে গিয়েছিলাম।

কত পেয়েছো?

সত্তর হাজার খোরাসানী তোমায়ুন।

আমারও প্রায় তিনগুণ লাভ হয়েছে। কৃষ্ণাবাঈ থামে। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে বলে, শোন, লাভ তো অনেক হয়েছে। এখন বাদবাকী মাল ইস্পাহানের বাজারে বেচে দিয়ে দেশে ফিরে যাব।

সে কী! আঁতকে উঠল ভিখু, তুমি আস্ত্রাখানে, তাব্রিজে যাবে না? হঠাৎ থেমে গেল সে। কেমন শুকনো গলায় বলল, আমার কতদিনের আশা—আমি—

না গো—না, এমনি বললাম। হেসে হেসে ভিখুর দুশ্চিন্তাটা উড়িয়ে দিয়ে কৃষ্ণাবাঈ বলল, মনে হলো, দেখি তুমি কি বল! হাসি-

হাসি মুখে বলল বটে কথাগুলো, কিন্তু তার বুকের ভেতরটা তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলে যেতে লাগল। তার আশা, তার স্বপ্ন, তার বাসনাটাকে সত্যে রূপায়িত করার জন্যই তো সে সূর্যমুখী তপস্যা করে চলেছে। কিন্তু কেন? কোথায় এর শেষ?

তাহলে শোন, যে লাভ করেছি—তার মনের ভেতরে ফুঁসে-ওঠা সেই দুর্বার লোভের সাপিনীটাকে শক্ত করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে খুব শান্ত আর সংযত গলায় বলল, সেই বাড়তি টাকা দিয়ে কিছু পশম আর পুস্তিন কিনে নেব। তাব্রিজের, আস্ত্রাখানের যত উত্তরে যাবে তত শীত বেশি বলেই ওসব মালের চাহিদা বেশি হবে।

কথার কথায় রাত বাড়ে। বাজারের কলগুঞ্জনও ক্ষীণ হয়ে আসে। হাকিমসাহেব কিন্তু আসে না। ভিখুর মনের ভেতরটা ছটফট করে। ইচ্ছে হয় জোবেদাকে নিয়ে হাকিমসাহেবকে খুঁজতে যেতে। হঠাৎ কৃষ্ণাবাঈ ভিখুকে বলে, তুমি যাও না জোবেদাকে নিয়ে, কোথায় রুশীদের তাঁবু-টাবু- ও তো সব জানে।

চমকে ওঠে ভিখু। কৃষ্ণাবাঈ কি করে মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পারে! তবুও বলে। বলতে হয় তাই বলে, তুমি একা একা থাকবে তাঁবুতে, এত দামী জিনিস—

উঁহু-উঁহু, বাজারে কখনও 'পাশানা বুরিদা' (ডাকাতি) হয় না। কেন যেন খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে জোবেদা, এখানে সারি শহব থেকে সবেরে পর্যন্ত খাদ্‌খুদার (নগর কোটাল) সৈন্যরা চৌকি দেয়।

ভিখু যেতে গিয়েও দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কাঁটার মতো একটা অস্বস্তি তার বুকের ভেতরে বিঁধতে থাকে। তার সেই অস্থির আর বিচলিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে কৃষ্ণাবাঈ, যাও না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? রাত হয়ে যাচ্ছে না!

বাবুসাহেব, চলে আসুন। গহর (গভীর) রাত হয়ে গেলে আর যাওয়া যাবে না। জোবেদা বাইরে থেকে হেঁকে বলে। ভিখু চলে যায়।

ওরা দু'জনে দুটো কালো ছায়াদেহের মতো পাশাপাশি চলতে থাকে।

রাত্রির আলোঝলমল ইস্পাহান নগরী।

পথের দু'পাশে সারি সারি চিনারের গাছ। প্রত্যেক বাড়ির সামনে একটা করে বাগিচা। সেখানে নানা রকমের ফল ও রঙীন ফুলের সমারোহ। রাস্তা কাঁপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে আমীর-ওমরাহেরা। চলেছে কাজী, মোল্লা, আমলাদের দল—চলেছে দেশ-দেশান্তরের বণিক, ব্যবসায়ী, ব্যাপারী আর দালালরা। পথের পাশে এক-একটা সরাবখানা থেকে ভেসে আসছে খোস্‌রাজের তরল কলোচ্ছ্বাস। মোঙ্গল—তুর্কী—তাজিক—উজবেকরা ময়লা আলখাল্লা পরে এদিক-ওদিক ঘুরছে।

ওই যে—ওই যে বাবুসাহেব, চাহর বাগ—কলকল করে বলে জোবেদা। বহুদিন পরে পাথরে চাপা পড়ে থাকা একটা ঝরণা বাইরের পৃথিবীর অবারিত আলো-বাতাসে যেন আবার মুক্তি পেয়েছে। বলে, জানেন বাবুসাহেব, চারটে বাগিচা একসঙ্গে। এক-একটা বাগিচা আলো করে ফুটে আছে রাশি রাশি নরগিস্‌ ফুল। একটু থামে জোবেদা। ভিখুব নরগিস্‌ ফুলের মতই দীর্ঘ আর ঋজু চেহারাটার দিকে কেমন মোহমাখা চোখে তাকিয়ে বলে, যাবেন চাহর বাগে?

ভিখু কথা বলে না। জোবেদার চোখে ঘন বর্ষার মেঘের মতো কি যেন টলমল করে, সেটুকু ভিখুর নজর এড়ায় না। তার মনের ভেতরে কৃষ্ণাবাঈয়ের কালো চোখদুটো যেন তাকে তর্জনী তুলে শাসায়।

গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি আগে রুশী সওদাগরদের তাঁবুতে চল জোবেদা।

তারা 'চাহল টান' ছাড়িয়ে 'বাগি-ই-তখৎ' পেরিয়ে শহরের

উপকণ্ঠে কালম্ গাছ দিয়ে ঘেরা একটা ফাঁকা মাঠে এসে পড়ে। এই মাঠের ভেতরেই রুশী ব্যাপারীদের সারি সারি তাঁবু। ভিখুর কানে এল বাজনা সহযোগে উচ্চণ্ড একটা সঙ্গীতের সুর। গাছের ডালে ডালে ঝুলছে মসলিনের বনাতের সেই বিচিত্র দীপাধার। তারই ছায়া কাঁপা-কাঁপা আলোয় বসে সমবেত গলায় গান গাইছে রুশী, ইরানী, তুর্কী, হিন্দুস্থানী, আফগান, পাঠান সওদাগরদের দল। ভিখু লক্ষ্য করল, প্রত্যেক তাঁবুর সামনে গাদা করা আছে তাদের দেশের তুলো আর রেশম ও মসলিনের সুতোর পেটী।

শুকুর অল্‌হম্‌দুলিল্লা! ভিখুকে দেখেই তারা গান থামিয়ে উল্লসিত অভ্যর্থনা করে, আসুন—আসুন—

এখানে বাঙ্গালার সওদাগর হাকিমসাহেব এসেছে? ভিখু পার্শীতে প্রশ্ন করে, তোমাদের ভেতরে সিমোনভ বলে কেউ এসেছে?

রুশী ব্যাপারীরা কথা বলে না। তাদের চোখে চোখে নিঃশব্দ একটা প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়। এক বৃদ্ধ রুশ ভিখু আর জোবেদার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে বলে, কোন্ সিমোনভকে খুঁজছো তোমরা? একটু থামে। মনের ভেতরে ডুব দিয়ে যেন অতীত দিনের স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে আস্তে আস্তে বলে, সেই ত্রিশ বছর আগে সিমোনভ নামে একজন টবোলস্ক থেকে এই ইস্পাহানে, বুশায়ারে, কাবুলে আসতো। একটু থেমে. তাকে হতাশ করে দিয়ে সেই বৃদ্ধ রুশী ব্যাপারী বলল, কিন্তু সেই সিমোনভ আর অনেকদিন ইস্পাহানে আসে নি।

আকাশের গা টেনে টেনে চাঁদ ওঠে। সেই চাঁদের আলোয় কেমন মোহময় মনে হয় আমীর-ওমরাহ, মোল্লা-মৌলভীদের স্বর্গপুরী ইস্পাহান। মুস্তাফার পাঁচ নম্বর 'সিগা', ইস্পাহানে বিক্রি-হতে-আসা বাঁদী তারই পাশে পাশে একটা ছায়ামূর্তির মতো চলেছে। সেই চোগা-চাপ্‌কানপরা আরবী লোকটি তাকে পঁচিশ তোমায়নে

কিনেছিল, নাচ-গান শিখিয়েছিল—কিন্তু জোবেদা তার আশ্রয় ছেড়ে—

জোবেদার অভিশপ্ত জীবনের জন্য গভীর মায়ায় ভিখুর মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠল। সস্নেহে জোবেদার হাতটা ধরে বলল, চল জোবেদা, তোমাদের চাহর বাগে চল। দেখে যাই, কত দূর দেশ থেকে এসেছি—আবার কোথায় চলে যাব কে জানে?

কেন যাবেন বাবুসাহেব, আমাদের দেশ কি ভালো লাগছে না? জোবেদার চোখদুটো ম্লান নক্ষত্রের মতো চিক চিক করে ওঠে।

চাহর বাগ উদ্যানে পা দিতেই ভিখুর চোখদুটো মুগ্ধ হয়ে গেল। ঘন সবুজের ছবির মতো ঘাসে আচ্ছন্ন একটা মাঠের চারদিকে ঘন সন্নিবদ্ধ চিনার-বীথি। চিনারের ছায়ায় ছায়ায় সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ ধরে তারা হাঁটতে লাগল। বর্ষার নতুন জলের আহ্লাদের মতো কলকল করে বলে চলেছে জোবেদা—

ওই যে দেখছেন ডালিমগাছের নীচে ছোট ছোট ঘরগুলো—ওগুলোকে বলে খুশ্‌-মঞ্জেল। একটু থামে জোবেদা, ভিখুর গায়ের ওপরে তার যৌবনপুষ্ট দেহটা প্রায় ঢেলে দিয়ে বলে, ওখানে যে-যাব ঈশকীকে (প্রেমিকা) নিয়ে আসে।

ভিখু কথা বলে না। তার সঙ্গে সম্ভ্রমজনক ব্যবধান রেখে ধীর-পায়ে হাঁটে।

চাঁদের আলো শ্বেতচন্দনের মতো ঝরে ঝরে পড়ে চিনারের পাতায় পাতায়। সাদা জ্যোৎস্নার টোপর পরে ডালিমের ঝিরি ঝিরি পাতা-গুলো থর থর করে কাঁপে। জোবেদার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো ভিখুর, হয়তো তার নিরুত্তাপ ব্যবহারে ও আঘাত পেয়েছে। বলল, জোবেদা, আমরা চলে গেলে তুমি কি করবে?

খোদা জানে বাবুসাহেব।

তুমি ওই আরবীয় লোকটার আশ্রয় ছাড়লে কেন? ও তোমাকে তো মহব্বত—

না-না বাবুসাহেব। যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠল জোবেদা। তীব্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। মর্মান্তিক আক্রোশে ভয়ঙ্কর অভিশাপ উচ্চারণের মতো করে প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে বলল, আমি বাঁদীর পেটে বাঁদী হয়ে জন্মেছি। 'পেয়ার'-'মহব্বত' এসব কথা আমরা শুধুই শুনি, কিন্তু—বলতে বলতে তার চোখছুটো জলে ভরে এল। চকিতে ভিখুর মনে পড়ে গেল কৃষ্ণাবাঈয়ের সেই অভিশপ্ত জীবনের যন্ত্রণার কথা। তার মনে হলো—মনে হলো—

কান্নার কোন জাত নেই।

নেই দেশ-দেশান্তরের ব্যবধান।

তাড়াতাড়ি চল জোবেদা। পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যই ভিখু গভীর মমতায় তার হাত ধরে বলল, তোমার দিদি হয়তো কত ভাবছে।

কিন্তু আশ্চর্য! ভিখুকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জোবেদা। তার ছু'চোখে বদ্ধ উন্মাদিনীর মতো জ্বলন্ত দৃষ্টি। শির শির করে ভিখুর বুকের ভেতরটা। উদ্যত-ফণা বিষাক্ত সাপিনীর মতো ছুলছে জোবেদাব দেহটা। কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, জানি বাবুসাহেব—এখুনি ডুরসানা-মঞ্জেলে ফিরবেন আর তাকে নিয়ে দড়ির চারপাইতে খোয়াবীদান করবেন, কত পেয়ার—

এসব তুমি তুমি কি বলছো জোবেদা! তুমি—

কিন্তু তার কথা আর শেষ হলো না। বন্যাব একটা ঢেউয়ের মতো জোবেদা আছড়ে পড়ল ভিখুর বুকে। ছু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে একটা মাকড়সার মতো ঝুলতে লাগল তার দেহ বেয়ে। ভিখুর চুলে, বুকে, মাথায়, মুখে পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে মিষ্টি আর ঝাঁঝালো নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন মানুষের মতো অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল, বাবুসাহেব—ওই খুশ্‌-মঞ্জেলে চলুন—একবার—একবার.

আমাকে পেয়ার করুন। বাবুসাহেব—জিন্দেগী নাদরদ্ তু-সী—উম
—র—আমি মহব্বত—পেয়ার—

এ কী! আপনি কোথায় ছিলেন?

হাকিমসাহেবকে কেমন অপ্রতিভ দেখায়। কৃষ্ণাবাঈ বলে, জোবেদা কি ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি? সেই কখন ওরা আপনাকে—

ছিঃ ছিঃ, এত ব্যস্ত হয়েছো কেন তোমরা? জান তো আমার চেনাশোনা জায়গা—

যাক, সেই যে যাকে—সেই সিমোনভ না কি—খুঁজতে গিয়েছিলেন, পেয়েছেন তাকে?

না কৃষ্ণাবাঈ। কেমন হতাশার চিহ্ন ফুটে ওঠে হাকিমসাহেবের ক্লান্ত মুখে।

সিমোনভ কে?

কোন কথা বলে না হাকিমসাহেব। কৃষ্ণাবাঈ লক্ষ্য করল হাকিমসাহেবের চোখে-মুখে সেই দুশ্চিন্তা আর যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। কি ভাবছে, কাকে নিয়ে তার এত দুশ্চিন্তা এসব প্রশ্ন করে লাভ নেই। তাই কেমন শীতল গলায় কৃষ্ণাবাঈ বলল, পারস্যে আসার পরই আপনি কেমন ছাড়া-ছাড়া ব্যবহার করছেন হাকিমসাহেব। তার কথার ভেতরে তীব্র অভিমান সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু—

হাকিমসাহেব যেন কোন কথা শুনতেই পেল না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। মধ্য-এশিয়ার সেই ভীষণ গহন পার্বত্যলোকের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ধূ-ধূ মরুভূমির বুকে দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করা বালুর ঝড় অগ্রাহ্য করে কত তুহিনশীতল নীল-বর্ণ নদী অতিক্রম করে আসছে এক অক্লান্ত পথিক। তার দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ পথশ্রমে মলিন হয়ে গিয়েছে। সে আসছে—আসছে

সেই সুদূর টবোলস্ক থেকে। তার উৎসুক আর স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখদুটো দূরে প্রেতচ্ছায়ার মতো নগ্নকায় সেই পার্বত্যলোকের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ভাবে, কোথায়—কোথায় বোখারা—কোথায় আফগানিস্তান—কোথায় তিব্বত! কখন—কখন সে বোখারায় পৌঁছুবে আর সেখান থেকে সওদাগরদের কাফেলায় আফগানিস্তান পেরিয়ে যাবে তিব্বতে কিংবা দিগন্ত-লীন ধূ-ধূ মরুভূমি পার হয়ে যাবে পূর্ব তুর্কীস্থানে, সেখানে থেকে যাবে 'সু-চাউতে'? আর কবে—কবে সে তিব্বতী লামা পুরোহিত আর চীনাদের কাছ থেকে কিনবে বনৌষধি?

খুট্—হাকিমসাহেবের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। কৃষ্ণাবাঈ বলল, কে ওখানে?

অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে এসে দাঁড়ালো ভিখু আর জোবেদা।

॥ উনিশ ॥

রাত্রি নেমেছে গভীর হয়ে।

ভুরসানা-মঞ্জেলের ভেতরে দোতলার ঘরের তিনটি দড়ির চারপাইতে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছে ওরা তিনজন—গৌড়ের সওদাগর ভিখু, কৃষ্ণাবাঈ আর হাকিমসাহেব। মেঝেতে এককোণে খড় বিছিয়ে তার ওপর গালিচা পেতে শুয়ে রয়েছে জোবেদা। ঘুম নেই শুধু দুটো প্রাণীর চোখে।

কি ব্যাপার বল তো—কি হয়েছে তোমার? কৃষ্ণাবাঈ নিঃশব্দে উঠে এসে ভিখুর মাথার কাছে বসল। তার কোঁকড়ানো চুলগুলোর ভেতরে বিলি কাটতে কাটতে চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, অত রাত্রে হাকিমসাহেবকে খুঁজে ফিরলে, তারপরেই কেমন ভার-ভার—

ভিখু কথা বলে না। শুধু নিবিড়ভাবে কৃষ্ণাবাঈকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে বুকের কাছে টেনে আনে। বলে, তুমি—তুমি আমাকে এত ভালোবাস কেন কৃষ্ণা, বলতে পার?

কৃষ্ণাবাঈ চুপ করে থাকে। কিন্তু তীব্র একটা আবেগে, আর কী একটা বেদনার ভারে তার মাথা নুয়ে পড়ে ভিখুর বুকের ওপরে। একরাশ কালো চুলের ভেতরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভিখু ভাবে, ভাবে স্নেহ-মায়া-মমতা ঘেরা এই সংসারের কী বিচিত্র রীতি! টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, বাড়ি-ঘর, এমন কি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য হাতের মুঠোয় পেলেও মানুষ সুখী হয় না। একটুখানি প্রেমের জন্য, ভালোবাসার জন্য তার অন্তর কেঁদে কেঁদে মরে। কে জানে, হয়তো স্বামীর ভালোবাসা, শিশুর কলকণ্ঠ দিয়ে ঘেরা একটি সংসারের সেই দুর্মর স্বপ্নই তো ওই হতভাগিনী জোবেদাকে ইস্পাহানের আরবীয় ভদ্রলোকের খুশ্-মঞ্জেল থেকে মুহম্মেরায় তাড়া করে নিয়ে

গিয়েছিল। চাঁদের আলোয় ভরা চাহর বাগে বিষাক্ত সাপিনীর মতো ফুঁসে-ওঠা ওর সেই বুভুক্ষাকে যে কত বুঝিয়ে কত কথা বলে শান্ত করেছিল! ঠিক এই জ্বালাধরা বাসনাই সে দেখেছিল নসীবনের ভেতরে, দেখেছিল জুলিয়ার ভেতরে। কে জানে, হয়তো এই কৃষ্ণাবাঈয়ের রক্তের ভেতরেও সেই দুর্বার স্বপ্ন নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে মরছে।

কার কথা ভাবছো গো?

তোমার কথাই কৃষ্ণাবাঈ। দূরে অস্তায়মান চাঁদের ম্লান আলোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল ভিখু।

দূর, কি যে বল, আমার কথা ভাবার সময় কোথায় তোমার? উঠে বসল কৃষ্ণা। একটু দূরে সরে বসে আবার বলল, তুমি তো নতুন নতুন জায়গা দেখেই সময় পাচ্ছো না। হঠাৎ থেমে গেল। নিজেকে সংযত করল। তার একটা মর্যাদা আছে না! কিন্তু তার চোখের সামনে শাণিত খড়্গের মতো ঝকমক করে উঠল জোবেদার উদ্ধত দেহছন্দ; সুপুরুষ ও বলিষ্ঠ ভিখুর একটু সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার সেই ব্যাকুল মূর্তি!

নতুন জায়গা কোথায় আর দেখলাম! কেমন ক্লিষ্ট আর অবসন্ন শোনালো ভিখুর গলার স্বর, হাকিমসাহেবকে খুঁজতেই তো গিয়েছিলাম কৃষ্ণাবাঈ!

কোন কথা বলল না কৃষ্ণাবাঈ।

তাদের দু'জনের মাঝখানে অন্ধকার ঘরের সেই নিরাকার স্তব্ধতা যেন একটা প্রেতিনীর মতো অবয়ব ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পরদিন।

সকালে উঠেই চমকে উঠল কৃষ্ণাবাঈ। ভিখু নেই—নেই

জোবেদাও। অসহ্য—অসহ্য একটা ব্যথা কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল তার গলার কাছে। তবুও নিজেকে শক্ত করে ঘুমন্ত হাকিমসাহেবকে ডেকে তুলল সে। কোথায় গেল বলুন তো ওরা?

কী আশ্চর্য! তোমাকে না বলে চলে গেল ভিখু! ভিখুকে না দেখে হাকিমসাহেব যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কৃষ্ণা-বাঈকে না জানিয়ে ভিখু চলে যেতে পারে!

দেখ, হয়তো আশেপাশে কোথাও ঘুরতে গিয়েছে জোবেদাকে নিয়ে।

কী আশ্চর্য! আজই তেহরানে রওনা হতে হবে। তীব্র বিরক্তিতে তার বুকের ভেতরে গোপন কাঁটার মতো বিঁধে থাকা সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় ছটফট করে কৃষ্ণাবাঈ বলল, তাব্রিজ, আস্ত্রাখানের বাজারের জন্য কিছু কিছু মাল কিনতে হবে—সব সে জানে।

ওসব ব্যবসা-ট্যবসার দিকে তো ওর তেমন মন—

তা বললে তো হবে না হাকিমসাহেব। কৃষ্ণাবাঈয়ের গলার স্বরটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল, এই দূর বিদেশে আসার মুখ্য উদ্দেশ্যই তো ব্যবসা। একটু থেমে হাকিমসাহেবের নির্বিকার এবং নিশ্চিন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, যান, একটু মেহেরবাণী করে যান হাকিমসাহেব। দেখে আসুন—বিদেশ-বিভুঁই জায়গা—

হাকিমসাহেব যেই বেরোতে যাবে, অমনি ভিখু এসে দাঁড়ালো।

একা!

হাকিমসাহেব আর কৃষ্ণাবাঈয়ের জিজ্ঞাসুদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, সেই হাজী মীর্জা আব্বাস—সেই যে আমাদের দোকানে কুমীশ কাপড় কিনতে এসেছিল, তার বাড়িতে রেখে এলাম জোবেদাকে।

ছ'মাস পর।

শোন ভাই, তাব্রিজ কথাটার মানে কি জান? তাব্রিজের বাজারের ঘিঞ্জি গলির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বলল চান্দুরিভ্যান্ কপিচান্দভ, প্রতিহিংসা। আজারবাইজানের এই মস্ত বড় ব্যবসা-কেন্দ্রের পুরানো নাম কি ছিল জান?

কি? ভিখু অপলক চোখে দেখে তাব্রিজের বাজারের বিচিত্র গড়নের ঘরগুলো, আর শোনে উত্তর-পারস্যের পুরানোকালের এই শহরের জন্মবৃত্তান্ত।

এর পুরানো নাম নাকি ছিল গাজা। কপিচান্দভ বলতে থাকে, কবে নাকি এই গাজার রাজা আর্মেনিয়ার রাজার ভাইকে খুন করেছিল এখানে। সেই ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল আর্মেনিয়ার বাদশাহ খসরু। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এই রাহ্‌তে খুনের তালব বইয়ে দিয়েছিল। একটু থামে কপিচান্দভ। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পায়, প্রতিহিংসার জ্বালায় উন্মত্ত খসরুর সেই বীভৎস হত্যালীলা। অস্ফুটস্বরে বলে, দাদীজানের কাছে শুনেছি, শুধু আর্মেনিয়া নয়—এই নগরের দৌলত আর সরভটের (ঐশ্বর্য) লোভে মক্ষির মতো আরব, সেলজুক, মঙ্গোলরা ভাড়া করা তাতার সর্‌বজ (সৈন্য) নিয়ে কতবার যে হামলা করেছে।

কিন্তু এই তো ছোট ছোট ঘুপচি বাড়িগুলো আর ওই দূরে শহরের চারদিকে ভেঙে-পড়া প্রাচীরটা দেখে তো তেমন কিছু—

বলছো কি দোস্ত! রেশমের কারবারী কপিচান্দভের কালো চোখদুটো দপ করে জ্বলে ওঠে, ওই রাহের দিকে পিছন করা বাড়িগুলোর ভেতরে গেলে কিন্তু তুমি চমকে যাবে।

কেন?

ভেতরটা যেন এক-একটা আমীর-ওমরাহের দৌলতখানা।

প্রত্যেকটা বাড়ির ভেতরে আছে ইট-বাঁধানো উঠোন। সেই উঠোনের কোণে আছে বাগিচা। সেখানে আঙুর গাছে থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে। নরগিস্, সবুজ রঙের গোলাপ আরও কত রকমের ফুল বাগান আলো করে ফুটে আছে।

বল কি!

ঘরের ভেতরে যাও, ধাঁধিয়ে যাবে তোমার চোখ। মেঝে নক্সা তোলা গালিচায় মোড়া। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝকমক করছে তীর, বল্লম, তলোয়ার, ঝিলমিল করছে সোনার চাঁদির আউরঙ্গ, আর—হঠাৎ থেমে যায় কপিচান্দভ। বাঙালী সওদাগর ভিখুর মুগ্ধ দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

আর কি ভাই?

হঠাৎ শাঁ করে ভিখুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে, বাড়ির ভেতরে তো বোরকা-টোরকা পরে না—সেখানে আসমানের পরীর মতো যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে ঘুরে বেড়ায় যেন পারসিক সুন্দরীরা। দেখলে নেশা ধরে যায় দোস্ত। ঠিক এক-একটা নরগিস্—গালদুটো আপেলের মতো। টোকা দিলে মনে হবে ফিনকি দিয়ে খুন—

কি যে বল তুমি! কথা বলতে বলতে তারা এসে দাঁড়ালো তাব্রিজের ভারতীয় সওদাগরদের বাড়িগুলোর সামনে।

সিন্ধু, পাঞ্জাব, গুজরাট ও ভারতেরই আরও দূর-দূরান্তর থেকে হাজার হাজার বণিক ব্যবসার উদ্দেশে এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করছে। যেমন এই চান্দুরিভ্যান্ কপিচান্দভ। কবে নাকি ওর ঠাকুরদাদা গুজরাট থেকে তাব্রিজে এসে হয়েছিল 'পধন'। অর্থাৎ সরাইখানার মালিক হয়ে বসেছিল। চান্দুরিভ্যানের আসল নাম ছিল চন্দ্রভান গোপীচাঁদ। এখানে মুলতানী বেনিয়া মাক্রমল হয়ে গিয়েছে মাতোলভ, পেশোয়ারের কাশেম হয়ে গিয়েছে কাশেমভ।—এসব কথা সে জেনেছে এই পশমের কারবারী কপিচান্দভের কাছ

থেকে। মাত্র দু'দিন হলো তারা তাব্রিজে এসেছে। ব্যবসার সূত্রেই বাজারে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছতে দেরী হয় নি। কপিচান্দভরা নাকি মাঝে মাঝে দল বেঁধে কাফেলায় করে কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীর ধরে চলে যায় তাব্রিজ থেকে রী, বাকু, বের্ডা হয়ে কোথায় কোন্ তাবিরিস্তানে। চলে যায় আস্ত্রাখানে। সেখানে নাকি ভল্গা এসে পড়েছে কাস্পিয়ানের নীল জলে। কবে—কবে যাবে সে কাস্পিয়ানে? কবে যাবে ভল্গা ছাড়িয়ে সেই দিক্‌বিস্তীর্ণ স্তেপভূমিতে? অসহ্য—অসহ্য একটা অস্থিরতায় তার হাতদুটো নিসপিস করে ওঠে। বুকের রক্তে উল্লাসের মৃদঙ্গ বাজতে থাকে আর তার মনের ভেতরে ভাবনার প্রবাহ ওঠা-নামা করে। সেই কবে—কতদিন আগে তারা গৌড়ের গঙ্গায় নওয়ারা ভাসিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিল। তারপর কত দেশ, কত বিচিত্র মানুষ, কত অদ্ভুত তাদের ধ্যান-ধারণা—সেইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বহন করে তারা এসে পৌঁছেছে উত্তর-পারস্যের এই সীমান্ত শহরে। তারা দেখছে, তেহরানের সেই কোন সুপ্রাচীন কালের পুঞ্জীভূত ছাইয়ের পাহাড়—সেই খায়েলী খু-ব অস্ত্ তেহরান (খুব সুন্দর তেহরান) ছাড়িয়ে তারা এসেছে হামাদানে। সেখানে কাস্পিয়ান থেকে বয়ে-আসা হু-হু উত্তুরে বাতাসে হাড়-কাঁপানো শীত; সেই ঠাণ্ডাকে ভ্রুক্ষেপও করে না হামাদানীরা। ভোর থেকে বাজারে জমজমাট ভীড়; দোকানে দোকানে সুদৃশ্য চামড়ার রকমারি দ্রব্যসম্ভার—ঘোড়ার লাগাম, জীন, বাক্সের আবরণ ঘা-সিয়ান্ (জীন তৈরির সুন্দর চামড়া) আর খু-রজিন্ (গালিচা আর চামড়ায় মিশিয়ে বানানো এক ধরনের থলি)। সেই বাজারের খুব কাছেই কাফেলার সরাইখানায় মক্কা-মদিনার তীর্থযাত্রী থেকে শুরু করে রুশ, তাতার, তুর্কী, কাবুলী, চীনা, পাঠান, আফগান বণিক, ব্যাপারী আর দালালদের জমজমাট ভীড়। হামাদান থেকে ইস্পাহানে যাওয়ার রাস্তার ওপরে মুসল্লাহ্ পাহাড়ের নীচে সেই

হলদে বেলেপাথরে তৈরি বিশাল সিংহমূর্তি দেখে কৃষ্ণাবাঈয়ের সে কী উল্লাস! বহুযুগ আগের এই পাথুরে সিংহকে কেন্দ্র করে হাকিমসাহেবের কথাগুলোও মনে পড়ল। জান, কেউ বলে আলেকজান্দার গ্রীসের শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন এই সিংহমূর্তি।* তৈরি করিয়েছিলেন দুঃখ-দুর্যোগ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই নগরের ত্রাণকর্তার প্রতীক হিসেবে। আবার কেউ বলে ইয়াকুত আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) হিমশীতল উত্তুরে বাতাসকে প্রতিহত করার জন্য সৃষ্টি করেছিল বেলেপাথরের এই অপরূপ ভাস্কর্য।

কত যুগ-যুগান্তর ধরে হামাদানীদের কত শ্রদ্ধা, ভক্তি আর মমতা যে জড়ানো রয়েছে এই পাথুরে সিংহের অণুতে অণুতে; কত বন্ধ্যা নারী আসে, আসে সহস্র অতৃপ্ত বাসনা কামনা নিয়ে দেশ-দেশান্তরের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের হাতের স্পর্শে কেমন মলিন আর তৈলাক্ত হয়ে গিয়েছে পশুরাজের মাথাটা। তার মনে পড়ে—স্পষ্ট মনে পড়ে কৃষ্ণাবাঈও তার মাথায় হাত ঠেকিয়ে কি যেন প্রার্থনা করেছিল—কে জানে কি কামনা করেছিল সে! আর—

আর আবু আলী সিনহার সমাধি দেখে হাকিমসাহেবের সেই দারুণ অস্থির আর উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তিও ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। আবু আলী নাকি ছিল মস্ত এক হাকিম (চিকিৎসক)। কবে তুর্কীস্তানের বোখারা থেকে এসে সে হামাদানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল তা কেউ জানে না।

জান ভিখু, হাকিমী শাস্ত্র নিয়ে এমন কেতাব লিখে গিয়েছেন এই আবু আলী, উদীপ্ত হয়ে কথাগুলো বলেছিল হাকিমসাহেব, গ্রীক চিকিৎসকরা পর্যন্ত চমকে গিয়েছিল। কত রকমের গাছ-গাছড়ার নাম আছে সে-কেতাবে! কেন যেন বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল হাকিমসাহেব, আর দূরে দূরে হামাদানের চারদিকের ন্যাড়া

* "Persia Past and Present." Jackson William.

পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে কেন যেন তার চোখদুটোর দৃষ্টি সুদূর-প্রসারী হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্য একটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার মুখখানা, সুখস্বপ্নের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছিল, এইসব পাহাড়, বন, মাঠ-ঘাটের নাম না-জানা গাছ-গাছড়ার ভেতরে এমন বনৌষধি আছে—

এই বনৌষধির কথাই ভেবে ভেবে হাকিমসাহেব যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। আগের মতো আর দেশ-বিদেশের কথা বলে না, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে না। পারস্যের মাটিতে পা দেওয়ার পরই তার সেই পিতৃসম স্নেহচ্ছায়ার আড়ালটা যেন সরে গিয়েছে। দিবারাত্র সেই কোথাকার কোন্ সিমোনভকে খুঁজছে আর হামাদানে, তেহরানে, উর্মিয়ার বাজারে চীনা, কাবুলীদের ডেরায় ডেরায় যেমন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, তেমনি ঘুরছে তাব্রিজে।

তোমাদের যে কি ব্যাপার বুঝি না। কৃষ্ণাবাঈয়ের চোখে অনুযোগ ঘনিয়ে এল, সেই কখন বাজার থেকে এসে বসে আছি—

আর বল কেন, কপিচান্দভ তাদের ডেরায় টেনে গিয়েছিল।

তোমরা ওই কর—তুমি যাও তোমার কপিচান্দভের কাছে, আর একজন তো—

কেন, হাকিমসাহেব দুপুরে খেতে আসে নি?

কৃষ্ণাবাঈ মাথা ঝাঁকায়। মনের ভেতরে কি নিয়ে যেন নাড়াচাড়া চলে। আস্তে আস্তে বলে, আমাদের সঙ্গটা বোধ হয় আর তার ভাল লাগছে না।

ভিখু কোন কথা বলে না। মুহূর্তের জন্য তার বুকটা ভারী হয়ে ওঠে। সেই তীব্র অস্বস্তিকর পরিবেশের আড়ষ্টতা ভেঙে দিয়ে সে বলল, চল—চল—নীল মসজিদে যাবে না!

আমি তো সেই কখন থেকে সেজেগুজে বসে আছি। বাবুর সময় হবে—তবে তো? বলতে বলতে বুকের ওপরে বিভ্রমের ছবি এঁকে

খাঁটি মালদাই মসলিনের নীল পান্নাহাজার শাড়ির আঁচলটা গুছিয়ে নিয়ে বলল, চল।

তাব্রিজের রাজপথে সন্ধ্যা নেমেছে। শাঁ-শাঁ করে উত্তরের তুহিন শীতল বাতাস চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে তাদের চোখে-মুখে। ঘোড়ার খুরে খুরে খট্ খট্ শব্দ তুলে চলেছে তুর্কী, কাজাকী, মঙ্গোল, রুশ বণিকের দল। তাদের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে পুস্তিনের বোরকা পরে ধীরপায়ে চলেছে কৃষ্ণাবাঈ। নক্সা তোলা হামাদানী চামড়ার চটির ভেতরে তার গোলাপের পাপড়ির মতো নরম পা দুটোর (সুন্দর) দিকে তাকিয়ে দেশ-দেশান্তরের পথচারীরা গুঞ্জন করছে, কী মহরু পাদুটো! হিন্দু—হিন্দু—বাঙ্গাল।

'মসজিদি কাবুদ' অর্থাৎ নীল মসজিদের চারদিকে গভীর স্তব্ধতা থমথম করছে। ভেতরে কারা যেন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে একটা চেরাগ। মসজিদের সেই ঘন নীল পাথরের মাঝে মাঝে হলদে, সাদা, কালো, জাফরাণ রঙের ছোট ছোট পাথরগুলো খুঁটতে খুঁটতে কৃষ্ণাবাঈ বলল, আমার সময় সময় কি মনে হয় জান—মনে হয় আমি যেন একটা মিষ্টি স্বপ্নের দেশের ভেতর দিয়ে চলেছি। বলতে বলতে থেমে যায় সে। চোখদুটো কেমন গভীর হয়ে ওঠে তার। গভীর আবেশে ভিখুর বুকে মাথা রাখে সে। তার সুগন্ধী নরম চুলে হাত রেখে ভিখু বলে, গৌড়ের চিড়াইবাড়ির ঘাটে দাঁড়িয়ে কখনো ভাবতে পেরেছিলাম তাব্রিজের এই মসজিদি কাবুদে এমন একটা সন্ধ্যা আমরা—

আমি আর কিছু চাই না জান, তীব্র আবেগে ভিখুর বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে সে বলে, যেখানেই যাই, যতদূরে যাই, তুমি আমার কাছে থাকবে আর আমি তোমার বুকে—

তার কথা আর শেষ হলো না। উন্মত্ত একটা নেশার ঝোঁকেই যেন ভিখু তাকে কোলের ওপরে শুইয়ে নিল আর তার সুডৌল বুকে, মুখে, মাথায় তীব্র উত্তেজনায় থরো থরো কাঁপা আঙুল বুলিয়ে দিতে

দিতে কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, তুমি আমাকে এত—এত ভালোবাস কেন ? কি দেখেছো তুমি আমার—হঠাৎ থামল সে। কোন ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে যেমন মানুষ ভীত চোখে তাকিয়ে থাকে, তেমনি করে দূরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, আমি—আমিও যে তোমাকে কী ভীষণ ভালোবাসি তা বুঝতে পারলাম।

কি করে বুঝলে ?

ওই যে ইস্পাহানে যে সন্ধ্যায় চাহরবাগের ওদিকে জোবেদাকে নিয়ে হাকিমসাহেবকে খুঁজতে গিয়েছিলাম—সেই রাত্রে।

সেই রাত্রে কী ?

আমি ঘুমোতে পারি নি কৃষ্ণা। তোমার-আমার মাঝখান থেকে আপদটাকে বিদেয় করে—

জানি গো—জানি, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

খট—হঠাৎ সেই জনহীন দরগার চত্বরে কার পায়ের একটা শব্দ হলো।

কে ওখানে ?

আমি - আমি ভিখুভাই। এল হাকিমসাহেব, আমি তোমাদের সারা তাব্রিজ চুঁড়ে খুঁজছি—

কেন বলুন তো ? সারাদিন কোথায় ছিলেন ? দুপুরে খেয়েছেন কিছু ?

কৃষ্ণাবাঈয়ের কথা যেন শুনতেই পেল না হাকিমসাহেব। কিসের যেন একটা আলোর প্রতিভাসে উদীপ্ত হয়ে উঠেছে তার মুখ, যেন অনাগত কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি ঝকমক করছে তার দু'চোখে।

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

না, বসব না। বেশি সময় নেই হাতে। দ্রুত—খুব দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বলল হাকিমসাহেব। মসজিদি কাবুদের সেই জ্বলন্ত চেরাগের শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আর ভেতরে ভেতরে দারুণ আবেগে ভেঙে পড়ে বলল, সিমোনভের খোঁজ পেয়ে গিয়েছি।

তাই নাকি! কোথায়? এখানকার রুশী বণিকদের তল্লাটে? তাদের চোখে কৌতূহল জ্বলজ্বল করে।

হাকিমসাহেব মাথা ঝাঁকায়। অস্পটস্বরে বলে, এখানে একজনের কাছে খোঁজ পেয়েছি, সে নাকি বোখারাতে আছে।

বোখারা? সে তো অনেক দূর!

কে এই সিমোনভ হাকিমসাহেব?

হাকিমসাহেব কোন কথা বলল না। তার চোখে-মুখে তীব্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

সিমোনভ কে!—সিমোনভ কে!—বিড় বিড় করে বলতে বলতে হাঁটু মুমড়ে আস্তে আস্তে বসে পড়ল দরগার সেই চত্বরে। ভিখুর মনে হলো, যেন কোন জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতিকীর্ণ একটা বোধে আলোড়িত হয়ে উঠেছে হাকিমসাহেবের সমস্ত অস্তিত্ব। ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট গলায় বলল, শোন, যে কথা কখনো কাউকে বলি নি। সিমোনভ আমারই মতো এক হাকিম। ত্রিশবছর আগে আমি যখন তেহরানের স্থায়ী বাসিন্দা, তখন সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। থামল হাকিমসাহেব। আবার উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, এই সিমোনভের মতো গুণী লোক আর দেখি নি। শ্রদ্ধায় গভীর হয়ে উঠল তার চোখদুটো। 'তা –লিক্ সে—রিক্', 'মখজেন—উল্—আদ্বিয়' তার কণ্ঠস্থ ছিল।

তা—লিক্ সে—রিক্ কি?

পারশী ভাষায় লেখা গাছ-গাছড়ার ওষুধ সম্বন্ধে লেখা বিখ্যাত কেতাব। কিন্তু কেতাবী বিদ্যায় হাকিমি করা যায় না ভিখুভাই। কোথায় হিমালয়ের কোন্ পাহাড়ে, তিব্বতের কোন্ অন্ধকার গুহার পাশে ঝোপঝাড়ের ভেতরে পাওয়া যায় হালিম, পাওয়া যায় নাগরঙ্গী —সে-সব ছিল তার নখদর্পণে।

সেগুলো কি?

হালিম হলো খুব ছোট ছোট একধরনের গাছ। সাদা সাদা ফুল

হয় তার। তার বীচি ঘুংড়িকাশির অব্যর্থ ওষুধ। এই বনৌষধি আরবে, আলবেনিয়ায়, তিব্বতে, সিরিয়ায়, গ্রীসে দীর্ঘকাল থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আর নাগরঙ্গী?

ভুটান, সিকিম আর খাসিয়া পাহাড়ের জঙ্গলে প্রচুর জন্মায় এই গাছ। রক্তপিত্তজনিত উদরাময় রোগে—

আপনার বন্ধু একজন রুশ হয়ে এসব গাছের খোঁজখবর কি করে জানলেন, আশ্চর্য তো!

বাঃ, তোমাকে বললাম না, হাকিমি তার পেশা ছিল না, ছিল ব্রত। টবোলস্ক থেকে সে কাজাকিস্তানের মরুভূমি পার হয়ে চলে আসতো বোখারায়। বোখারা থেকে তার দেশোয়ালী সওদাগরদের কাফেলায় করে চলে যেত দুর্গম পাহাড় পেরিয়ে আফগানিস্তান হয়ে তিব্বতে। হিমালয়ের বনে বাদাড়ে একটা ক্ষ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতো।

বনৌষধি খুঁজে বেড়াতো বুঝি?

ওসব গাছ-গাছড়া তো তিব্বতী পুরোহিতরাই বোখারায় বিক্রি করতে আসতো।

তাহলে সিমোনভ হিমালয়ে যেত কেন?

কোন কথা বলল না হাকিমসাহেব। আবার তার মুখে সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার ছাপ পড়ল। গাঢ় গলায় বলল, ওই তিব্বতী হাকিম আর গাছ-গাছড়ার সওদাগরদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মেলামেশার ফলে তার একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল। ভিখুর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, তার ধারণা হয়েছিল, জরাকে জয় করা যায়; জয় করা যায় মৃত্যুকে। এমন বনৌষধি নিশ্চয়ই তিব্বতের কি হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ের কোথাও না-কোথাও—

আপনারও কি সেই বিশ্বাস?

হাকিমসাহেব কথা বলল না। তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে

যেন আগুন ছিটিয়ে দিয়েছে। ছটফট করতে করতে উঠে দাঁড়াল আর রাতের রাশি রাশি তারায় ভরা বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, তা নাহলে আমি ঘর-সংসার ছেড়েছিলাম কেন? কেন বিশ বছর ধরে—হঠাৎ থেমে গেল। নিজেকে সংযত করে বলল, আমি —আমি কাল সকালে বোখারায় যাচ্ছি।

না-না হাকিমসাহেব। তাদের দু'জনের কণ্ঠেই যেন হাহাকার ফুটে উঠল।

না, বাধা দিও না ভিখু। স্থির বিশ্বাসের আলোয় উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তার চোখদুটো। কান্না ভার-ভার গলায় কৃষ্ণাবাঈ বলল, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন হাকিমসাহেব, এই বিদেশ-বিভুঁই—

হাকিমসাহেব, একটা অনুরোধ করব! ভিখু তার হাতদুটো ধরে ব্যাকুল হয়ে বলল, শুধু আজকের রাতটুকু আমাদের সঙ্গে থাকুন! কপিচান্দভদের বলে-কয়ে দেখি সরাইখানা থেকে যদি কোন কাফেলা বোখারা যায়। তাদের বলে দেব, তারা আপনাকে যত্ন করে নিয়ে যাবে।

বেশ! একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল হাকিমসাহেব।

পরদিন খুব ভোরে ভিখু হাকিমসাহেবকে নিয়ে ছুটল কপিচান্দভ-দের বাড়ির দিকে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো বরফ ঝরছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। ভারতীয় সওদাগরদের পাড়ার কাছে যেতেই দেখল, সেখানকার কাফেলার সরাইখানার চত্বরে রাশি রাশি হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া (ঠিক যেমন হোসেনচাচা বাগদাদ থেকে আমদানী করেছিল), গোরু, বকরী, ভেড়ার পাল আর অদূরে দীর্ঘ একটা কাফেলা কোথায় যেন রওনা হচ্ছে। তার কোন উটের পিঠে নানারকমের পশম, দুম্বার আর বকরীর চামড়া, কারো পিঠে স্তূপাকৃতি বার্চ গাছের কাঠ, কোথাও তীর, বল্লম, তলোয়ার, শীলমাছের দাঁত, মোম, মধু আরও কত রকমের পণ্যসম্ভার। কাফেলার শেষের দিকে তিন-চারটি উটের পিঠে

গাদাগাদি করে বসে আছে ছেঁড়া ছেঁড়া ময়লা আলখাল্লা পরা কাজাকী, কিরগিজ ইত্যাদি নানা যাযাবর উপজাতিদের জওয়ান মেয়ে-পুরুষ। তাদের ভেতরে আবার দু'একজন লাল লাল চেহারার 'স্লাভ'ও আছে। ভিখুর মনে পড়ে গেল, কপিচান্দভ একদিন বলেছিল, এখান থেকে অনেক দাসদাসী চালান দেওয়া হয় বোখারায়, সমরখন্দে, ইয়ারখন্দে, আফগানিস্তানে, ভারতে। কিন্তু সেসব চিন্তা-ভাবনা করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। খাজারী-কাজারী-ভারতীয়-ইরানী-রুশী ব্যাপারীদের সেই ভীড়ের ভেতরে চেনা মুখ খুঁজে বেড়াতে লাগল আর ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এই কাফেলা কোথায় যাবে ভাই?

এই ভিখুভাই, তুমি যাবে নাকি? হঠাৎ পশম বোঝাই একটা উটের পিঠ থেকে কপিচান্দভের উল্লসিত গলার স্বর ভেসে এল।

আরে! তুমি—তুমি কোথায় যাচ্ছো?

আর বল কেন, বুলজার থেকে (ভল্গার তীরের বন্দর) পশমের চালানটা হঠাৎ এসে গেল। বোখারাতে আবার এই সময় তেহরান থেকে, কাবুল থেকে, চীন থেকে—

তুমি কি বোখারায় যাচ্ছো? তাহলে ভাই আমাদের হাকিম-সাহেবকে নিয়ে যাও না তোমার সঙ্গে!

কোন্ হাকিমসাহেব! ওই যে তোমার সঙ্গে বাঙ্গালা থেকে এসেছে—যে রুশী ব্যাপারীদের মহল্লায় কোন্ রুশী হাকিমকে তল্লাশি করে বেড়ায়?

বলতে বলতে নেমে এল চান্দুরিভ্যান্ কপিচান্দভ। নেমে এসেই হাকিমসাহেবের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, চলুন হাকিম-সাহেব। খুব যত্ন আর আরাম—

হ্যাঁ—হ্যাঁ ভাই, আমার বাপজানের মতো, দেখো যেন কোন কষ্ট না হয়। বলতে বলতে গলা ধরে এল ভিখুর। রাহা-খরচ বাবদ কিছু তোমায়ুন দিতে গেল। অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠল কপিচান্দভ। চোখ

পাকিয়ে বলল, খবরদার, ভুলে যেও না ভিখুভাই, তুমি যে দেশের লোক—আমিও সেই দেশের লোক। হাকিমসাহেব তোমার কাছে যা, আমার কাছেও তাই ভাই।

কাফেলা ছেড়ে দিল।

দূরে—বহুদূরে অপসৃয়মান সেই কাফেলার মাঝখানের একটা উটে কপিচান্দভের সেই রাশীকৃত পশমের বস্তার আড়ালে হাকিম-সাহেবের অস্পষ্ট ঝাপসা মূর্তিটা যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ভিখু। তার মনের অন্ধকারে থরে থরে ফুল ফোটার মতো ফুটে উঠতে লাগল অতীত দিনের কত স্মৃতি—সেই তাকে নিয়ে গৌড়ের চিড়াইবাড়ির ঘাটে ভেনিসের না কোথাকার সাহেব সেই সীজার ম্যাকেঞ্জির কাছে তার জন্য জাহাজ কিনতে যাওয়া; মালদাই রেশমের কি কি কাপড় নিয়ে সে রওনা হচ্ছে তা খাতায় লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করা; তার এই দূর বিদেশে বাণিজ্য করতে আসার জন্য তাকে নিশিদিন উৎসাহ দেওয়া; হোসেনচাচার বৈঠকখানার সেই সভায় বসে বাগদাদ, বসোরার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে তার কত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা; সেই সুদূর ভল্গা-কাস্পিয়ান উপত্যকার বিচিত্র পণ্য-সম্ভার সম্বন্ধে তার বর্ণনা—আরো কত টুক্‌রো টুক্‌রো কথা, কত দৃশ্য, সব—সব যেন মিষ্টি একটা সৌরভের মতো তাকে জড়িয়ে ধরল। আর—

আর দূর দিগন্তে ঝাপসা একটা বিন্দুর মতই মিলিয়ে গেল কাফেলা।

॥ কুড়ি ॥

তোমাকে একটা কথা বলব ! দূরে সরাইখানার জানালার ওপারে আকাশের গায়ে আঁকা বরফে ঢাকা এলবার্জ পাহাড়ের সাদাচূড়াটার দিকে চোখদুটো ভাসিয়ে দিয়ে বলল কৃষ্ণাবাঈ, এবার দেশে ফিরবে ? কেমন অবসন্ন আর ক্লান্ত শোনালো তার গলার স্বর।

ভিখু কথা বলল না। হাকিমসাহেবের আকস্মিক বিদায়টা তাদের চেতনাকে কেমন বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। মনের ভেতরে অদ্ভুত একটা শূন্যতা থমথম করছে। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাদের ঘরের কোণে স্তূপাকৃতি পণ্যসম্ভারের দিকে। তারা চলে যাবে আরও উত্তরে। পারস্য ছাড়িয়ে যাবে কাস্পিয়ানের তীরে, যাবে আস্ত্রাখানে, চলে যাবে ভল্গার বন্দর সেই বুলজারে। আর সেইসব শহরের বাজারে বেশ চড়াদামে বিক্রি করবে বলে তাব্রিজের বাজার থেকে কিনেছিল মোরান্দের (আজারবাইজানের একটি ব্যবসাকেন্দ্র) রেশম, খুয়ির কালো মখমল, এরাওয়ানের* তুলো, মারাঘার রঙীন সুতীর কাপড়—তাছাড়া তাদের নিজেদের মালদাই রেশমের কিছু কাপড় তো তখনও অবশিষ্ট ছিলই। শুধু বস্ত্রসম্ভার নয়, কপিচান্দভের কাছে শুনেছিল তাদের দেশের নীল অর্থাৎ রুশীয়রা যাকে বলে 'ক্রাসকা', আদা, সুগন্ধী মশলার খুব চাহিদা আছে সেই সুদূর রুশ-মুলুকের বণিকদের কাছে। তাই সে তাব্রিজের ভারতীয় সওদাগরদের কাছ থেকে এইসব মালও কিছু কিনেছিল। এসব কৃষ্ণাবাঈ জানে। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হাকিমসাহেবের চলে যাওয়াটা যেন

* আজারবাইজানের রাজধানী তাব্রিজ আর খুয়ি, এরাওয়ানা, মারাথা তাব্রিজের আশপাশের ব্যবসাকেন্দ্র।

সব কেমন এলোমেলো করে দিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি যখন বলছো তখন তাই হবে। বলেই তার দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ভিখু।

মেঘে ঢাকা আকাশ। ভিজে ভিজে বাতাস বইছে। গোল গোল নুড়ি বিছানো যে রাস্তাটা বাজারের পাশ দিয়ে চলে গেছে, সেই লাল লাল ইটের তৈরি তা-কী-আলী শাহের সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদকে বাঁয়ে রেখে চলে গিয়েছে তাব্রিজের সবচেয়ে বড় কাফেলার সরাইখানার দিকে। সেই পথ ধরে চলেছে ভিখু। মাথার ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যাচ্ছে। কৃষ্ণাবাঈ কিছু বললে সে অগ্রাহ্য করতে পারে না, পারে না ঝেড়ে ফেলে দিতে। তার সমস্ত চেতনার ভেতরে নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করে তার মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মতো কমনীয়তা মাখানো সুডৌল মুখাবয়র। কিন্তু কাস্পিয়ান আর ভল্গার এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হবে! বেদনায় তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। আবার—আবার সেই নিমাসরাই আর রোহনপুর, ট্যাপজানী আর সাহুল্ল্যাপুরের হাটে হাটে তাঁতের মাকুর মতো ঘুরে ঘুরে রেশমের সুতোর পেটী বিক্রি করা—শ্বাসরোধী অন্ধকার কবরখানার সেই ভয়াবহ জীবন!

বাদ্‌কুবা—বাদ্‌কুবা—বাকুইয়ান—ফার্‌শাখহ—সরাইখানার দিক থেকে যাত্রীদের সমবেত কলরব ভিখুর কানে এল। হয়তো ব্যাপারী-বণিক-দালালরা কোথাও যাওয়ার তোড়জোড় করছে। দেশ-দেশান্তরের সওদাগরদের মিলনস্থল এই সরাইখানাগুলোতে যাত্রীদের মৃদু-গুঞ্জনের ভেতরে যেন সে বিশাল পৃথিবীর আহ্বান শুনতে পায়। তাই একটু সময় ও সুযোগ পেলেই চলে আসে কাফেলার পান্থশালায়।

রওঘাম্ মা-দি-নি-নি, নাফিসা—

কী ব্যাপার!—কী বলে এরা? সরাইখানার পাথর-বাঁধানো উঠোনটার এক কোণে জটাধারী এত সাধু-সন্ন্যাসীরই বা

ভীড় কেন। তাদের হাতে আবার কমণ্ডলু! কাছে-পিঠে কোথাও মন্দির-টন্দির আছে না কি রে বাবা! এককোণে দাঁড়িয়ে ভিখু ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগল।

রুশীয়, তাতার, কশাক, কাজাকী, ইরানী সওদাগররা খুব ব্যস্ত হয়ে নিজেদের মালপত্রের তদারক করছে। কাফেলার সারবান জাম্মালদের সঙ্গে সুটুরের ভাড়া নিয়ে দর-কষাকষি করছে। হঠাৎ সেই ভীড়ের ভেতরে কপিচান্দভদের পাড়ার মুলতানী সওদাগর মোহনলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছেই জানত পারল, কাল ভোরে তিনটি কাফেলা রওনা হবে এই সরাইখানা থেকে। একটা যাবে খাজারের রাজধানী ইটিলে, সেখান থেকে চলে যাবে নভোগোরোদ, স্মোলেনস্ক, কিয়েভে—যাবে রস্টোভ, সুজদালস্ক আর ভ্লাডিমিরিরের ভেতর দিয়ে। আর একটা কাফেলা যাবে তেহরান, ইস্পাহান হয়ে বোখারার দিকে। এই কাফেলা বোখারার নাখ্‌খাসে (দাসদাসীর হাট) বহন করে নিয়ে যাবে জীবন্ত-পণ্য ক্রীতদাস। অন্য একটা কাফেলা যাবে কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীরের সেই রহস্যময় জনপদে, যেখানে আছে অগ্নিদেবতার মন্দির। ভেতরে গেলে দেখা যাবে, ভূগর্ভ থেকে অনির্বাণ যজ্ঞাগ্নি জ্বলছে দাউ-দাউ করে। এই অগ্নিহোত্রীর মন্দির লক্ষ্য করে পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী আর সন্ন্যাসী তান্ত্রিকরা আসে সিন্ধু থেকে, পাঞ্জাব থেকে, আসে উত্তর-ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে। আরও—

মোহনলালের কাছ থেকে সে আরও জানতে পারল, আগামী কোন তিথিতে সেই অগ্নিদেবতার পুজো হবে। সব বৃত্তান্ত শেষ করে মোহনলাল তার উৎসুক আর স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, যাবে নাকি তুমি সেখানে? আরে শুধু পুণ্যি হবে না, কারবারটাও ভালোই হবে।

মানে? মন্দিরে আবার ব্যবসা—

আহা! শুধু কি মন্দিরই আছে নাকি, বাদ্‌কুবার (বাকুর

পুরানো নাম) বাজারে রুশী সওদাগররা পার্শী রেশম কেনে। আর তোমাদের দেশের রেশম পেলে অন্য কিছু চায় না জান, দারুণ পুরুষীদান—

ভিখুর বুকের ভেতরে যেন অদৃশ্য সেতারের রাগিণী বাজতে লাগল। মনের ভেতরে দুলে উঠল কৃষ্ণাবাঈয়ের কোমল বিষণ্ণ মুখখানা। অগ্নিদেবতার পুজোর কথা শুনলে সে খুশি হবে, এখুনি যেতে চাইবে।

আরে, তোমার এত খোয়াফ্ (ভয়) কি, আমিও তো যাব।

হেঁ-হেঁ, আরে মোহনলাল ভাই, তোমার দোস্ত বুঝি দামদ্-সুদা (বিবাহিত)। হায়েনার মতো শুকনো খটখটে হাসি হাসতে হাসতে মোটা-সোটা দেহটা নিয়ে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে তাদের কাছে এল আর একজন। মাথা কামানো। লাল টকটকে চেহারা। চেনা নেই, শোনা নেই ভিখুর থুতনিটা ধরে একটু নাড়িয়ে দিয়ে সে হাসির রেশ টেনে টেনে বলল, কী ভাই, ঘরে নিশ্চয়ই মকবুল জা-নি বুজুরুগ্ আছে ?

এই ও বেতমীজ লাত্সিলিভ্যান ! চিমটে হাতে নিয়ে তেড়ে এল এক সন্ন্যাসী। চিমটেটা মাটিতে ঠুকে চোখ পাকিয়ে বলল মোটা লোকটাকে, দেখছিস না আমার দেশের খানদানী সওদাগর। কী রকম হাসিন চেহারা—

তা আমি কি তোমার দেশের বেনিয়াকে কামড়ে—

তুই সব পারিস, তুই ব্যাটা তাতার মায়ের পেটে জন্মেছিস।

এই, মুখ সামলে কথা বল সন্ন্যাসী-ঠাকুর, মনে রেখ·আমার বাবা কিন্তু তোমাদের দেশওয়ালী !

ছিঃ ছিঃ, আপনি কি করছেন উড্যাসী বৈভ্যাসভ ? ছুটে এসে মাঝখানে পড়ে মোহনলাল কোনরকমে তাদের থামালো, বলল, সন্ন্যাসী-ঠাকুর, আপনি একজন আস্ত্রাখানী সন্ন্যাসী। হিন্দু ব্রাহ্মণ। আপনি ওই মুতফাই-র (জারজটার) সঙ্গে নিজা (ঝগড়া) করছেন !

আশ্চর্য! এইবার মুলতানী সওদাগর লাত্ সিলিভ্যান মোহনলালের গালপাট্টা, কালো কুচকুচে দাড়ির জঙ্গলে আচ্ছন্ন শক্ত চোয়াল আর লম্বা মজবুত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। হয়তো তার জন্মলগ্নের অভিশাপের কথা মনে করেই 'জারজ' বলে গালাগাল শুনেও চুপ করে গেল।

ভিখু কিন্তু আস্ত্রাখানী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী আর তাতারীর সন্তানের সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে যেন বহু—বহুদূরের অজানা একটি দেশের বিচিত্র জনতার রঙীন মিছিল দেখতে পেল। মোহনলাল তাকে তখনো চিন্তিত দেখে একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই বলল, তোমার যদি কোন অসুবিধা থাকে—

না-না মোহনলাল ভাই, বলছো কি তুমি! আবেগে তার হাতদুটো জড়িয়ে ধবে বলল, আমাদের দু'জনেব জন্য একটা সুটুর ঠিক করে দাও।

দু'জন! ও, তোমার বিবি!

ভিখু চোখদুটো নামিয়ে নিল। দুলে উঠল তার বুকের ভেতরটা। একটুও না ভেবে সপ্রতিভ হেসে বলল, হ্যাঁ।

কথা শেষ করে ভিখু চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মোহনলাল ডাকল, শোন ভিখুভাই—ভিখু মুখ ফিরিয়ে দেখল, মোহনলালের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন রুশীয় বেনিয়া। তাদের ভেতরে গাট্টাগোট্টা শক্ত মজবুত চেহারার লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এর নাম গুরোভ। আর ডানদিকে লম্বা ছিপছিপে চেহারার লোকটাকে দেখিয়ে বলল, এর নাম সুচ্স্কোভ। এরা মস্কাউ থেকে আস্ত্রাখান, বাকু হয়ে, তাব্রিজে মাল বেচতে আসে।

সেলাম-সেলাম! ভিখু একমুখ হেসে তাদের সেলাম জানিয়ে বলল, কিসের ব্যবসা?

আরে পশম—পশম। ওদের মতো ভালো জাতের পশম আর কেউ এখানে বিক্রি—

এ আর কি পশম দেখছো মোহনলাল ভাই, সুচ্‌স্কোভ বলে, কালো রঙের নরম তুলতুলে সেই পশম যদি দেখতে! কিন্তু সেই পশম জোগাড় করা খুব কঠিন। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে বলে গুরোভ।

আবার হেসে মোহনলাল বলল, আর একটা ব্যাপার কি জান ভিখুভাই, এরা দু'জনে কাফেলায় থাকলে কোন রাহজানের ক্ষমতা নেই কাছে ঘেঁষে।

কেন, এই রুশী ভাইরা বুঝি খুব ভালো তলোয়ার চালাতে পারে?

ওরে বাপ্‌রে! মোহনলাল বলে, গুরোভভাইয়ের হাতের তলোয়ার ঘোরে যন্ত্রের মতো।

মুখোমুখি প্রশংসায় গুরোভ মাথা নীচু করে। বলে, কি যে বলে মোহনলাল ভাই!

ডিং-ডং-ডিং-ডং।

কাফেলা চলেছে অনির্বাণ যজ্ঞাগ্নির দেশে, চলেছে কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে বাদ্‌কুবাতে।

বল, জয় বাবা অগ্নিহোত্রী কী জয়!

জয় অগ্নিহোত্রী কী জয়!!! উড্যাসী বৈভ্যাসভের জয়ধ্বনিকে সমর্থন করে সন্ন্যাসী আর তীর্থযাত্রীরা গগনভেদী চীৎকার করে ওঠে। মুহূর্তের জন্য উটগুলোও থমকে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সারবানের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়, এই ও বেতমীজ কাঁহাকা!

ইন—টিফল খায়েলী ফীর্জ-অস্ত্।

হে-হে-বি-রাভিম্—হে-হে-বি-রাভিম্।

হেঁকে ওঠে কাফেলার জাম্মাল।

কাফেলা চলতে থাকে।

কৃষ্ণাবাঈয়ের মনের ভেতর বিপুল একটা আনন্দ নিঃশব্দে মোমের মতো গলে গলে পড়ছে। বোরকার আড়াল থেকে ফিসফিস করে বলল, আমি কিন্তু অগ্নিদেবতার মন্দিরে পুজো দেব—কেমন! আদুরে কিশোরীর মতো ভিখুর বুকে মাথাটা এলিয়ে দেয়। ভিখু হাসে। পরম

স্নেহে তার নরম হাতদুটো বুকের ভেতরে নিয়ে বলে, কেন, দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিলে না! একটু থামে। আবার হেসে হেসে বলে, পুজো তো দেবে, দেবতার কাছে কী প্রার্থনা করবে?

প্রার্থনা! অস্ফুট একটা স্বর বেরিয়ে আসে কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখ থেকে। কিছু বলে না। বলতে পারে না। বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। ভিখু দেখতে পায় না। তার সজল দুটো চোখের করুণ দৃষ্টি যেন নিশঃব্দে বলে, আছে—আছে, তোমাকে ঘিরে ঠাকুরের কাছে এত প্রার্থনা করার আছে, যা বলে শেষ করা যায় না।

এবার কিন্তু বাদ্‌কুবার মেলার ওপরে রুশীয় সর্‌বজ্‌রা হামলা করবে। কে একজন বলে।

আর শাহ শিরওয়ানের* সর্‌বজ্‌রা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে? খেঁকিয়ে উঠল উড্যাসী বৈভ্যাসভ।

রাখ রাখ, তুমি তো শিরওয়ানের এক নম্বরের পা-চাটা। আর একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তার পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়া জটাটা গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আর রুশীয়রা এলেই বা কি, তারা কখনো আমাদের মেলা কি মন্দিরের কোন ক্ষতি করবে না।

হ্যাঁ, ঠিক কথা, তুমি তো বাবা রুশীয়দের আস্ত্রাখানে বসবাস করে চুল পাকিয়ে ফেললে। আর একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত বলল, দেখনি, সারা আস্ত্রাখান জুড়ে হিন্দুর মন্দিরের পাশাপাশি মসজিদ, গীর্জা†, রুশীয়রা কখনো কারো ধর্মের ওপরে আঘাত করে না।

ভিখু কান পেতে তাদের আলোচনা শুনছে দেখে মোহনলাল বলল, বুঝলে ভিখুভাই, শুধু এই সাধুসন্তরা নয়, আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েরও রুশীয়দের সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা। একটু থামে। আবার বলে, চল আস্ত্রাখানে, চল বাকুতে, দেখবে আমাদের দেশের ব্যাপারীরা ব্যবসার সূত্রেই বংশপরম্পরায় স্থায়িভাবে বাস করছে।

* "Encyclopedia of Islam", Vol. II, P. 966-67

† "ভারত-রুশ"—পি. এম. কেম্প, পৃঃ ২৪

আমাদের 'জার' ইভান বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে খুব উৎসাহ দেয়। রুশীয় সওদাগর প্লুচ্স্কোভ পাশের উট থেকে বলল, আর আমাদের দেশের লোক খুব সরল, সাদাসিধে, অল্পে সন্তুষ্ট, কারো সঙ্গে 'নিজা' পছন্দ করে না।

শুধু তাতারদের সঙ্গে ছাড়া। ফোঁস করে উঠল লাত্সিলিভ্যান।

চুপ কর হারাম্জাদা (জারজ)। উড্যাসী বৈভ্যাসভ গর্জে ওঠে, তাতারদের কিছু বললে তোর গায়ে ফোস্কা পড়ে কেন রে? তুই তো দো-আঁশলা।

তাতারদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা কি আজকের? কারবারী লাত্সিলিভ্যানের দিকে খরচোখে তাকিয়ে পশমের ডামিট্রিচ গুরোভ বলে, তাতাররা তো একসময়ে আমাদের গোটা দেশটাকেই দখল করেছিল। কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত যে হয়েছে! একটু থামে সে। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, এই পাঁচ বছর আগেও তো রক্তখেকো নেকড়ের মতো তাতাররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের পবিত্র মস্কাউ নগরীতে—আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল ক্রেমলিনের রাজবাড়িতে। আগুনে পুড়ে আর ওই মরুভূমির কুকুরগুলোর তলোয়ারের ঘায়ে—

থাক-থাক, ওসব পুরানো কথা ছেড়ে দাও গুরোভভাই। মোহনলাল অপ্রিয় সেই প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেষ্টা করে। ভিখুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, জান ভিখুভাই, ওই লাত্সিলিভ্যানের আসল নাম 'লক্ষ্মণ', ওর বাপ ছিল সিন্ধি। আস্ত্রাখানে নাকি 'পধন' ছিল (সরাইখানার মালিক)। আমাদের দেশের আদব-কায়দা, চালচলন কত শেখাতে চেষ্টা করেছে ওই বেতমীজটাকে, কিন্তু ওর রক্তের ভেতরে আছে তাতারদের সেই হিংস্রতা।

দেখো, আমাদের এই কাফেলার ওপরেই কুকুরগুলো আবার কোন হামলা না করে! উড্যাসী বৈভ্যাসভ লাত্সিলিভ্যানের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। লাত্সিলিভ্যানের খুদে খুদে গভীর দুটো চোখে ধু-ধু করতে লাগল বন্য হিংসা।

ঝক্—গুরোভ শব্দ করে কোষ থেকে বের করে ফেলল ঝকঝকে একটা তলোয়ার। তীক্ষ্ণধার ঝকমকে সেই তলোয়ারের ডগাটা লাত্‌সিলিভ্যানের বড়ির মতো ছোট নাকটার কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলল, জানিস তো, এটা কোথাকার! এটা খোদ 'রাইন' নদীর ওপারের মাল, বুঝলি! দু'দিকে যতই বাঁকাও, কিছুতেই ভাঙবে না। তোর মামারা এলে—

হাসির রোল পড়ে গেল কাফেলায়। সেই দীর্ঘ জটাধারী সন্ন্যাসী মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলল, তাতারদের ওষুধ আছে আমার কাছে।

ডিং-ডং—ডিং-ডং—

বেলা বাড়ে। কাফেলা চলে। ক্রমে সেই অগ্নিদেবতার দেশ, 'রাওঘামে'র (খনিজ তেল) সেই রহস্যময় দেশ বাকুয়িয়ান কাছে এগিয়ে আসে।

কৃষ্ণাবাঈয়ের বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তার চোখে ভেসে ওঠে ইস্পাহানের রাস্তায় রাহাজানির সেই বীভৎস দৃশ্য। ফিসফিস করে বলে, তাব্রিজ থেকে দেশে ফিরে গেলেই হতো। একটু থামে, আবার যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বলে, আমার কেমন ভয়-ভয় করছে!

ভয় কী! কাফেলায় কত লোক আছে। এদের প্রত্যেকের কাছে আছে অস্ত্র। ভিখু ভরসা দেয় আর নিমাসরাইয়ের সেই ভালকা বাঁশের লাঠিটার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, আমার এটাও তো আছে।

তার কথা শেষ হতে না-হতে হঠাৎ দূর-দিগন্ত থেকে যেন ভেসে এল ঝড়ের শব্দ। থমকে দাঁড়ালো কাফেলার ভারবাহী জানোয়ারগুলো। নিস্তব্ধ প্রান্তরে বেজে উঠল একসঙ্গে অনেকগুলো দ্রুত ধাবমান অশ্বখুর ধ্বনি।

রাহ্‌জান—রা হ্‌ জা ন—তা তা র—তা তা র! আর্তনাদ উঠল

কাফেলায়। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ঘোড়ার খুরের শব্দে চারদিক সচকিত করে এসে পড়ল তাতার-দস্যুরা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল কাফেলা। এক-একটার যমদূতের মতো চেহারা। ন্যাড়া মাথায় ছোট ছোট টুপি, তার নীচে খুদে খুদে চোখে নরহত্যার আদিম অনুপ্রেরণা ঝকমক করছে। গায়ে রঙীন আলখাল্লার মতো ঢিলে চোগা ঝুলে পড়েছে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত। বুকে দুলছে রঙ-বেরঙের কাঁচ এবং পুতির ভারী ভারী মালা। সেই মালার বোঝার ভেতরে দু'একটা মাদুলিও দেখা যাচ্ছে। তাদের হাতের খোলা তলোয়ারে চকচক করছে মৃত্যুর অনিবার্য ইঙ্গিত। সেই সর্দারের দিকে তাকিয়ে গুরোভ চীৎকার বলল, যদি প্রাণে বাঁচতে চাস—তাহলে পালা—

হা-হা-হা—অট্টহাসি হেসে ওঠে দস্যুসর্দার। তার সেই অট্টহাসির প্রচণ্ড শব্দ দুপুরেব নিস্তব্ধতার বুক চিরে বয়ে গেল লহরে লহরে। হাসির রেশ থামলে বলে, আরে স্লাভকুত্তা! তাতারের কোন বাচ্চাকে কখনো পালাতে দেখেছিস! বলেই হঠাৎ হিংস্র একটা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়তে এল গুরোভের উপর। ভিখু দেখল, গুরোভ বোঁ-বোঁ করে সেই তীক্ষ্ণধার রুশী তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ঘ্যাচ্ করে এমন এক কোপ বসালো যে, সর্দারের ডান হাতের একটা আঙুল কেটে দূরে ছিটকে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল রাহ্জানদের সর্দার। সেই তাজা রক্ত দেখে খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো হিংস্র হয়ে উঠল ডাকাতেরা। তাদেরই একজন দূর থেকে একটা বল্লম গুরোভের মাথা তাক করে ছুঁড়তে যাবে, এমন সময় ভিখু শাঁ-শাঁ শব্দে লাঠিটাকে চক্রের মতো ঘুরিয়ে নিয়ে সেই উটের পিঠ থেকে শূন্যে এক লাফ দিয়ে পড়েই লাঠির ঘায়ে বল্লমধারীকে ধরাশায়ী করে ফেলল। ঠন্ শব্দ করে ছিটকে পড়ল বল্লমটা। ভিখু এমন করে তার মাথার চারদিক দিয়ে লাঠি ঘোরাতে লাগল যে, ডাকাতেরা মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে

গেল। তার লাঠি ঘোরানোর অপূর্ব কায়দা দেখে তলোয়ার চালাতে চালাতেই দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল গুরোভ, বাহবা—বাহবা ভাই! তোমার—তোমার ওই লাঠির জন্য বেঁচে গিয়েছি।

ভিখুর লাঠি তাতারদের কারো মাথায় পড়ছে, কারো হাতে পড়ছে। কিন্তু গুরোভ কি ভিখু কেউ দেখতে পেল না, সেই আহত সর্দার আঙুল চেপে ধরে কোনরকমে উঠে এসে পিছন থেকে ভিখুর মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ারের কোপ দিতেই ঠকাস শব্দে পড়ে গেল লাঠিটা। ওদিকে গুরোভ আরও চার-পাঁচজনের সঙ্গে একা লড়ছে! সেই সুযোগে ভিখুকে অতিকায় সেই দস্যুসর্দার জাপটে ধরে ঘোড়ার পিঠে তুলে ফেলল।

তীব্র ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে চোখ বুজল কৃষ্ণাবাঈ। কাফেলার সারবানরা হেঁকে বলল, এখুনি বাবুসাহেবকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে কুকুরগুলো আর কোথায় যে উধাও হয়ে যাবে—

এই কুত্তা, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে ওকে। চীৎকার করে উঠল মোহনলাল। গুরোভ, সুচ্স্কোভ এবং অন্যান্য যাত্রীরা আবার তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দী ভিখুকে ছিনিয়ে আনার জন্য। কিন্তু দুর্ধর্ষ মরুসন্তান তাতারদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। তারা বন্দীকে নিয়ে যেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিক্‌বিকীর্ণ প্রান্তরে উধাও হয়ে যাচ্ছিল, অমনি একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

এই মূর্খের দল, তোরা করছিস কি! ত্রিশূল হাতে নিয়ে হঠাৎ অশ্বারোহী তাতারদের সামনে দাঁড়ালো সেই বৃদ্ধ জটাধারী সন্ন্যাসী। তার দু'চোখে আগুন ঝরছে। জট-পাকানো সেই দীর্ঘ জটা খুলে পড়েছে পায়ের কাছে। তার হাড়-বের-করা চিমড়ে শরীরটার শিরায় শিরায় যেন বজ্রের শক্তি জেগেছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, জানিস কাকে তোরা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিস! ও বেনিয়া নয়। ও হলো অগ্নিদেবতার পুরোহিত, ব্রাহ্মণ। দেখেছিস কেমন আগুনের মতো গায়ের রঙ!

ব্রাহ্মণ পুরোহিত আমাদের কি করবে? বুকের মাদুলিটা শক্ত করে চেপে ধরে একটু যেন ভয় পেয়েই বলল তাতার-দস্যুসর্দার।

কি করবে—কি করবে—দেখতে চাস্ কি করবে? বলেই ত্রিশূলটা উঁচিয়ে দূরে কাস্পিয়ান সমুদ্রের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, ওই ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্ত্র পড়তে শুরু করলেই, কাস্পিয়ান সাগরের জলের ভেতর থেকে উঠে আসবে সেই বিচিত্র জলদানব নাহঙ্* !

জোঁকের মুখে যেন চুন পড়ল।

ভিখুকে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল সেই তাতার-দস্যুসর্দার। তার এক অনুচর বলল, পেটের দায়ে রাহ্‌জানি করি ঠাকুর—দেখো আমাদের কোন ক্ষতি করো না!

দস্যুরা চলে গেল।

শুধু তাতাররা নয়, কাস্পিয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিমের এমন আদিবাসী নেই, যে নাহঙ্‌কে ভয় করে না। হাসতে হাসতে বলল জটাধারী, শুয়োপোকার মতো সরু সরু লিকলিকে হাত-পা নাহঙ্-এর, আর চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল।

হ্যাঁ, এই নাহঙ্-এর কথা পার্শীভাষায় লেখা রূপকথা হাতেম-তাইতে পড়েছি। মোহনলাল বলল, আর্মেনিয়ার বুড়োথুড়ো মানুষেরাও জানে নাহঙ্-এর নাম।

যাহোক নাহঙ্ বাঙ্গালা সওদাগরকে বাঁচিয়ে দিল।

আর বাঙ্গালা সওদাগর বাঁচিয়ে দিয়েছে আমার বন্ধু গুরোভকে। বলল স্নুচ্‌স্কোভ, একটা তাতার যেভাবে ওর দিকে বল্লম তাক করেছিল ঠিক সেই সময় যদি লাঠি নিয়ে ভিখুভাই ঝাঁপিয়ে না পড়তো —কৃতজ্ঞতায় অগাধ হয়ে স্নুচ্‌স্কোভের চোখদুটো। গুরোভ অপলক চোখে তাকিয়ে রইল ভিখুর দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারাটার দিকে। স্নুচ্‌স্কোভের মনের ভেতরে ভাসতে লাগল চক্রের মতো করে

*"Mythology of All Racess Celtic-Slavic", Vol. 3.

লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ভিখুর সেই উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ার দৃশ্যটা।

তোমাকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বানিয়ে দিল! চাপা গলায় হেসে বলল কৃষ্ণাবাঈ। আতঙ্ক আর উত্তেজনার মেঘ সরে গিয়ে হাসিতে ঝলমল করছে তার মুখ। হঠাৎ তার মনে হলো, চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গে গৌড়েই বোধ হয় রামুগোঁসাইয়ের মুখে শুনেছিল কথাটা, 'কনক-কেতকী-কুসুম-গৌর'—কেয়াফুলের মতো দীর্ঘ; কনকচাঁপার মতো গায়ের রঙ! বোরকার আড়ালে তার দু'চোখে মুগ্ধ আর তন্ময় দৃষ্টি থমথম করে। মিষ্টি একটা নেশার মৌতাতের মতো তার চেতনা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসে।

গানে, গল্পে, কথায় বিভোর হয়ে কাফেলার যাত্রীরা কাটিয়ে দেয় আরো ক'দিন। কাফেলা পৌঁছে যায় বাকুতে।

কাস্পিয়ান সমুদ্রের পাড়ে ছোট একটা পাহাড়ের ওপরে ছবির মতো সুন্দর আর শান্ত এক জনপদ। সন্ন্যাসীরা দল বেঁধে চলল মন্দিরের দিকে। দূর থেকে জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—জয় বাবা অগ্নিহোত্রীর জয়—

কৃষ্ণাবাঈ বলল, চল, আগে মন্দিরেই যাই।

বিকেলে সমুদ্রের ধারে এস ভিখুভাই, তোমার সঙ্গে কথা আছে। তার পিঠে হাত রেখে বলল গুরোভ। কেন যেন মুচকি হাসল স্থচ্‌স্কোভ। কে জানে, হয়তো কৃষ্ণাবাঈয়ের কথায় মন্দিরেই আগে যাচ্ছে বলে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার আর মুহূর্ত সময় নেই।

বেলা হলে ভীষণ ভীড় হয়ে যাবে ভিখুভাই। হাত ধরে টান দেয় মোহনলাল, ওঁকে আর মাটির ভেতর থেকে ওঠা আগুনের শিখা দেখাতে পারবে না।

হাজারো সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী আর তীর্থযাত্রীদের জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে তারা এসে দাঁড়ালো অগ্নিদেবতার দেবায়তনের সামনে। আগুনের মতই রাঙা পাথরে তৈরি বিশাল দেবায়তন।

ভেতরে গিয়ে তারা দেখল, ভূগর্ভ থেকে জ্বলছে দাউ-দাউ করে একটা আগুনের শিখা! তার সামনে কোন যোগী ঊর্ধ্ববাহু হয়ে; কেউ মাথা নীচে রেখে পা দুটো শূন্যে স্থির রেখে গভীর ধ্যানমগ্ন। সেই রহস্যময় জ্বলন্ত শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কৃষ্ণাবাঈ একটা কাণ্ড করে বসল। সেই পবিত্র আগুনের তাপ হাতে নিয়ে সেই হাতটা ভিখুর মাথায় বুলিয়ে দিল। খপ্ করে তার হাত ধরে মৃদু হেসে ফিসফিস করে ভিখু বলল, আমি মুসলমানের ছেলে।

কোন কথা বলল না কৃষ্ণাবাঈ।

কেমন নরম আর মেদুর দুটো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে ধরল তার মুখের দিকে। আস্তে আস্তে বলল, আমার কাছে তোমার কোন জাত নেই গো -- তার চোখদুটো জলে ভরে এল।

তাকে অন্যমনস্ক করার জন্যই ভিখু বলল, সাগরের পাড়ে যাবে?

সমুদ্র আর মন্দির দেখতে এসেছো নাকি! হেসে বলল কৃষ্ণাবাঈ, তুমি যে বাঙলার সওদাগর—সে কথাটা তোমার—

ঠিক আছে, বিকেলে বিক্রি-বাটা করে, তবে সমুদ্রের ধারে যাব।

বাকুর পাথরে বাঁধানো পথ ধরে তারা চলেছে কাফেলার সরাই-খানার দিকে। শাঁ-শাঁ করে বয়ে আসছে ঝড়ো বাতাস। কাস্পিয়ান সমুদ্রের বাতাস। সেই উদ্দাম হাওয়ায় উড়ছে ভিখুর চুল, উড়ছে কৃষ্ণাবাঈয়ের রেশমের বোরকা।

আরে—ও ভিখুভাই, আশ্চর্য! তোমরা কোন্‌দিক দিয়ে বেরিয়ে এলে? পিছন দিক হেঁকে বলল মোহনলাল।

এখানে কি চব্বিশ ঘণ্টা এই রকম বাতাস?

এ আর কি দেখছো! রাতে আরও বাড়ে। সময় সময় তুম্বা কি মানুষও উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সাগরে ফেলে দেয়।

ভিখুর বুকের ভেতরটা আঁকপাঁক করে। কখন—কখন, কতক্ষণ পরে সে তার বহুদিনের স্বপ্নের সেই কাস্পিয়ানের সামনে গিয়ে

দাঁড়াবে। হঠাৎ সে দেখল, অনেকগুলো চামড়ার মোটা মোটা থলির বোঝা পিঠে নিয়ে লাইন বেঁধে চলেছে খচ্চরের দল।

ওগুলো কি মোহনলাল ভাই?

আরে ওই চামড়ার বস্তার ভেতরেই তো আছে রওঘাম্ (খনিজ তেল, পেট্রোলিয়াম)।

কোথা থেকে আসছে রওঘাম্?

বাদ্‌কুবাতে যে রওঘামের কুয়ো আছে জান না? সেই কুয়ো খানদানী সওদাগররা মাদিনিনি নাফিসা (ইজারা কিংবা কবলা) নেয়। আর এক-একদিনের ভাড়া কত জান?

কত?

এক হাজার দীনার।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে রওঘামের ওই বস্তাগুলো?

কেন, জাহাজঘাটে!

কোথায় যাবে?

ইটিলে—সেই কাস্পিয়ান থেকে ভল্গা নদী বেয়ে সোজা উত্তরে খাজারের রাজধানীতে, যাবে নভোগোরোদে, সুজদালস্কে, রোস্টোভে।

ভিখু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। তার বুকের রক্তে যেন দামামা বাজতে থাকে।

বাকুর বাজারে কিছু মালদাই রেশম আর মসলিনের সুদৃশ্য বস্ত্র-সম্ভারের পসরা নিয়ে বসল ভিখু। সঙ্গে সঙ্গে রুশীয়, তাতার, কাজাকী, ইরানী খরিদ্দাররা কাড়াকাড়ি করে কিনতে লাগল রেশমের কাপড় আর কুমীশ, ডুরিয়া, তাঞ্জেব। বেশ মোটা লাভই হলো। আস্ত্রাখানের বাজারে বিক্রি করবে বলে আবার কিছু পার্শী রেশমের সুতো আর গালিচাও কিনে রাখল।

বিকেলের কোমল আর বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাকুর অদূরে শিরওয়ান আর মুকানের বাগানে লতানো আঙুরগাছের পাতায় পাতায়। শাঁ-শাঁ বাতাসের আলোড়ন উঠেছে ডালিমগাছের ঝোপে।

ভিখুভাই, জলের খুব অভাব বাকুতে। বলল মোহনলাল, এই শিরওয়ান থেকেই খাল কেটে জল নিয়ে যায় বাকু শহরে।

তারা যখন কাস্পিয়ান সাগরের ধারে এসে দাঁড়ালো, তখন ঝাঁপিয়ে নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। ভিখুর মাথার ভেতরে ফেটে পড়ছে রক্তের উচ্ছ্বাস। আবছা অন্ধকারেও সে দেখতে পেল, বালুচরে আছড়ে পড়ছে মত্তহস্তীর মতো এক-একটা বড় বড় ঢেউ। দেশ-দেশান্তরের নোঙব করা বাণিজ্যতরীগুলো এদিক-ওদিক করে দুলছে।

গৌড়ের জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে এই কাস্পিয়ানের কথা কত যে ভেবেছি—তীব্র আবেগে কৃষ্ণাবাঈয়ের হাতটা জড়িয়ে ধরল ভিখু।

তার উদ্দীপ্ত মুখেব দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাবাঈ আস্তে আস্তে বলল, একে একে তোমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করব গো।

ভি-খু—ভা-ই-ই! কাস্পিয়ানের হু-হু বাতাসে ভেসে এল গুরোভের কণ্ঠস্বর। ছুটতে ছুটতে সুচ্‌স্কোভকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। বলল, সেই কখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

ভারী হয়ে উঠল কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখখানা। টকটকে লাল চেহারা, পিঠ পর্যন্ত ছাপিয়ে পড়া কটা চুল, প্রায় চোখ পর্যন্ত ঢেকে ছোট ছোট টুপী আর হাঁটুর নীচে ঝুলে পড়া লম্বা ঢিলে কোট-পাতলুন পরা বেঁটে-খাটো এই দুটো লোককে তার কেমন ভয় করে। মনে হয়, মজবুত চেহারার মানুষদুটোর পেশীতে পেশীতে যেন একটা উদ্দাম প্রাণের আবর্ত স্তব্ধ হয়ে আছে।

তোমরা এখান থেকে কোথায় যাবে? নিজনি নভোগোরোদে যাবে, না সুজদালস্কে যাবে? কলকল করে বলে চলেছে গুরোভ, ওই যে যেখানে ওকা নদী ভল্গাতে পড়েছে, ঠিক সেইখানে নভোগোরোদ। ও, কী বিরাট একটা মেলা যে সেখানে বসে!

আবার ওই ভল্গা নদী বেয়ে ভাঁটিতে তুমি আমাদের পবিত্র ও প্রিয় মাতা 'মস্কাউ'তেও যেতে পার।

ভিখু কিছু বলার আগেই আড়চোখে কৃষ্ণাবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে

হঠাৎ গুরোভ চাপা গলায় বলল, শোন—একটু এদিকে এস। ভিখুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গুরোভ চাপা গলায় ফিসফিস করে কতগুলো কথা বলতেই যেন তীব্র একটা আনন্দের বিদ্যুৎ ঝকমক করে উঠল ভিখুর মুখে। তার মাথার ভেতরে উত্তেজনার জোয়ার বয়ে যেতে লাগল। সুচ্‌স্কোভ বলল, আমরা এখানে থাকব।

রাত নামল ঘন হয়ে বাকুতে। ভিখুর চোখে ঘুম নেই। তার বিনিদ্র চেতনার ভেতরে সুদূর স্বপ্নের মতো ভেসে ওঠে এক অজানা দ্বীপের অস্পষ্ট ছায়াভাস। সেখানে সাগরের জলের ভেতর থেকে এক-এক সময় মুখ উঁচিয়ে উঁকি দেয় হাঙ্গর—তার তীক্ষ্ণধার ধারালো দাঁত—

কি ব্যাপার! এপাশ-ওপাশ করছো—ঘুম আসছে না?

উঠে বসল ভিখু। সরাইখানার সেই ঘরের মৃদু আলোয় কৃষ্ণাবাঈয়ের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে সসঙ্কোচে বলল, তোমাকে একটা কথা বলব? থামল ভিখু। আবার নিতান্ত একটা অসহায় আর দুর্বল মানুষের মতো বলল, কেন যেন তোমাকে কিছু না বলেও পারি না।

বল না, কি বলবে?

আমি—আমি—থেমে থেমে বলল ভিখু, গুরোভদের সঙ্গে একটা জায়গায় যাব, কৃষ্ণা?

কোথায়?

কাস্পিয়ানের ভেতরে একটা দ্বীপে।

কেন?

নিহঙ্‌ (হাঙ্গর) শিকার করতে।

না-না, কখনো না। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কৃষ্ণাবাঈ। তার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। ভিখু বলল, নিহঙের চামড়ার খুব চাহিদা এখানে—ওর চামড়ার বস্তায় করে রওঘাম্‌ চালান দেয় ব্যাপারীরা।

হোক চাহিদা। ব্যবসার দিকে তোমার কত মন! বলেই হেসে ফেলল কৃষ্ণাবাঈ। অবাধ্য ছেলের মাথায় যেমন করে মা হাত বুলিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি করে ভিখুর একমাথা ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলগুলোর ভেতরে বিলি কাটতে কাটতে হেসে হেসে বলল, আসলে তোমার আকর্ষণ ওই দ্বীপ—ওই হাঙ্গর—বলতে বলতেই তীব্র একটা আবেগে ভিখুর চওড়া বুকে নদী হয়ে মিশে গেল সে। আর—

বাইরে রাশি রাশি তারা ও নক্ষত্রের ছায়া বুকে নিয়ে দুলতে লাগল কাস্পিয়ানের নীল জলরাশি।

বাকুতেই আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল ভিখুর।

এখানে কোথায় নাকি কাছেই 'ফারসাখহ' নামে একটা জায়গার মাটির নীচে আছে গন্ধকের খনি, আর আছে কাস্পিয়ানের নীল জলের মাঝখানে ঘন সবুজের ছবির মতো গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা সেই নির্জন দ্বীপ। সেসব কিছুই দেখা হলো না—কিন্তু তার থাকাও হলো না।

আস্ত্রাখানের স্থায়ী বাসিন্দা উড্যাসী বৈভ্যাসভ বলল, এবারে ওখানে হিন্দু বেনিয়াদের মহল্লায় ঘটা করে দেওয়ালী হবে।

চল ওখানে যাই ভিখুভাই। মোহনলাল বলল। কৃষ্ণাবাঈও বলল, কতদিন দেশছাড়া—কতকাল যে দেওয়ালী দেখিনি! তার বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস।

পঞ্চগৌড়ের সওদাগর—নিমাসরাইয়ের সেই মালদাই রেশমের ব্যাপারীর ছেলে ভিখু শেখ এবার চলল আস্ত্রাখানে— চলল তার সেই বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন সেই রুশ-মুলুকে।

কাস্পিয়ানের পশ্চিম তীরে শান্ত মনোরম এক-একটা গ্রাম পেরিয়ে চলতে লাগল তাদের কাফেলা। কিন্তু কিছুদূরে যেতেই তাদের থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। রাস্তার পাশে একটা গ্রামের বাড়িগুলোর রঙীন দস্তার চালে চালে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বাক্স-প্যাঁটরা, সংসারের টুকিটাকি জিনিস। কিন্তু একটি জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও!

কোন শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত আর জ্বলন্ত সেই নিভৃত গ্রামের চারদিকে গভীর শোকের মতো নেমে আসছে শীতের সন্ধ্যা। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস কাফেলার যাত্রীদের চোখে-মুখে আছড়ে পড়ছে হিম-

শীতল জলের ঝাপটার মতো। তাদের প্রত্যেকের মুখ রুশীয়দের কায়দায় পাখির পালকের তৈরি পুরু ওড়নায় ঢাকা। তবুও ভিখুর মনে হচ্ছে, নাকটা কেমন যেন সাদা আর শক্ত হয়ে যাচ্ছে; জমে যাচ্ছে চোখের পাতাগুলো।

আগুন দেখে থেমে গেলে তো চলবে না, আস্ত্রাখানের সন্ন্যাসী উড্যাসী বৈভ্যাসভ হেঁকে বলল, তাতার কুত্তাগুলো এই কাণ্ড তো যখন-তখন করছে।

কাফেলা আবার চলতে শুরু করল।

উনিশ বছর আগে* (১৫৫৮) রুশী ভাইরা পুরোপুরি দখল করেছে আস্ত্রাখান। বৈভ্যাসভ বলতে থাকে, তবুও কখনো নোগাহ্ তাতার, কখনো ক্রিমিয়ার তাতার, কখনো 'কার তাতাররা' দল বেঁধে এসে লুঠপাট করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে—

তাতার আবার এত রকমের হয় নাকি? ভিখুর চোখে কৌতূহল জ্বলজ্বল করে। মোহনলাল বলে, ভিখুভাই, তাতারদের পুরো ইতিহাস বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। কেউ বলে মধ্য-এশিয়ার মঙ্গোলরাই হলো খাঁটি তাতার। আবার কেউ বলে, তুর্কীরা কিংবা বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমের যাযাবর উপজাতিরা, কিংবা কাজাকিস্তান থেকে আস্ত্রাখানের—

আরে ওরাই তো আস্ত্রাখান শাসন করেছে। এই নোগাহ্ তাতারদের রাজকুমার খান কুকুম মহম্মদ থেকে শুরু করে একেবারে খান দারইস্ আলী পর্যন্ত পাক্কা প্রায় একশো বছর—

'আস্ত্রাখান' নামটার ভেতরেই ওদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বৈভ্যাসভকে থামিয়ে দিয়ে বলল মোহনলাল। একটু থামল সে। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, তাব্রিজ, বাকু আর আস্ত্রাখানে যাতায়াত করতে করতেই জীবনের অর্ধেকটা কেটে গেল। আমার এক

* "Encyclopedia of Islam," Vol. I. P. 72।

তাতার পাইকার রহমানের মুখে শুনেছি, প্রায় দু'শো চুয়াল্লিশ বছর আগে (১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দে) ইবন বতুতা নামে কে একজন এখানে এসে দেখেছিল খানেরা কয়েক ঘর মক্কা-ফেরত হাজীকে সসম্মানে বসতি করিয়েছিল। তাদের কাছে খাজনা নিত না। খাজনা মকুবকে তাতাররা বলে হাদ্‌জ্‌ দিজি-ই তার্‌-খান্‌—তুর্কী ভাষায় বলে আজ্‌দর্‌খান্‌—তা থেকেই হয়ে গেছে 'আস্ত্রাখান'।

থাম হে বাপু, এই দারুণ ঠাণ্ডায় তোমাদের কচকচি আর ভাল লাগছে না। কে একজন খেঁকিয়ে উঠল। চুপ করে মোহনলাল। সত্যিই আকাশ থেকে মুঠো মুঠো হিম ঝরছে। উটগুলো চলতে পারছে না। হয়তো এখুনি বরফ পড়তে শুরু করবে। বরফে ছেয়ে যাবে পথ। কাছে-পিঠে কোন কাফেলা-সরাইখানাও নেই। কিন্তু আস্ত্রাখানগামী সেই কাফেলাকে থামতে হলো। না, হিমের জন্য নয়, থামতে হলো বিচিত্র একটা কারণে।

আঃ—উঃ—মরে গেলাম—কে কোথায় আছো—বাঁচাও—আমাদের বাঁচাও! রাস্তার পাশে জঙ্গলের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল। মুহূর্তে যেন সেই শীতের হিমঝরা রাতের গাঢ় স্তব্ধতা একটা আড়ষ্ট ব্যথায় শিউরে উঠল। ছুটে নামল মোহনলাল। নামল ভিখু। জ্বলন্ত মশালের আলোয় ঘন জঙ্গলের ঝোপের ভেতরে সেই করুণ আর মর্মান্তিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালো ভিখুর হৃৎস্পন্দন।

থুড়থুড়ে এক বুড়ো আর—

ভরা বয়সের একটা মেয়ে! হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। সেই দারুণ শীতে তাদের গায়ে প্রায় কোন বস্ত্র নেই বললেই হয়। মেয়েটির কোমরের নীচে শুধু এক টুক্‌রো রঙীন ন্যাকড়া ঝুলছে। বোধ হয় ওর ঘাঘরারই অংশ। বাদবাকী দেহটা সম্পূর্ণ নিরাবরণ। বুকের ওপরের সেই দুরন্ত আর উদ্বেল যৌবনচিহ্ন দুটোকে দু'হাতে চেপে ধরে অঝোরে কাঁদছে।

তাতাররা আমাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে বাবুসাহেব। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বলল, আমি মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছিলাম, কিন্তু—থামল সেই বৃদ্ধ। মেয়ের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আবার বলল, কুকুরগুলো মেয়েটাকে ধরে ফেলল—কিছুক্ষণ পরে ওকে এই ঝোপের ভেতরে ওই অবস্থায় ফেলে দিয়ে চলে গেল কুকুরগুলো।

আপনি আমাদের সঙ্গে আস্ত্রাখানে যাবেন? মোহনলাল বলল। ভিখুর বুকের ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করে উঠল। দৌড়ে গেল তাদের উটের দিকে। কৃষ্ণাবাঈয়ের কাছ থেকে কিছু কাপড় এনে বুড়োর হাতে দিয়ে বলল, শীগ্‌গীর পরে ফেলুন—মেয়েকেও গায়ে জড়িয়ে নিতে বলুন—ঠাণ্ডায় মরে যাবে।

বস্ত্র পেয়ে বাপ ও মেয়ে লোলুপ উল্লাসে আর দ্রুতহাতে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, আমাদের নিয়ে চলুন আস্ত্রাখানে—গাঁয়ে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকুও তো কুকুররা ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। কোথায় থাকব—

আর বাবা, আমাদের কাকা আছে না আস্ত্রাখানে! মেয়ে বলল। মুহূর্তে কাফেলার বিভিন্ন উট থেকে ভেসে এল সরব অভ্যর্থনার আওয়াজ, এই যে তোমরা আমার স্তুটুরে—আমার স্তুটুরে এস।

আমার স্তুটুরে এস, পশমের অনেক পোশাক আছে।

দুরন্ত যৌবনবতী সেই শ্লাভ মেয়েটির উপস্থিতি যেন শীতজর্জর যাত্রীদের মনে তরঙ্গায়িত করে দিয়েছে প্রাণের উত্তাপ। তারা সেই হিমশীতল বাতাসের সমুদ্রে সাঁতরে যেতে যেতে তার সুপুষ্ট দেহের নিবিড় কবোষ্ণ সান্নিধ্য চায়। কিন্তু—

মেয়েটি ভিখুর সেই দীর্ঘ গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ চেহারার দিকে তাকিয়ে কাফেলার যাত্রীদের শুনিয়ে শুনিয়ে হেঁকে বলল, আমি তোমাদের কারো স্তুটুরে যাব না। আমি যাব ওর—বলেই ভিখুকে দেখিয়ে দিল। হাসির রোল পড়ে গেল যাত্রীদের ভেতরে।

যাবেই তো বাবা, অমন মকবুল চেহারা! ছেলে-ছোকরারা হিংসায় পুড়ে যেতে লাগল।

কাফেলা আবার রওনা হলো। ভিখুর ঘুটুরে গিয়েই মেয়েটি কোন ভূমিকা না করে বলল, এই বোরকাপরা মেয়েছেলেটা কি তোমার বিবি? তা ওর গায়ে এত ভারী ভারী জামা!

এই নাও ভাই, এই নাও। আরও কতগুলো মসলিনের কাপড় তাকে দিল কৃষ্ণাবাঈ। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গায়ে জড়িয়ে নিল সে। মেয়েটির সরল আর উদ্দাম চালচলন দেখে কৃষ্ণাবাঈ মুগ্ধ আর বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি জোবেদার মতো চাপা নয়। জিজ্ঞেস করল কৃষ্ণাবাঈ, তোমার নাম কি?

নাম আবার কি! আমাদের নাম যেমন হয়, নাটাশা।

কয়েক মুহূর্ত একবার ভিখুর আর একবার কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি বিবি নিয়ে আস্ত্রাখানে যাচ্ছো? হিন্দু বেনিয়ারা তো শুনেছি তাদের জেনানাদের নিয়ে যায় না সেখানে!

ওরা দু'জনেই চুপ করে থাকল।

কিন্তু নাটাশা থামতে জানে না। ভিখুর পিঠে একটা চিমটি কেটে বলল, তোমার বিবিকে বল না আমাকে কিছু খেতে দিক। ভীষণ খিদে পেয়েছে! একটু থেমে আবার বলল, দুপুরে যেই দুটো মুখে দিতে গিয়েছি অমনি কুকুরগুলো মার-মার করে এল।

একটু অপেক্ষা কর ভাই, দিচ্ছি। কৃষ্ণাবাঈ তাড়াতাড়ি করে বাকু থেকে কেনা আটার রুটি আর গোলাপজল ছিটানো সরের মিঠাই এগিয়ে দিল তার দিকে। কিন্তু খাবারগুলো একটু শুঁকেই নাক-মুখ কুঁচকে নাটাশা বলে উঠল, এ মা! এ কিসের রুটি?

কেন, তোমরা কিসের রুটি খাও? ভিখু বলে।

শুনবে কি খাই! রাইয়ের ময়দার রুটি আর কপির পাতার ঝোল। একটু থেমে একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে বলল, আর যদি কোনদিন কপালে জুটে যায় তাহলে গম সেদ্ধ করে চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে খাই।

আর? নতুন দেশের বিচিত্র জীবনধারা ভিখুকে প্রগলভ করে তোলে।

আর আবার কি? গরীব-দুঃখী মানুষ আমরা, কি এমন হাতী-ঘোড়া খাব! বড়লোকরা শুয়োর কি মুরগী কেটে তার মাংস খায়। খায় ছত্রাকের তরকারি, দই, পেঁয়াজ আরও কত কি! কথা বলতে বলতে হঠাৎ সেই সুগন্ধী সরের মিঠাই আর রুটিতে কুট্ করে কামড় দিয়েই বলে ওঠে, বাঃ, খেতে বেশ তো! বলেই গপ গপ করে খেতে থাকে।

আরো নেবে তো নাও না! ওকে গোগ্রাসে খেতে দেখে ভিখু বলে, আমাদের সঙ্গে অনেক খাবার আছে।

কিন্তু তার বলার আগেই কৃষ্ণাবাঈ তাড়াতাড়ি আরও কিছু রুটি আর মিষ্টি এনে দেয়। খেয়ে-দেয়ে বেশ ধাতস্থ হয়ে বসে বলল নাটাশা, তোমরা খুব ভালো—খু-উ-ব ভালো।

হেসে ফেলে ভিখু আর কৃষ্ণাবাঈ।

রাত বাড়ে।

আরও হিম ঝরে। হু-হু বাতাস ছুরির ফলার মতো কেটে কেটে বসে তাদের চোখে-মুখে। কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখে পাখির পালকের ওড়নাটাতে একটা টোকা মেরে বলল নাটাশা, বাতাসেই এমন ঠক ঠক কবে কাঁপছো, বরফ পড়লে কি কববে?

কৃষ্ণাবাঈ কোন কথা বলল না। তীব্র ঠাণ্ডায় তার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। ক্ষীণ গলায় ভিখুকে বলল, আমি আর পারছি না গো। আর—

দাঁড়াও। বলেই ভিখু তাদের কাপড়ের গাঁটের ভেতর থেকে হামা-দানের গালিচা, তাব্রিজের পশমের চাদর বের করে পরম যত্নে তার গায়ে জড়িয়ে দিল। বলল, তুমি স্টুরের গদীর ওপরে এগুলো জড়িয়ে শুয়ে পড়।

সেই গরম কাপড়ের স্তূপের ভেতরে ঢুকে পড়ল কৃষ্ণাবাঈ, আর

সঙ্গে সঙ্গে যেন নিথর হয়ে গেল। খর চোখে ভিখুর দিকে তাকিয়ে দেখল নাটাশা। দেখল, কৃষ্ণাবাঈয়ের প্রতি তার গভীর মমতা।

কাফেলার যাত্রীদের সেই টুক্‌রো টুক্‌রো কথা, হাসি আর গান কখন থেমে গিয়েছে। কোথাও কোন সুটুরের পিঠ থেকে একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে না সারবানদের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর। জানোয়ারগুলো চলেছে ধীর গতিতে। চলতে হবে—তাই চলেছে। ঘণ্টার শব্দ বাজছে ডিং-ডং-ডিং-ডং। ওই শব্দটুকু ছাড়া কোথাও নেই জীবনের কোন চিহ্ন। শুধু কাফেলার চারদিকে ঘন অন্ধকারে হিমশীতল বাতাস আবর্তিত হচ্ছে।

তুমি তোমার বিবিকে গুচ্ছের গরম কাপড় চাপা দিয়ে দিলে! ভিখুর কাছে আরও সরে এসে আস্তে আস্তে বলল নাটাশা, আমরা আমাদের খুব ভালোবাসার লোককে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে দেখলে কি করি জান?

কি?

এইভাবে তাকে—বলেই হঠাৎ ভিখুকে তার উত্তুঙ্গ বুকের ভেতরে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলিষ্ঠ দুটো হাত দিয়ে তাকে ঠেসে ঠেসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, এইভাবে তাকে জড়িয়ে ধয়ে পড়ে থাকি আর দু'জনেরই গা গরম হয়ে যায়! তাতেও—

কি করছো, কি করছো তুমি! কৃষ্ণাবাঈয়ের দিকে অস্বস্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার শক্ত বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল ভিখু। কিন্তু নাটাশা তাকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল, আর তাতেও যদি শীত লাগে তাহলে আমরা এইভাবে মুখে মুখ ঘষি। বলেই বদ্ধ একটা উন্মাদিনীর মতো ভিখুর মুখে বুকে তার মুখ ঘষতে লাগল নাটাশা। ভিখুর রক্তের ভেতরে আগুন ধরে গেল। তবু—তবুও ঝড়ের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার আগে একটুক্‌রো কাঠ আঁকড়ে ধরার মতো তার জন্মার্জিত সংস্কারের বশেই সে নাটাশাকে ছাড়িয়ে নিতে যেই চেষ্টা করল, অমনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল

নাটাশা। একটানে ফর ফর করে টেনে ছিঁড়ে ফেলল গায়ের কাপড়। অনাবৃত করল সেই সুডৌল বক্ষসম্ভার। আর সেই দুটো দুরন্ত গ্রহের মাঝখানের মসৃণ আর ঝকঝকে নরম উত্তপ্ত সেই উপত্যকায় চেপে ধরল ভিখুর মুখটা। বিষাক্ত আর হিংস্র নাগিনীর মতো ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চাপা—খুব চাপা গলায় বলল, দেখ—দেখ তো তোমার বিবির যা আছে, আমারও তো তাই আছে। তাহলে কেন—কেন—তুমি—

ভিখুর মনে হলো, সেই শীতজর্জর গভীর রাত্রে হিমঝরা আকাশের নীচ দিয়ে নিশির ডাকের মতো তাকে কে যেন নিয়ে চলেছে এক সুদূর অজানা দেশে। কিন্তু চারদিক থেকে দিক্‌দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে উন্মত্ত বেগে ছুটে আসছে কালো জলের বন্যা। সেই উষ্ণ কালো স্রোতের ভেতরে তার দুর্বল অবসন্ন দেহটা যেন শবের মতো খুব ভারী আর অনড় হয়ে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে।

কয়েকদিন পর।

বহুদূর থেকে আস্ত্রাখানের বিষ্ণু-মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল উড্যাসী বৈভ্যাসভ, জয় বিষ্ণুনারায়ণের জয়—

জয় বিষ্ণুনারায়ণের জয় !!

কাফেলার সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত আর তীর্থযাত্রীদের মুখে উল্লাসের ঝিকিমিকি। শুধু বিষ্ণু-মন্দির নয়, রাধাকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং হিন্দুদের আরও অনেক দেবদেবীর দেবায়তন আছে সেখানে। দেশ ছেড়ে বহু দূরে এসেও তারা সমস্ত অন্তরের ভক্তি উজাড় করে তাদের প্রিয় দেবতার পূজা-অর্চনা করতে পারবে। কৃষ্ণাবাঈয়ের বুকের ভেতরটা গুরগুর করছে। কতদিন—কতদিন যে দেশছাড়া। কতদিন কোন দেবতার মুখ দেখে নি। তার মনের ভেতরে চিড়াইবাড়ির জাহাজঘাটের কাছে শিবপুকুরের পাড়ে বিষ্ণু-মন্দিরটা ছবির মতো ভেসে উঠল। কিন্তু—

ভিখু বসে আছে মাথা নীচু করে। কেন যেন কারো মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না। নাটাশা আর তার বুড়ো বাবা নেমে গিয়েছে আস্ত্রাখানের আগে শ্লোভাক্‌দের একটা গ্রামে। কিন্তু বিপর্যস্ত করে দিয়েছে ভিখুর চেতনা। কেমন একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মন। অর্ধজাগরিত চেতনার ভেতরে কোন ঘটনার টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি যেমন ছায়াবাজীর মতো ফুটে ওঠে, তেমনি মনের অবচেতনার অন্ধকারে শীতার্ত রাত্রির সমস্ত ব্যাপারটা যেন লাশকাটা ঘরের ছেঁড়া, কাটা, গলা বিকৃত শবদেহের বীভৎস ছবির মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো, অনেক—অনেকদিন ধরে যেন পাকা খেলুড়ের মতো সে লুকোচুরি খেলে চলেছে। কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ধরা পড়ে যাওয়ার সেই মৃত্যুবীজ লুকিয়ে আছে তার নিজেরই ভেতরে। লুকিয়ে আছে তার দেহের কোষে কোষে, অণুতে পরমাণুতে।

তোমার কি হয়েছে বল তো? পরম স্নেহে কৃষ্ণাবাঈ তার মাথায় হাত রেখে বলে, শরীর-টরীর খারাপ হয় নি তো? বলেই তাড়াতাড়ি গায়ে হাত দিয়ে জ্বরের উত্তাপ অনুভব করতে চেষ্টা করে!

হরে কৃষ্ণ-হরে রাম!
রাম-রাম কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরে-হরে—

আস্ত্রাখানগামী বৈষ্ণব-বাউলদের উল্লসিত নামগান শোনা যায়।

ভিখুভাই, কোথায় উঠবে? মোহনলাল বলে, আস্ত্রাখানে আমাদের দেশের লোকের জন্য দুটো সরাইখানা আছে। একটু থেমে আবার বলে, একটা হলো তীর্থযাত্রী আর সাধু-সন্তদের জন্য, আর একটা আমাদের মতো সওদাগর ব্যাপারীদের।

আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, আমরা ওই সওদাগরদের ডেরাতেই উঠব।

কাফেলা আস্ত্রাখানের বাজারের কাছে যেতেই ছুটে এল আর্মেনীয়, রুশীয়, তাতারী আর কালমুক বণিক-ব্যাপারীদের দল।

এতদূরে এসেছে ব্যবসা করতে। কিন্তু ক'বার—ক'বার সে আল্লাহের কথা ভেবেছে! তবুও বলল, হ্যাঁ, করি।

তাহলে সেইরকম উত্তর-ভারতের, বিশেষ করে মুলতান, লাহোর এবং দিল্লির পাঞ্জাবী, সিন্ধি, জৈন ব্যবসায়ীরা যখুনি আস্ত্রাখানে এসেছে তখুনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত। একটু থামে পধন স্যারন্যাটোভ। তার চোখে যেন কোন দূর-অতীতের স্মৃতির ছায়া পড়ে। মনের ভেতরে ডুব দিয়ে বলে, শুনেছি আমারই কোন পূর্ব-পুরুষ আমাদের গৃহদেবতা বিষ্ণুর নর্মদা শিলামূর্তি নিয়ে এসেছিলেন আস্ত্রাখানে। তাঁর সঙ্গে ছিল পাঁচজন পুরোহিত, সাতজন বাউল আর দু'জন যোগী।

কথা বলতে বলতে চারদিকে পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা সারি সারি তিনটি বিশাল দুর্গের মতো বাড়ির সামনে দাঁড়ালো তারা। পধন বলল, এর একটা আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের সরাইখানা। আর—

আর দুটো বাড়ি?

একটা আর্মেনিয়ার বেনিয়াদের, আর একটা রুশীয়দের।

এত বড় এক-একটা সরাইখানা!

বাঃ, প্রত্যেক সরাইখানার ভেতরে যে বাজার আছে। পধন বলল, আমাদের সরাইখানা সবচেয়ে বড়। আঠারোটা স্থায়ী দোকান আছে বাজারে। প্রত্যেক দোকানের জন্য কত ভাড়া দিতে হয় জান?

কত?

বছরে বারো রুবল। একটু থেমে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পধন বলল, ও, অনেক বেলা হয়ে গেল। আমাদের সরাইয়ের দোকান খোলার সময় প্রায় হয়ে এল। বলেই দ্রুতপায়ে চলে যেতে যেতে মোহনলালকে বলল, তুমি তো পুরানো লোক—তোমার বন্ধুর ঘর আর দোকানের বিলি-ব্যবস্থা করে দিও, কেমন?

উনি তো সরাইখানার মালিক, দোকান খোলার সঙ্গে পধনের সম্বন্ধ কি ?

ওরে বাবা, বল কি ! প্রত্যেক দোকানের বিক্রি-বাটার খবর দিতে হয় জারের কর্মচারী আস্ত্রাখানের রুশীয় কাদ্‌খুদার (সুবাদার) কাছে। মোহনলাল বলল, দেখতে হয়, কালমুকগুলো কোথাও কোন গোলমাল বাধাচ্ছে কি না।

কালমুক ! কালমুক কারা ?

আরে বাপু, দু'দিন থাক। বাজারে দোকান খুলে বসে বিক্রি-বাটা কর—সব বুঝতে পারবে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দু'দিন। কৃষ্ণাবাঈ অদূরে বিষ্ণু-মন্দিরে যায়। যায় রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে। কোনদিন ষোড়শোপচারে ভোগ দেয়, কোনদিন ধ্যানস্থ মূর্তির মতো বসে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ শোনে। আর বিপুল একটা সুখের অনুভবে তার মনটা কেমন আবিষ্ট হয়ে আসে।

ভিখু সরাইখানার বাজারে বসে বেচা-কেনা করে। তার নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। এখানে খরিদ্দার বেশি আসে কিয়েভ থেকে; আসে ইটিল, বুলজার, নভোগোরোদ থেকে। তাদের লক্ষ্যই হলো ভারতীয় এবং পারস্যের রেশম, গালিচা, মখমল কেনা আর তাদের ভল্গা উপত্যকার পণ্য—পশম, হরিণের চামড়া, মোম, মধু ইত্যাদি বিক্রি করা।

সেদিন ভিখু রুশীয় ব্যাপারীদের কাছে পাইকারী দরে বিক্রি করবে বলে তেহরানের এক বণিকের কাছে থেকে গালিচা আর কিছু কাঁচা রেশম কিনছিল, হঠাৎ বাজারের ভেতরে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল আর্ত চীৎকার, খুন—খুন--করে—ফেলল—খুন—

চোখের পলকে ঝপ ঝপ করে ঝাঁপ পড়ে গেল দোকানের। ছুটে এল স্মারস্নাটোভ, ছুটে গেল ভিখু। মুহূর্তে লোকে লোকারণ্য

হয়ে গেল ঘটনাস্থলে। ভীড়ের ভেতরে উঁকি দিয়ে ভিখু দেখল, তাজা রক্তের নদীতে ভাসছে এক মুলতানী বেনিয়ার লাশ।

মোহনলালের দেশের লোক। মোহনলাল এবং উপস্থিত লোকদের মুখে টুক্‌রো টুক্‌রো যে বিবরণ শুনল ভিখু, তা যেমন দীর্ঘ তেমনি করুণ। বক্তাদের আবেগ, আস্ফালন, কটূক্তি, মন্তব্য সব বাদ দিয়ে ঘটনার শুধু নির্যাসটুকু এখানে বলা হলো।

ভারতীয় লোকটার নাম ম্যাটোম্যালভ। দীর্ঘদিন এখানে রেশম, পশম আর গালিচার কারবার করছে। ওর নাম ছিল 'মক্রুমাল'। কিন্তু নামেই ওর পশমের ব্যবসা, আসল কারবার ছিল ওর লগ্নীর কারবার। চড়া সুদে টাকা ধার দিত, না হয় ধারে মাল দিত স্থানীয় আস্ত্রাখানী তাতার অর্থাৎ কালমুকদের। দিনে দিনে সুদের অঙ্ক আসলকে ছাড়িয়ে যেত। তখন কালমুকরা মেয়ে কি বৌ বন্ধক রাখতো তার কাছে। কোনদিন ঋণ শোধ দিতে পারতো না। মক্রুমাল তখন তাদের চড়া দামে বিক্রি করে মোটা টাকা ঘরে তুলতো। এক কালমুকের বৌটা নাকি ছিল খুব সুন্দরী। বছরের পর বছর তাকে ভোগ কবছে দেখে কালমুক ধরে নিয়েছে তার ঋণ শোধ হয়ে গিয়েছে। তবুও মক্রুমাল নাকি তার বৌটাকে ছাড়ে নি—কারণ মক্রুমালের মতে তার ঋণ শোধ হয় নি—তাই নিয়ে বচসা হতে হতেই এই ভয়াবহ পরিণতি।

ভারতীয় বেনিয়াদের পল্লীতে এই কালমুকদের মেয়েমানুষ নিয়ে টানাটানি আর খুনজখম লেগেই আছে। বলল মোহনলাল।

এই হটো—হটো—হাকিম আসছে! অস্ফুট গুঞ্জন উঠল জনতার ভেতরে। ঘোড়ায় চড়ে এল আস্ত্রাখানের হাকিম অথবা কাদ্‌খুদা। ঘটনার বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনে বলল, আমাদের মহামান্য জারের হুকুম নেই কোন জাতির কি কোন সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত করার। তাই কালমুকদের কিছু বলতে পারব না, তবে যদি খুনীকে গ্রেপ্তার করতে পারেন—তাহলে সাজা হবে। একটু থেমে

আবার স্যারঙ্গাটোভের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিই তো ভারতীয় বেনিয়াদের পঞ্চায়েতপ্রধান। আপনি পঞ্চায়েত ডাকুন। মক্রমালের পরিবারের জন্য যে ক্ষতিপূরণ চাইবেন, আমাদের দয়ালু মহামান্য জার তা নিশ্চয়ই মঞ্জুর করবেন।

•

ভল্গার সাগর সঙ্গমের সেই জনপদে মক্রমালের হত্যাকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন উঠেছিল, সেটা চাপা পড়ে গেল ভারতীয় বেনিয়া পল্লীতে দেওয়ালী উৎসবের বিপুল সমারোহে।

দিকে দিকে অমাবস্যার কৃষ্ণারাত্রির স্রোত বয়ে চলেছে, আর দূরদেশের আকাশের নীচে হিন্দু বণিক-পল্লীর বাড়িতে বাড়িতে জ্বলছে প্রদীপের আলো। চারদিকের ঘন অন্ধকারে সেই আলোক-সজ্জা স্মরণ করিয়ে দেয় বহু—বহুদূরের জন্মভূমির সেই স্নেহ-মায়া-মমতাঘেরা মধুর গৃহাঙ্গনের কথা।

মনে হয় যেন গৌড়েই আছি। খুশিতে ভেঙে পড়ে বলল কৃষ্ণাবাঈ। সে পেঁচিয়ে পরেছে একটা টিয়াবঙের জামদানী শাড়ি। যেন একটা সবুজ পরীর মতো হাওয়াব ওপর ভর করে চলেছে দেওয়ালীর উৎসবে।

আরে আসুন—আসুন বাঙ্গলা সওদাগর। সবব অভ্যর্থনার ঝড় উঠল। অকারণে হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে এল মোহনলাল। বলল, কি ভাই, একটু শরবত চলবে?

তুমি এত হাসছো কেন, মোহনলাল ভাই?

ভাঙের শরবত খেয়েছি যে—হাসি আর থামাতে—বলতে বলতেই আবার হাসির দমকে ফেটে পড়ল মোহনলাল।

আসুন—আসুন, একবার খেলেই পূর্ণ যৌবন! এক তাতার যাদুকর তারস্বরে চীৎকার করছে, গাধার পায়ের খুরের গুঁড়ো আর খেজুর-ফুল গরম করে লাক্ষা সারের মতো করে একবার—মাত্র একবার চুলে মাখলেই—

অদূরে একটা ফাঁকা মাঠে বিচিত্র বাজনা বাজিয়ে নেচে নেচে সমবেত গলায় গান গাইছে কালমুক গাইয়ের দল। সেখানে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে রুশীয়, আর্মেনীয়, ইরানী দর্শকরা। দেওয়ালীর উৎসবের টানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিভিন্ন মহল্লা থেকে ভেঙে এসেছে হাজার হাজার মানুষ। তাদের নানা ভাষার উল্লসিত কলরোলের ভেতরে ভিখু যেন দূর-বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বিশাল জনারণ্যের স্পন্দন শুনতে পেল।

এইবার—যে যেখানে আছেন এগিয়ে আসুন। হঠাৎ সেই কলরোল স্তব্ধ করে দিয়ে বলল সেই সরাইখানার প্রধান।

ভারতীয় বেনিয়াদের পঞ্চায়েতপ্রধান স্মারন্যাটোভের গলার আওয়াজ শোনা গেল, একটু করে প্রসাদ খেয়ে নিন। প্রত্যেকের হাতে হাতে দেওয়া হলো সুগন্ধী মিঠাই আর ঘিয়ে ভাজা হিং দেওয়া পিঠে। ভিখুও আর সকলের মতো সারিতে বসেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার জামায় টান পড়ল।

আপনি এদিকে আসুন। সুমধুর স্বরে বেজে উঠল কার স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর। ভিখুর চোখদুটোর দৃষ্টি থমকে গেল। মনে হলো—তার মনে হলো, যেন নিমাসরাইয়ের জমিদার প্রতাপনারায়ণের বাগানের সেই শ্বেতশুভ্র রজনীগন্ধা ফুল দেখছে। তেমনি দীর্ঘ সতেজ চেহারা! কাজলটানা ডাগরদুটো চোখে নীলিম আভাস! রুশীয় মেয়েদের মতো একমাথা সোনালী চুল। কিন্তু সেই চুল দিয়েই ভারতীয় মেয়েদের কায়দায় বিশাল গম্বুজের মস্ত এক খোপা করেছে। তাতে আবার সাদা ফুলের মালা চক্রাকারে জড়িয়েছে।

বাবার কাছে আপনার কথা শুনেছি। বলেই ভিখুর দীর্ঘ গৌরবর্ণ দিব্যকান্তি আর স্বপ্নাচ্ছন্ন দুটো চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ চোখদুটো নামিয়ে আরও দুটো হিং মেশানো পিঠে আর মিঠাই ভিখুর হাতে দিয়ে বলল, আমি নিজে তৈরি করেছি এসব—খেয়ে নিন—

আরে লজ্জা কি—খান—খেয়ে নিন। হয়তো ভাঙের শরবতের প্রভাবেই হো-হো করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল পধন স্যারন্যা-টোভ, আমার মেয়ে শাশা! একটু থেমে বলল, নাম রেখেছিলাম শশীমুখী, হয়ে গিয়েছে শাশা। আমার নাম যেমন 'সারনাথ', হয়ে গিয়েছি স্যারন্যাটোভ। বলেই দু'হাতে বুক চেপে ধরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

কি ব্যাপার ভিখুভাই! হঠাৎ ভীড়ের ভেতরে তার পিঠে হাত রাখল গুরোভ, আস্ত্রাখানে কবে এলে? একটু থেমে আবার বলল, সেদিন সেই বাকুতে সমুদ্রের ধারে কতক্ষণ যে তোমার জন্য অপেক্ষা করলাম!

ভিখু মাথা নীচু করল। কৃষ্ণাবাঈ আড়চোখে একবার তাকালো তার দিকে। সাফল্যের হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখখানা। ভিখুকে নিস্তব্ধ দেখে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে গুরোভ বলল, যাক, ওসব পুরানো কথা ছাড় তো। আস্ত্রাখানের পরে কোথায় যাবে ভেবেছো? আমাদের দেশে এসে নভোগোরোদের মেলায় যাবে না?

স্চস্কোভ বলল, সেই মেলাও তো প্রায় শেষ হয়ে এল। সেই জুলাই মাসে শুরু হয়েছে, চারমাস থাকে মেলা।

হ্যাঁ, বাজারে শুনেছি। এখানকার অনেক ব্যবসায়ী নভো-গোরোদের মেলায় দোকান নিয়ে গিয়েছে।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুরোভ বলল, আমরা তো কালই ভোরে রওনা হচ্ছি। যাওয়ার তো হাঙ্গামা নেই, ভল্গা থেকে উজান বেয়ে চলে গেলেই হলো—

আসুন—আসুন—যার যা মনের বাসনা পূর্ণ হবে, হতে বাধ্য। উপস্থিত জনতার কলরবকে ছাপিয়ে তাতার যাদুকরের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল, এই টুপীটা একবার—মাত্র একবার পরলেই—

সেদিন অনেক রাত্রে ফিরে এসেছিল ভিখু আর কৃষ্ণাবাঈ। ঘরে

এসে ভিখুর বুকে মাথা রেখে কৃষ্ণাবাঈ বলেছিল, কী, নভোগোরোদের মেলায় যেতে বুঝি খুব ইচ্ছে করছে? তার খাড়া নাকের দু'পাশে, গালে, কপালে, বুকে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তোমার মুখ দেখে আমি সব—সব বুঝতে পারি গো।

না-না, তুমি—আমি—অনেক—অনেকদিন হলো দেশছাড়া, ভিখু বেশ গম্ভীর হয়ে বিবেচকের মতো বলল, দেশের জন্য তোমার মন—

আমি তোমার কে বল! কপট অভিমানে ভারী হয়ে ওঠে কৃষ্ণাবাঈয়ের কালো চোখের পাতাদুটো। বলে, আমার মন ভালো করার জন্য তুমি দেশে ফিরবে!

মানে! দপ করে জ্বলে উঠল ভিখুর চোখদুটো, তুমি আমার কে, বলছো কি! জান, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি—বলেই উন্মত্ত একটা আবেগে কৃষ্ণাবাঈয়ের কবুতরের মতো নরম দেহটাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে খামচি বসিয়ে বলল, বল, আর কোনদিন বলবে—

আ! উঃ—উঃ—লাগছে—লাগছে—ছেড়ে দাও—লক্ষ্মীটি—

বল, আর কোনদিন বলবে, না বললে ছাড়ব—

না-না, বলব না—আর বলব না। হাসিতে ফেটে পড়ে বলতে বলতেই চোখদুটো ভরে জল এসে পড়ল। চোখে জল। মুখে নিঃশব্দ হাসির ঝরণা! হাসির আলোয় চোখের জলে অন্ধ হয়ে এল তার দৃষ্টি। ঠিক সেইসময়—

সেইসময় রাত্রির নিস্তব্ধতাকে সচকিত করে দিয়ে রব উঠল, আগুন—আগুন—আগুন!

ছুটে বাইরে এল ভিখু। এল কৃষ্ণাবাঈ। ভারতীয় বেনিয়াদের সেই সরাইখানা আর বাজারের যে যেখানে ছিল ছুটে বাইরে এসে দেখল, অদূরে হিন্দু বেনিয়াদের পল্লীর ঘরে ঘরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে আর সেই মহল্লা থেকে বাক্স-প্যাটরা মালপত্র নিয়ে সবাই ছুটছে নদীর ঘাটের দিকে। ছুটতে ছুটতে এল স্যারন্যাটোভ।

হেঁকে বলল, আপনারা যার যা মালপত্র নিয়ে শীগ্‌গীর পালিয়ে যান—তাতাররা খেপেছে। মক্রমালের খুনীকে গ্রেপ্তার করার পর—একটু থেমে আবার দূরে তাতারদের তীব্র আক্রোশের মতই তাদের পল্লীর ঘরে ঘরে লেলিহান আগুনের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে বলল, এই বাজার, এই সরাইখানা পুড়িয়ে ছাবখার করে দেবে—হিংসা হিংসা, রুশীয় সরকার মক্রমালের পরিবারকে দু'শো রুবল ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, খুনীটাকে দিয়েছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে—

ভাবতীয় বেনিয়াদের সঙ্গে ভিখু আর কৃষ্ণাবাঈও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে জাহাজঘাটে এসে নৌকোয় চাপল।

রাত্রির অন্ধকারে ভল্গার নীল জল কেটে কেটে জাহাজ চলল নভোগোরোদের দিকে। সেখান থেকে এই ভল্গার উজান বেয়ে তারা কেউ চলে যাবে খোদ রাজধানী মস্কাউতে. কেউ চলে যাবে সুজদালস্কে, কেউ বা যাবে সেণ্ট পিতরবর্গে।

॥ বাইশ ॥

সেই তমসাস্তীর্ণ ভল্গার বিশাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে ভিখুর ভাবনাও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। সেই কবে রাত্রি শেষের এমনি অন্ধকারে চন্দন আলীর নওয়ারায় পাড়ি দিয়েছিল! কেমন ঝাপসা আর অস্পষ্ট ছবির মতো মনে হয় সেইসব পুরানো দিনের কথা। দুর্বার নিয়তি অতলান্ত সাগরের জলে আলীসাহেবকে ঘুম পাড়িয়ে রাখল আর সেই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিরই অমোঘ টানে হাকিমসাহেব মৃত্যুঞ্জয়ী বনৌষধির আর্কষণে যাত্রা করল তিব্বতের দুর্গম পথে। কে জানে সেই বনৌষধি সে পেয়েছে, না সেই ভীষণ গহন পর্বতের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আজও ক্ষ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে ফিরছে! তার হঠাৎ মনে হলো—মনে হলো, শুধু নিয়তি নয়, কারো কারো বুকের ভেতরে থাকে তীব্র বিষের মতো কোন জ্বালা। সেই জ্বালাই তাকে ঘরের নিশ্চিন্ত সুখ আর প্রিয়জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়, অঙ্কুশের খোঁচা মেরে পাগলা হাতীর মতো পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সেও তো—

আরে ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন। হঠাৎ নৌকোর যাত্রীদের কলরবের ভেতর থেকে স্যারন্যাটোভের গলার স্বর ছিন্ন করে দিল ভিখুর চিন্তাসূত্র। কিন্তু সেই স্বল্প আলোয় হাজারো ছায়ার জটলার মতো যাত্রীদের ভিড়ের ভেতরে পধনের দিকে তাকাতেই ভিখুকে চোখদুটো নামিয়ে নিতে হলো। তার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাশা। হাসি-হাসি মুখ। ঠিক ভারতীয় মেয়েদের মতো করে সেই দীঘল চেহারায় পেঁচিয়ে পরেছে ঘন নীলরঙের পার্শী রেশমের শাড়ি। সেই নীল শাড়ির আড়ালে তার থির বিজুরীর মতো দেহরেখা নীলাভ আগুনের তাপে জ্বলছে।

জানেন, বাবা কিছুতেই নভোগোরোদের মেলায় কোনদিন আমাকে আনেন নি। বেশ সহজ আর সপ্রতিভ হয়ে হেসে হেসে বলল শাশা, সেই মেলাতেই বাধ্য হয়ে—

তুই কি বুঝবি আমার ঝামেলা মা! পধন কেন যেন যাত্রীদের শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, আস্ত্রাখানের ভারতীয় বেনিয়াদের শতেক ঝক্কি আমার ওপরে। আমার কি আস্ত্রাখান ছেড়ে নড়ার—

তাদের বিপদের মুখে ফেলে এখন এলেন কি করে?

কী! স্যারন্যাটোভের চোখে ঝিকিয়ে উঠল আগুন। একটা বাক্সের ওপরে বসে ছিল। মোটাসোটা দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে মোহনলালের দিকে তাকালো। অদূরে মালমাত্রার স্তূপের ভেতরে লম্বা-চওড়া পুরুষালী চেহারার এক রুশীয় মহিলার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, মোহনলাল, দেখেছো তো শাশার মাকে।

কি যা-তা বলছো বল তো? হেসে হেসে যেন কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই মৃদু প্রতিবাদ করল শাশার মা। কিন্তু তার দিকে একবারও ভ্রুক্ষেপ করল না পধন। বলল, রুশীভাইরা আমাকে এমনি খাতির করে না, বুঝলে মোহনলাল ভাই! তোমরা যখন নেশাভাঙ করে হুল্লোড় করছিলে, তখন আস্ত্রাখানের হাকিম আই-ভ্যানোভিচের লোক এসে জানিয়ে যায় দাঙ্গা বাধতে পারে— ভারতীয় বেনিয়াদের সরে যেতে বল। একটু থেমে গর্বিত চোখে সওদাগর-ব্যাপারীদের দিকে তাকিয়ে বলল, তখুনি রাত জেগে বেশির ভাগ বেনিয়াকে নিরাপদ জায়গায়—

আমাদের আগে আরও দুটো নৌকো বোঝাই হয়ে গিয়েছে।

কেন, একটা কাফেলাও তো রওনা করিয়েছি বাকু হয়ে তাব্রিজের দিকে। মোহনলালের দিকে তাকিয়ে সাফল্যের আনন্দে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠাস্ করে উত্তর দেয় পধন। তারপর ডগোমগো হয়ে ন্যাড়া মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে, বুঝলে মোহনলাল ভাই, পধন কখনো কাঁচা কাজ করে না।

হয়েছে—হয়েছে, আর বাহাদুরী করতে হবে না। শাশার মা বলে।

আচ্ছা, এর ভেতরে একটা কথা মিথ্যে বলেছি ভারভারা, বল—

বাবা যে কী না—নিজের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ—শাশার হাসিমাখা চোখে অনুযোগ ঘনিয়ে এল।

তুমি চুপচাপ কি ভাব? কৃষ্ণাবাঈয়ের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল শাশা, দেওয়ালী দেখতে এসেও কেমন জড়োসড়ো হয়ে ছিলে! কত করে বললাম, একটা দানা মুখে—

অনেকদিন দেশছাড়া তো, তাই হয়তো মন খারাপ। ভারভারা বলল।

না-না, বলেন কি! একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে কৃষ্ণাবাঈ বলল, দেশের জন্য এতই যদি ভাবতাম, তাহলে গৌড় থেকে কাস্পিয়ান—

আলবৎ, বেনিয়াদের জা-নি বুজুরুগ্‌দের মন খারাপ হলে চলে না। স্যারন্যাটোভ কৃষ্ণাবাঈয়ের দিকে সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে বলল, তবে বাঙ্গালা সওদাগর ভিখুভাইয়ের বাহাদুরী আছে বলতে হবে।

কেন বলুন তো?

তুমি বোধহয় প্রথম বেনিয়া, যে বিবি নিয়ে—

আমি তো আস্ত্রাখানের বেনিয়াদের মতো স্থায়িভাবে থাকতে আসি নি। বুকের ভেতরে তীব্র একটা আবেগ দাপাদাপি করে। কৃষ্ণাবাঈয়ের সলজ্জ মুখখানার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। তার মনে হয়—মনে হয় সেই অদৃশ্য নিয়তি তাকে যেন দুর্বার গতিতে নিয়ে চলেছে—নিয়ে চলেছে একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে।

আরে ভাই, এত ভাবছো কেন? মেয়ে-বৌয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভিখুকে চিন্তাচ্ছন্ন দেখে চাপাগলায় বলল পধন, বৌ নিয়ে এসেছো—বেশ করছো—ওরা সঙ্গে না থাকলে তো ওই মক্রমালের মতো অবস্থা হবে। একটু থেমে তীব্র ঘৃণায় নাক-মুখ কুঞ্চিত করে

আবার বলল, তুমি কি মনে কর, বেনিয়ারা যদি যে-যার পরিবার সঙ্গে আনতো, তাহলে কি আস্ত্রাখানের শহরতলীতে ওই তাতারদের মুত্‌ফাপল্লীর সৃষ্টি হতো, না মক্রমালদের মতো ওদের মাগীগুলোকে নিয়ে—

এই নৌকোর সবাই কি নভোগোরোদের মেলায় যাচ্ছে?

ভিখু প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথা। তার কথায় একটুও কান না দিয়ে স্যারন্ত্যাটোভ বলতে থাকে, আমি বাবা ওসব ছোটলোকী কাণ্ডকারখানার ভেতরে নেই। যখন তেইশবছরের জওয়ান মদ্দো, তখন কাঁচা বয়সের ডাগরডুগোর বৌটাকে রেখে বাপের সঙ্গে চলে এসেছিলাম আস্ত্রাখানে। দিনের বেলাটা ভালই থাকি, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তায় কাজকম্মে ভুলে থাকি। কিন্তু রাত—রাত আসে কি যম আসে—রাত আর কাটতে চায় না। দড়ির চারপাইয়ের বিছানাটায় মনে হয় যেন আগুন ছড়ানো।

তোর বাবা সেই তখন থেকে কি বকবক করছে দেখ তো! ভারভারা বলল, যত বয়স বাড়ছে তত বকবকানিও বেড়ে চলেছে।

না-না, এরা সবাই নভোগোরোদে যাবে কেন? ভারভারার কথাটা কানে যেতেই পধন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে, এরা কেউ যাবে বুলজারে, কেউ যাবে ইটিলে—কেউ চলে যাবে রস্টোভে।

এই ভল্গা নদী পাড়ি দিয়ে এত জায়গায় যাওয়া যায়? ভিখুর চোখের দৃষ্টি কেমন উৎসুক হয়ে ওঠে।

বল কি ভিখুভাই, আমাদের যেমন গঙ্গা, রাশিয়ার তেমনি ভল্গা। স্যারন্ত্যাটোভ উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে থাকে, তুমি যেমন গঙ্গা বেয়ে তোমার দেশের এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে চলে যেতে পার, তেমনি তুমি এই ভল্গা দিয়ে কি করে—

ইস, কী কথাই তুমি বলতে পার! ভারভারা গজগজ করে।

আহা, ওঁর আর কি দোষ! মৃদু হেসে কৃষ্ণাবাঈ বলে, বাঙ্গলার সওদাগরেরও তো কৌতূহলের শেষ নেই।

তুমি ওরকম বলছো কেন? ভিখুর সরল আর কেমন স্বপ্নাতুর মুখের এবং অনুরাগভরা চোখের দিকে তাকিয়ে শাশা বলে, নতুন এসেছেন, এখানকার হালহদিশ একটু জেনে নেবেন না?

আঃ, তোরা বড় বাগড়া দিস। মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে স্যারন্যাটোভ আবার বলতে থাকে, শোন ভিখুভাই, আমাদের আস্ত্রাখান হলো ঠিক এই ভল্গা যেখানে কাস্পিয়ানে পড়েছে, সেই মোহনার মুখ থেকে বিশ ক্রোশ উজানে। বুঝলে! এখন যেতে যেতে দেখবে, ছোট-বড় কত নদী। কোনটা এসে পড়েছে এই ভল্গাতে—আবার কোনটা এই নদী থেকে বেরিয়েছে, আবার এরই কাছাকাছি আরও অনেক বড় বড় নদীও বয়ে চলেছে। চোখ বুঁজে স্যারন্যাটোভ যেন রাশিয়ার নদীগুলোর ছবি কল্পনা করে। আস্তে আস্তে আবার বলে, যেমন ধর ডন, নীপার—

ভল্গা থেকে ডন পর্যন্ত খাল কাটা আছে, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মোহনলাল ফস করে বলে, সেই খাল দিয়ে তুমি ইচ্ছে করলে চলে যেতে পার কৃষ্ণসাগরে। শুধু ডন-ভল্গা খাল নাকি? রাশিয়ার উত্তরে সেই বরফে ছেয়ে থাকা ভলদাই পাহাড়, যেখান থেকে ভল্গার জন্ম, তারই খুব কাছাকাছি আরও ছোট-বড় অনেক নদীর জন্ম—সে সমস্ত নদীর সঙ্গে ভল্গার যোগ করা হয়েছে খাল কেটে।

ভিখু কথা বলে না। তার মন ভেসে যায় দূরে—বহুদূরে সেই তুষারাচ্ছন্ন ভলদাই পাহাড়ে, যেখান থেকে তুষার-গলা এই নীলবর্ণ ভল্গা নদী নেমে এসেছে। হয়তো নেমে এসেছে আরও কত নামহারা তুষারনদী। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে আবার ধীরে ধীরে বলে, শুধু কি যাতায়াতের সুবিধার জন্যেই সব নদীর সঙ্গে ভল্গার যোগ করা হয়েছে?

যাতায়াত! ভিখুর অজ্ঞতায় পথন হেসে ওঠে, উট্‌কো যাতায়াত করতে যাবে কেন লোকে?

আরে ব্যবসা—ব্যবসা। একটু চল না, দেখবে।ভল্গার উত্তরে সেই

উজান বেয়ে নৌকো বোঝাই হয়ে আসছে বেজীর গায়ের ঘন বড় বড় লোম, মানে সবচেয়ে ভালো জাতের পশম। শুধু কি বেজী! খেঁকশিয়াল, কাঠবিড়ালী, বীবর (গায়ে বড় বড় লোমযুক্ত একধরনের জলজন্তু বিশেষ) আর ভেড়া-ছাগলের লোমের পশমের চালানও কমে আসে না। মোহনলাল বলল, ভল্গার উত্তরের ওই সব দেশের পশম পেলে পারস্যের কি ভারতের বেনিয়ারা আর কিছু চায় না, বুঝলে ভিখুভাই।

ওই পশম, তুম্বা-বকরী-হরিণের চামড়া, খুব ভাল ঘোড়া, ভেড়া, গোরু, মাছের জেলী, শীলমাছের, দাঁত, বার্চ কাঠ, আখরোট, মোম, মধু, শনের দড়ি; তাছাড়া তীর, তলোয়ার, বর্ম্ম আর দাসদাসীর হাটে বিক্রি করার জন্য হৃষ্টপুষ্ট শ্লাভ মেয়েপুরুষের দল, আর কত বলব! একটা বড় নিশ্বাস ফেলল স্যারন্যাটোভ। আবার বলল, ওইসব জিনিসের জন্যেই এই ভল্গার সঙ্গে আশপাশের সব ছোট-বড় নদীর গাঁটছড়া বাঁধতে হয়েছে।

নভোগোরোদের মেলায় এসব জিনিস দেখতে পাব বাবা?

বলিস কিরে শাশা! এই মেলাই তো ভল্গার ওইসব মাল কাটতির সবচেয়ে বড় হাট!

বাবা বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে ফি-বছর নভোগোরোদের মেলায় যেতাম। ওঃ, কি যে সেখানে পাওয়া যায়, আর কি পাওয়া যায় না। মোহনলাল বলে, বাহাদুরি কাঠ, চিনি, তুলা, পাকা চামড়া থেকে শুরু করে উরালের লোহা, চীনের চা—

আরে বাবা সোজাসুজি বল না কেন, রুশ দেশের এই নিজনি নভোগোরোদের মেলা—ঠিক আমাদের দেশের হরিহর ছত্রের মেলার মতো। গোল গোল চোখদুটো নাচিয়ে নাচিয়ে বলে স্যারন্যাটোভ, হরেক রকম মাল যেমন আসে, তেমনি মেলায় আছে হরেক মজা, যত খুশি ভদকা খাও, তামাশা দেখ, নাচ দেখ, গান শোন আর—হঠাৎ থেমে যায় সে। অদূরে গোল হয়ে বসে থাকা শাশা, ভারভারা আর

কৃষ্ণাবাঈয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হঠাৎ ভিখু ও মোহনলালের মাথার কাছে শাঁ করে মাথাটা নিয়ে আসে। আর তিন মাথা এক করে চাপা গলায় বলে কতগুলো কথা। বলেই হাসতে থাকে। হাসির রেশে টেনে টেনে বলল, আরে ভাই, স্ফূর্তির ঢালাও ব্যবস্থা—

নভোগোরোদে আর কি আছে বাবা ?

যাচ্ছিসই তো, দেখতেই পাবি সব নিজের চোখে। মেয়ের কৌতূহলে কেন যেন বিরক্ত হয় ভারভারা। কৃষ্ণাবাঈ শাশার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আপনার মেয়ে কিন্তু ওঁর মতো। একটু থামে। কেন যেন একটা ভারী নিশ্বাস ছেড়ে বলে, কোথায় কি আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার আর বিরাম নেই !

নভোগোরোদেও মস্কাউয়ের মতো ক্রেমলিন আছে, ক্যাথিড্রাল গীর্জা আছে। চল্ না তুই, নিজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে দেব।

কথায় কথায় রাত ভোর হয়ে যায়। সেই সুদূর উত্তরে বরফে ছেয়ে থাকা ভলদাই পাহাড়, ভল্গার উজানে হু'পাশের সেই বিস্তীর্ণ তৃণভূমির (স্তেপভূমি) ঝোপঝাড়ের ঘন লোমশ বেজী, খেঁকশিয়াল, আর কাঠবিড়ালী ; ডন-ভল্গার খাল বেয়ে কৃষ্ণসাগরে চলে যাওয়া, নিজনি নভোগোরোদের বিরাট মেলা—স্যারন্যাটোভ আর মোহনলালের প্রত্যেকটি কথা যেন ভিখুর বিনিদ্র চেতনার ভেতরে অপরূপ ইন্দ্রজালের মতো খেলা করে। মনে পড়ে যায়, সেই দুই দুর্দান্ত বেপরোয়া রুশীয় বেনিয়া, গুরোভ আর সুচ্স্কোভের কথা। ওরা তো পশমের কারবারী। কোথা থেকে পায় ওরা সেই পশম ! ওরাও কি ভল্গার উত্তরে বরফঝরা ঘন জঙ্গলে—

আপনারা নভোগোরোদ থেকে কি আমাদের সঙ্গেই আস্ত্রাখানে ফিরবেন ? শাশা সামনে এসে দাঁড়ায়। রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি আর অবসাদক্লিষ্ট মুখে স্মিত হাসি ঝিকমিক করছে। ভিখুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় জোবেদাকে, মনে পড়ে নাটাশাকে। ওদের উদ্ধত যৌবনপুষ্ট দেহের উগ্র সৌন্দর্য বুকের ভেতরে জ্বালিয়ে দেয় কামনার আগুন।

কিন্তু শাশার দীঘল দেহের ভরা যৌবনের আশ্চর্য শান্ত, স্নিগ্ধ ও কমনীয় রূপ কেন যেন অদ্ভুত একটা প্রশান্তিতে ভরে তোলে তার মন। একটু হেসে বলে, নভোগোরোদের পরে কোথায় যাব, কি না যাব, কিছুই বলা যায় না। মানুষ কি তার ভবিতব্য বলতে পারে শাশা?

আর কোথায় যাবে বল! তাদের মাঝখানে কৃষ্ণাবাঈ এসে দাঁড়ায়। বলে, মালপত্র যেটুকু আছে নভোগোরোদের মেলায় বিক্রি করলেই তো সব ফুরিয়ে যাবে। তার কণ্ঠস্বরে একটু যেন উত্তাপের আভাস ফুটে ওঠে। কেমন ম্লান হয়ে যায় শাশার সুডৌল মুখখানা। তবুও—তবুও ভিখুর মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, আপনারা মস্কাউতে গেলে বাবা হয়তো আমাকেও ছেড়ে দিত —একটু থামে। আবার আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে, কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড়ের ওপরে ছবির মতো সুন্দর মস্কাউ শহর, তার মাঝখানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের ওপরে নাকি ক্রেমলিনের রাজবাড়ি—

ছলাৎ—ছলাৎ—ছলাৎ—হঠাৎ যেন জোরে জোরে জলের ঢেউ নৌকোর গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল। টলমল করে দুলতে শুরু করল নৌকো।

কী ব্যাপার! নৌকো এত দুলছে কেন? ডুবে যাবে নাকি! কলরব উঠল যাত্রীদের ভেতরে। কে একজন আর্তনাদ করে বলল, নিশ্চয়ই ডাকাতের নৌকো আসছে - ভল্গার ডাকাত -

আরে না, না রে বাবা, দেখই না কি! ক্ষীণ গলায় সাহস দেওয়ার চেষ্টা করে স্যারন্যাটোভ। কিন্তু—

সকালের রোদে ঝিলমিল ভল্গার জলে আলোড়ন তুলে যখন সত্যি সত্যিই এসে পড়ল একটা বিশাল বজরা, আর যখন দেখা গেল গাট্টাগোট্টা লাল-লাল চেহারার মানুষগুলোর কারো হাতে তীক্ষ্ণধার বল্লম, কারো হাতে তলোয়ার, কারো হাতে তীর-ধনুক, তখন আর্তনাদ

করে উঠল অসহায় যাত্রীরা। ভিখু শক্ত করে চেপে ধরল তার সেই পিতলের তার জড়ানো ভালকা বাঁশের লাঠিটা। একজন বুড়ো মতো সিন্ধি বেনিয়া হাত জোড় করে বলল, আমাদের যার যা আছে দিয়ে দিচ্ছি—আমাদের প্রাণে মেরো না!

আরে আমরা ডাকাত নই—ডাকাত নই। হো-হো করে হেসে আতঙ্কটাকে উড়িয়ে দিল সশস্ত্র রুশীয় আরোহীরা। তাদের অট্ট-হাসির তীব্র শব্দ ভল্গার বুকের ওপর দিয়ে বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলে গেল দূব-দূরান্তরে। এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল স্যারন্যাটোভ, ও বুঝতে পেরেছি—ওরা শিকারী।

শিকারী! কি শিকার করবে ওরা—কোথায় যাচ্ছে? উত্তেজনায় ভিখুর মাথার দু'পাশের রগদুটো দপ দপ করছে।

আরে ভিখুভাই, ব্যবসা—ব্যবসা। মাথার টিকিটা নাচিয়ে নাচিয়ে বলে স্যারন্যাটোভ, রুশীয় পশমের বেনিয়ারা কোথা থেকে পায় এত ভাল পশম?

তা ওরাই কি ভল্গার উত্তরের সেই গভীর জঙ্গলে বেজী, খেঁক-শিয়াল—

হ্যাঁ ভিখুভাই—হ্যাঁ, ওরাই শিকার করতে চলেছে সেইসব জানোয়ার। আস্ত্রাখানের রুশীয় সওদাগরদের মুখে শুনেছি, ওরা উত্তরের সেই পাইন, ফার, বার্চগাছের ঘন বনের ধারে তাঁবু ফেলবে। কিছুদিন থাকবে। সেখানকার দুর্ধর্ষ শিকারী আদিবাসীদের নিয়ে রোজ জঙ্গলে যেয়ে শিকার করে আনবে গাদা গাদা জানোয়ার—তারপর তার লোম—

আচ্ছা, সেই জঙ্গলে শুধুই কি বেজী—

আরে বাস্ রে! ভিখুর সরল আর বিস্মিত দুটো ভাসা-ভাসা চোখের দিকে তাকিয়ে বলে স্যারন্যাটোভ, বল কি ভিখুভাই, শুধু বেজী থাকতে যাবে কেন? আশ্চর্য এক-এক ধরনের সব জন্তু-জানোয়ার আছে শুনেছি। এমন খরগোস আছে, যার গায়ের রঙ

শীতকালে সাদা, আবার যেই গরম পড়বে, অমনি তার রঙ হয়ে যাবে কটা।

আচ্ছা পধনসাহেব, শুনেছি সেখানে নাকি এক ধরনের হরিণ আছে, আদিবাসীরা যার দুধ খায়, মোহনলাল বলে, তার লোম দিয়ে কাপড় বানিয়ে পরে!

ওই বিচিত্র জন্তু-জানোয়ারের লোভে কোন কোন বেপরোয়া রুশীয় শিকারীর দল যায় আরও—আরও উত্তরের বরফে জমে-থাকা সেই শ্বেতসাগরে।

কখনো সেই সুপ্রাচীনকালের পুণ্যভূমি রুশীয়দের তীর্থস্থান মস্কাউ, কখনো ভল্গার উত্তরের সেই রহস্যময় অরণ্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতেই একদিন তারা পৌঁছে যায় নিজনি নভো-গোরোদের মেলায়।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় ভিখুর চোখদুটো। তার মনে হলো, গর্জিত একটা মহাসমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কল্লোলিত মহাসমুদ্রের দূরাগত গর্জন যেমন অনেকদূর থেকে শোনা যায়, তেমনি মানুষের সমুদ্রের কলরোল শুনতে পেল বিশাল সেই মেলায়।

যেখানে ওকা নদী ভল্গায় পড়েছে, সেইখানে ওই দুই নদীর মাঝ-খানে বিস্তীর্ণ বালুচরে জমজমাট মেলা বসেছে। পৃথিবার দেশ-দেশান্তরের কত মানুষ, কত বিচিত্র পোশাক, তাদের কত রকমের ভাষা, আর কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের পণ্যসম্ভারের সেই বিশাল সমারোহের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিখুদের দলটা। শাশার কাজলটানা ডাগর চোখে পলক পড়ে না। মুগ্ধ আর বিস্মিত দৃষ্টি কৃষ্ণাবাঈয়ের চোখে।

কী ব্যাপার! এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে? দ্রুত-

উত্তেজিত গলায় স্যারন্যাটোভ বলল, বিক্রি-বাটার জন্য ঘর নিতে হবে, মাথা গোঁজারও একটা জায়গা দেখতে হবে।

চলুন—চলুন! অভিভূত আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ভিখু খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। জোর পায়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে মোহনলাল বলল, আরে ভাই ঘাবড়াচ্ছো কেন, রুশীভাইরা বরাবর খুব ভাল ব্যবস্থা করে এই মেলায়। মেলার বাঁধা দোকানীদের জন্য ষাট সারি পাথরে তৈরি বাড়ি আছে। একটু থেমে, বোধ হয় মনে মনে হিসাব করে বলল, কম করে আড়াই হাজার ছোট ছোট কুঠরী আছে সব মিলিয়ে এই বাড়িগুলোতে।

তেমনি লোকও কম নয়। ষাট হাজার দোকানী ঘরগুলোতে স্থায়িভাবে বাস করে, আড়াই লক্ষ লোক দেখতে আসে মেলা।

ইস, বাবা, আস্ত্রাখানে কতদিন আছি, এই মেলায় তুমি আন নি?

নভোগোরোদের এই মেলা না দেখে গেলে রুশ-মুলুকে আসাই ব্যর্থ হয়ে যেত। কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখখানা সন্ধ্যা-প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভিখু একটা কথাও বলছে না। দু'চোখ ভরে দেখছে পৃথিবীর নানা দেশের বিচিত্র পণ্যের সমাবেশ। এক-একটা দেশের জন্য এক-একটা সারি। প্রত্যেক সারির শুরুতে নিশান উড়ছে। সেই রেশমের লাল রঙের একখণ্ড কাপড়ের পতাকার ওপরে পার্শী আর রুশ ভাষায় তুলো দিয়ে লেখা আছে দেশের নাম—জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, পর্তুগাল, স্পেন, গ্রীস। এত দেশের নাম যেমন শোনে নি, তেমনি তাদের হরেক রকমের পণ্যও জীবনে দেখে নি সে। ভারতের সারিতে সে দেখল, সিন্ধু, পাঞ্জাব, দিল্লি, লাহোরের বেনিয়ারা নিয়ে এসেছে তারই মতো বাংলাদেশের রেশমের আর মসলিনের বস্ত্রসম্ভার, নিয়ে এসেছে সুগন্ধী মশলা, তেজপাতা, পিপুল, আদা, দারুচিনি, গাঙ্গেয় জটামাংসী, নিয়ে এসেছে চোলমণ্ডলম্ থেকে নীলকান্ত মণি (বহুমূল্যবান পাথর), মান্নারের মুক্তো, মহীশূরের অরণ্যের হাতীর দাঁত, বারিগাজার কচ্ছপের খোল—আরও কত কি!

তার দেশের বিভিন্ন পণ্যের সেই বিপুল সমারোহের ভেতরে কি তার বাদবাকী রেশমের কাপড় আর কৃষ্ণাবাঈয়ের সেই বৈদূর্য, পুষ্পরাগের কাটতি হবে?

মেলার কর্তৃপক্ষকে অনেক ধরাধরি করে পাশাপাশি দুটো ঘরের বন্দোবস্ত করে ফেলল স্যারন্যাটোভ। মোহনলালের চেষ্টায় ভারতের সারিতে একটা দোকানঘরও ভাড়া পেয়ে গেল। এইবার ভিখু বের করল তার অবশিষ্ট মসলিন আর রেশমের কাপড়। বারকোষ থেকে সোনাদানা, রত্ন বের করে কৃষ্ণাবাঈ নভোগোরোদের মেলায় তাদের পসবা সাজালো। দেশ-দেশান্তরের ধনী বিলাসী খরিদ্দারেরা ভীড় করে এল তাদের দোকানে। দু'দিন বিক্রি-বাটা বেশ ভালই হলো। ফুলে ফেঁপে উঠল কৃষ্ণাবাঈয়ের তাঞ্জাম।

হঠাৎ একদিন ক্রেতাদের ভীড়ের ভেতরে কোনরকমে নাক গলিয়ে গুবোভ বলল, কি ভায়া, শুধু ব্যবসা করলেই চলবে? মেলাটা—নিজনি নভোগোরোদটা (ভাটির নভোগোরোদ) একটু ঘুরে-ফিরে দেখবে না! ভিখু কৃষ্ণাবাঈয়েব দিকে তাকালো। হেসে বলল কৃষ্ণাবাঈ, তুমি যাও—আমি দেখব দোকান। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল শাশা। সে আব্দারের সুরে বলল, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। একটু থেমে আবার মৃদুগলায় বলল, দেখুন না, মেলায় নাকি আজেবাজে অনেক লোক ঘোরাফেরা করে, তাই বাবা সেই থেকে ঘরে আটকে রেখেছে। শাশার করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল কৃষ্ণাবাঈ। সস্নেহে শাশার পিঠে হাত রেখে বলল, যাও না—যাও এঁদের সঙ্গে। আমি তোমার বাবাকে বলে দেব। ছুটতে ছুটতে এসে ওদের সঙ্গে জুটে গেল সুচ স্কোভও।

গুরোভ গোটা দলটাকে প্রথমেই টানতে টানতে নিয়ে চলল মেলার রুশীয় দোকানের সারির দিকে। কেমন চাপা রহস্যময় হাসি হেসে সে সুচ্‌স্কোভকে বলল, সুচ্‌স্কোভ, ভিখুভাইকে সেই জিনিসটা দেখিয়ে দিই!

না-না, জিনিস-টিনিস নয়, এখন আগে নভোগোরোদ ঘুরে-ফিরে দেখব। শাশা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, এখানেও নাকি মস্কাউয়ের মতো ক্রেমলিন আছে, ক্যাথিড্র্যাল গীর্জা আছে!

ওই যে দেখছো ওকা নদী ভল্গাতে পড়েছে, দুই নদীর সেই সঙ্গম-স্থলে দাঁড়িয়ে সুচ্‌স্কোভ বলে, ওটা হলো নভোগোরোদের এক অংশ, আর খানিকটা আবার হলো ওকা নদীর ভাটিতে। শহরের ওপাশটায় যাওয়ার জন্য নৌকোর পুল আছে।

চলুন না পুলের ওপারে। উৎসাহের আতিশয্যে ভেঙে পড়ছে শাশা। সম্মোহিতের মতো ভিখু শুধু দেখছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই শহরের বিচিত্র দৃশ্য। পুলের ওপারে যেতে যেতে সুচ্‌স্কোভ বলল, জান, আজ থেকে প্রায় ঠিক একশো সাত বছর আগে* রাজা তৃতীয় ইভান তাতারদের হাত থেকে এই নভোগোরোদ কেড়ে নেয়। তারপর থেকে শুরু করে আমাদের বর্তমান মহামান্য জারের আমলে এই শহরের অনেক উন্নতি হয়েছে।

আচ্ছা সুচ্‌স্কোভ, তুই তো কিছুদিন গীর্জার কোন পাদ্রীর কাছে একটু-আধটু লেখাপড়া করেছিলি, গুরোভ বলল, আমার তো ওসব পাট নেই। সাজিয়ে-গুছিয়ে কথাও বলতে পারি না। তুই যে 'রুবল' চালু করার কথা বলেছিলি—

ও হ্যাঁ, এই নভোগোরোদেই প্রথম রুশের টাকা রুবলের জন্ম হয়েছিল।

কি রকম? ভিখু সাগ্রহে সুচ্‌স্কোভের মুখের দিকে তাকায়।

একখণ্ড মসৃণ রুপোর পাত কেটে টাকা তৈরি করে নভোগোরোদের

* "রুশ দেশের বিবরণ" (Pictures of Russia and its People) by Calcutta. Christian Literature Society. 1902

বাজারে ছাড়া হয়েছিল। ওই রুপোর খণ্ডের হিসেবে টাকার মূল্য ধরা হতো। একটু থামল সুচ্‌স্কোভ। আবার বলল, ছোট ছোট খণ্ডকে বলা হতো অবরুবকি অর্থাৎ কাটা। আর বড়গুলোকে বলা হতো রুবলি। এই রুবলি থেকেই রুশের মুদ্রা হয়ে গিয়েছে রুবল।

বাঃ, আশ্চর্য তো! অস্ফুটস্বরে শাশা বলল।

ওকা নদীর ওপরে সেই নৌকোর পুলের ওপর দাঁড়াতেই গুরোভ বলল, জান ভিখুভাই, এই নদীতে নেমে তুমি যদি গা ভাসিয়ে দাও, তাহলে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে তুমি মস্কাউ পৌঁছে যাবে।

মস্কাউ! ভিখুর বুকের ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। তোমরাও নিশ্চয়ই মস্কাউ যাচ্ছো? সুচ্‌স্কোভ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ভিখুর দিকে তাকায়।

না ভাই, অনেকদিন দেশছাড়া, ভারী একটা নিশ্বাস ফেলল ভিখু। দূরে ওকা নদীর কুয়াশাচ্ছন্ন বিসর্পিল রেখার দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, সেই তাব্রিজ থেকেই ফিরে যাব-ফিরে যাব করেও—

সে কী হে, তোমরা আমাদের দেশে এসে মস্কাউতে যাবে না! দু'চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে সুচ্‌স্কোভ বলে, এ যে তীর্থে গিয়ে দেবতাকে দর্শন না করার মতো!

আমারও যাওয়া হবে না মস্কাউতে। শাশার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। যেন স্বপ্নের ঘোরেই জড়িয়ে জড়িয়ে সে বলল, সেই ক্রেমলিনের রাজবাড়ি, তার মাঝখানে সাদা পাথরের তৈরি ক্যাথিড্র্যাল গীর্জা, কত শুনেছি মা-র কাছে।

সুচ্‌স্কোভ! সর্বনাশ করেছে! হঠাৎ চাপা গলায় বলল গুরোভ, সেই আঙুল-কাটা তাতারটা রে!—দূরে অন্ধকারে ভিড়ের ভেতরে সেই তাতার দস্যু-সর্দারের অতিকায় চেহারাটা মিলিয়ে গেল।

কয়েকমুহূর্ত চিন্তা করে সুচ্‌স্কোভ বলল, শীগ্‌গীর আমাদের দোকানের দিকে চল গুরোভ, ব্যাপার খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না।

আসছি ভিখুভাই, লোকটা আমাদের ক্ষতি করতে পারে। বলেই ওরা ছুটল মেলার দিকে।

নভোগোরোদের মেলায় রাত্রি নেমেছে ঘন হয়ে।

চবির আলো জ্বলা ঝুপসী পাথরের সেই ঘরের ছায়ান্ধকারে সাদা জ্যোৎস্নার রেখার মতো কৃষ্ণাবাঈয়ের তন্বী দেহটাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে ভিখু বলল, শাশাকে নিয়ে গুরোভদের সঙ্গে গিয়েছি বলে তুমি রাগ—

যাঃ, কী যে বল! একটু থামল সে। কৌতুকের আলোয় তার চোখদুটো মিটি মিটি জ্বলতে লাগল, তবে শাশাকে যে তোমার মনে ধরেছে—

কি যে বল তুমি! কৃষ্ণাবাঈয়ের নিটোল চিবুকটা ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, তোমার কাছ থেকে আমাকে কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারবে না গো—কেউ পারবে না।

কৃষ্ণাবাঈ কোন কথা বলে না। পাথরের দেওয়ালের গায়ে গায়ে অশরীরী ছায়াদের মতো কাঁপা-কাঁপা আলোর দিকে তাকিয়ে ভিখুর বুকের ভেতরে নিথর হয়ে থাকে। তার মনের ভেতরে আবছায়া কুয়াশার আবরণ ভেদ করে যেন একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার বহুদিনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া সেই সুখস্বর্গের ছবি। অস্ফুটস্বরে বলে, আমি জানি গো—জানি—তোমাকে নিয়ে আমার কোন ভয় নেই। হঠাৎ যেন কয়েকমুহূর্ত পর জরুরী কোন কথা মনে পড়ে গিয়েছে এমন করে তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে বলল, আচ্ছা, আসব না আসব না করেও তো তাব্রিজ থেকে বাকুতে এলাম অগ্নিদেবতার মন্দিরে পুজো দেখতে, বাকু থেকে—

কী করব বল! কেমন করুণ আর অসহায় মনে হলো ভিখুর

মুখখানা। ভারী নিশ্বাস ছেড়ে বলল, সবই ভবিতব্য কৃষ্ণাবাঈ। আমরা কি জানতাম আস্ত্রাখানে দাঙ্গা বাধবে!

কোন কথাই বলল না, বলতে পারল না কৃষ্ণাবাঈ। তার মুখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল।

সেই নিশিরাত্রে দূরদেশের সেই মেলার পাথরের ঘরের আলো-আঁধারিতে তারা মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বসে রইল দুর্লঙ্ঘ্য মহাশক্তিধর সেই অদৃশ্য নিয়তির কাছে নিতান্ত অসহায় দুটো প্রাণীর মতো। অস্বস্তিকর সেই নীরবতা ভঙ্গ করে ভিখু বলল, জান, ক'দিন থেকে হাকিমসাহেবের কথা খুব মনে পড়ছে।

একটু থামে। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, মানুষটার কথা ভাবতে অবাক লাগে কৃষ্ণাবাঈ, কে জানে, গাছ-গাছড়ার ওষুধের সেই টানেই না অন্য কোন জ্বালায় ঘর ছেড়েছিল। ভাসতে ভাসতে হাজির হয়েছিল গৌড়ে।

আর বল না গো। তাঁর কথা ভাবলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। বলতে বলতে কৃষ্ণাবাঈয়ের চোখদুটো জল ভরে এল।

ঠিক তার পরের দিনই ঘটে গেল কাণ্ডটা। সেদিন বিক্রি-বাটা শেষ করে সন্ধ্যার পরে গুরোভদের সঙ্গে ভিখু গিয়েছিল মেলায় বেড়াতে। রুশীয় দোকানীদের সারিতে ভিখুকে ঢুকিয়ে দু'পাশের ঝকঝকে রুশী তলোয়ার, তীর, বর্ম্য, আরও হরেকরকম পণ্য দিয়ে সাজানো এক-একটা খুপরির মতো দোকানঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে সুচ্‌স্কোভ বলল, আজ গুরোভ তোমাকে ছাড়বে না ভিখুভাই, তোমাকে সেই বস্তুটা দেখাবেই।

ও হ্যাঁ, কি বল তো, তোমরা বারে বারে বলছো!

কিন্তু সেদিনও সেই রহস্যময় বস্তুটি দেখা হলো না ভিখুর।

হঠাৎ একজন রুশীয় বেনিয়া ছুটতে ছুটতে এসে বলল গুরোভকে, তোমাদের দোকানে ডাকাত পড়েছে! সঙ্গে সঙ্গে খস্‌ শব্দ করে

কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ার বের করে নিয়ে ছুটল তাদের দোকানের দিকে গুরোভ। ছুটতে ছুটতে বলল, নিশ্চয়ই শালা ওই আঙুল-কাটা তাতারটার কাজ।

তুমিও এসো ভিখুভাই। দূর থেকে হেঁকে বলল সুচ্‌স্কোভ।

ভিখু ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ একটা রুশী তলোয়ারের দোকান থেকে একটা তলোয়ার টেনে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল গুরোভদের পশমের দোকানের দিকে। দোকানের সামনে গিয়ে দেখল, সশস্ত্র কয়েকজন তাতার সঙ্গে নিয়ে সেই দস্যুসর্দার নিজের বুক চাপড়ে হাঁক পাড়ছে, লুট কর শালাদের দোকানের সব মাল, ওরা আমাকে জখম করেছে, আমি ওদের—

তার কথা আর শেষ হলো না। গুরোভ আর সুচ্‌স্কোভ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপরে।

ঠন্‌···ঠন্‌···ঠন্‌ শব্দ বেজে উঠল তলোয়ারে তলোয়ারে। গুরোভ আর সুচ্‌স্কোভ পাগলের মতো তলোয়ার চালাচ্ছে। হঠাৎ সেই ডাকাতদের কয়েকজন ঢুকে পড়ল দোকানের ভেতরে। যেই গুরোভদের সেই বহুমূল্য পশম লুঠ করতে এল, অমনি তলোয়ার বাগিয়ে ধরে বাঘের মতো গর্জন করে উঠল ভিখু, খবরদার, দোকানের মালে হাত দিবি তো একেবারে কচুকাটা করব তোদের—

থমকে দাঁড়ালো ডাকাতেরা। তারা দেখল, লাঠি চালানোতে ওস্তাদ সেই ভারতীয় বেনিয়া গুরোভদের বহুমূল্য রেশমের পণ্যসম্ভার আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতের খোলা তলোয়ারে নিশ্চিত মৃত্যুর ইঙ্গিত ঝকমক করছে। ইতিমধ্যে তলোয়ারের ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দে, ডাকাতদের আস্ফালনে, গুরোভদের হুঙ্কারে সচকিত হয়ে উঠেছিল মেলা। রুশী দোকান লুঠ হচ্ছে দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে রুশীয় বেনিয়ারা এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল ডাকাতেরা।

তোমার জন্যই আমাদের দোকানের মাল লুঠ হতে হতে বেঁচে গেল ভিখুভাই। ভিখুকে বুকে জড়িয়ে ধরল গুরোভ। হেসে হেসে

সুচ্স্কোভ বলল, ভারতীয় বেনিয়ারা যে খুব সাচ্চা লোক, তোমাকে দেখেই তা বুঝতে পারা যায় ভিখুভাই।

এই ঘটনার পর ভিখু তাদের খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

আর একদিন। গুরোভ, সুচ্স্কোভ আর ভিখু বিক্রি-বাটা শেষ করে সন্ধ্যার পর মেলায় বেড়াচ্ছিল।

তাতারদের নাচের আসরে হৈ-হৈ চীৎকার আর হুল্লোড় শুনেই গুরোভ তাদের নিয়ে ছুটল সেইদিকে। সেখানে যেয়ে দর্শকদের ভীড়ের ভেতরে উঁকি দিয়ে ভিখু দেখল এক নারকীয় দৃশ্য! ভদকা খেয়ে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে দু-তিনজন। তাদেরকে মাড়িয়েই দুটো যুবতী মেয়ে কেমন আচ্ছন্নের মতো উদ্দাম গতিতে নেচে চলেছে। অপ্রতুল বেশবাসের আড়ালে তাদের কাঁচা পেয়ারার মতো ডাঁসা দেহটার চারদিকে ছোঁক ছোঁক করছে কামনান্মোত্ত পশুর দল। কেউ কেউ আবার তাদের কারো মাথায় চাঁটি মারছে; কেউ তাদের গায়ে খিমচি কাটছে। মেয়েগুলোও কম যায় না। নাচতে নাচতেই ঠাস করে তাদের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে আবার বাজনার তালে তালে নেচে চলেছে। আর একজন একটু দূরে একটা অর্ধনগ্ন মেয়েকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে আদর করতে করতেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! লোকটা যত কাঁদে, মেয়েটাও কাঁদে—

যতসব মাতালের কাণ্ড! হাসির রোল পড়ে গেল দর্শকদের ভেতরে। হঠাৎ একজন বলল, আরে না-না, মেয়েটা ওই লোকটার মায়ের পেটের বোন। মেয়েটা যখন খুব ছোট তখন নাকি লোকটা ঘর ছেড়েছিল, তাই চিনতে না পেরে ব্যাটা তার বোনের সঙ্গেই —

চিনল কি করে?

কথায় কথায় পরিচয় বেরিয়ে পড়েছে।

স্তব্ধ হয়ে গেল হাসি। ভারী হয়ে উঠল ভিখুর মনটা। আর

দাঁড়ালো না। গুরোভ বলল, এর মধ্যে চললে যে হে—আরে এরকম তো হয়ই—

না ভাই, ভালো লাগছে না।

ডেরার দিকে হাঁটতে হাঁটতে মেলার জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কেন যেন ভিখুর মনে হলো, এই ভীড়ের ভেতরে যদি হাকিমসাহেবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়! ওই লোকটার সঙ্গে যেমন তার বোনের দেখা হয়ে গেল! ইস, তাহলে যে কি মজাই হতো!

হাকিমসাহেব! তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরা চোখছুটো মনে পড়তেই তার বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠল।

ভিখুভাই না? হঠাৎ পিছন থেকে ডাকল কে যেন। মুখ ঘুরিয়ে চমকে উঠল ভিখু। সামনে দাঁড়িয়ে তাব্রিজের বেনিয়া কপিচান্দভ। হেসে বলল, কি হে কপিচান্দভ, মেলায়—হঠাৎ থেমে গেল ভিখু। কপিচান্দভের বিষণ্ন গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাসি মিলিয়ে গেল।

ও কী! কপিচান্দভ তার দিকে অমন করে তাকাচ্ছে কেন?

কি হয়েছে তোমার কপিচান্দভ? আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে—

মেলায় সেই থেকে তোমাকে যে কত খুঁজছি ভিখুভাই—হঠাৎ থেমে যায় কপিচান্দভ। ভিখু অধৈর্য হয়ে বলে, কী ব্যাপার কপিচান্দভ, হাকিমসাহেব কেমন আছে? ঠিকমত বোখারায় পেঁৗছেছে—

চুপ করে থাকে কপিচান্দভ। তার ঘাড়ে দুই হাত রেখে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ভিখু চীৎকার করে বলে, বল, চুপ করে আছো কেন কপিচান্দভ? বল কি হয়েছে হাকিমসাহেবের?

হা—হাকিমসাহেব নেই ভাই।

কী! তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসল

কপিচান্দভের গালে। চড় খেয়ে কিছু মনে করল না কপিচান্দভ। গালটা চেপে ধরে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, রাস্তাতেই তার অসুখ করেছিল ভাই। শেষকালে খুব কষ্ট।

কি বলছে কপিচান্দভ—কাকে বলছে! কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না ভিখু। আলো-ঝলমলে সেই মেলার সব আলো যেন নিভে গেছে। চোখের সামনে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার।

কোনরকমে সেদিন ডেরায় ফিরতে পেরেছিল ভিখু। পাথরের সেই ঝুপসী ঘরে ঢুকেই দড়ির চারপাইটার ওপর আছড়ে পড়ে ছেলে-মানুষের মতো অঝোরে কেঁদেছিল। সব শুনে পাথর হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণাবাঈ। পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছিল শাশা, এসেছিল স্যারস্যাটোভ, এসেছিল মোহনলাল। তারা জানে না, সেই মানুষটা ভিখুব মনের কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল! তবুও তারা নানা কথা বলে ভিখুকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।

একদিনেই যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেল ভিখুর। মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। টকটকে ফরসা রঙ বলেই চোখের নীচে কালির দাগ আরও ঘন বলে মনে হলো। দোকানে বসে না। কারো সঙ্গে কথা বলে না। গুরোভ-সুচ্স্কোভদেরও ফিরিয়ে দেয়। মহা মুস্কিলে পড়ে গেল কৃষ্ণাবাঈ। তার বুকের ভেতরেও কান্নার ঢেউ তোলপাড় করে। কিন্তু বাইরে বাইরে প্রশান্ত থেকে ভিখুকে সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলতে চেষ্টা করে। ভেবে পায় না, কি করলে ভিখুর মন ভালো হবে! তুমি তো প্রায়ই বল ভবিতব্য, তার মাথাটা কোলের ভেতরে টেনে নিয়ে বলে কৃষ্ণাবাঈ, তা সেই নিয়তিই ধর না কেন?

ভাবতে পার কৃষ্ণাবাঈ, যা খেলে মানুষ মরবে না, এমন গাছ-গাছড়া খুঁজতে যে একদিন ঘর ছেড়েছিল, সেই মানুষটা মরার সময় এক ফোঁটা ওষুধ—অবরুদ্ধ ব্যথায় ভিখু আর কিছু বলতে পারে না।

এই অবস্থায় একদিন আবার এল গুরোভরা! ভিখুকে বলল, কি

ভায়া, যাবে নাকি মস্কাউ? আমরা তো যাচ্ছি—ক'দিন একটু ঘুরে-টুরে এলে তোমার মন-মেজাজও ভালো হবে।

আপনাদের সঙ্গেই যাব। হেসে কৃষ্ণাবাঈ বলল, আপনাদের বন্ধুর মন আর এখানে—

ঠিক বলেছো কৃষ্ণাবাঈ। সমস্ত বিষণ্নতা আর অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুহূর্তে চঞ্চল আর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল ভিখু। বলল, এখানে আর এক দণ্ডও ভালো লাগছে না—মস্কাউতেই চল।

যাওয়ার দিনে ওকা নদীর ঘাটে তাদের বিদায় দিতে এল শাশা, এল স্যারস্যাটোভ আর মোহনলাল। ভিখুর গৌরবর্ণ দীর্ঘ সেই চেহারা সেই উদ্দীপ্ত মুখাবয়ব আর স্বপ্নাচ্ছন্ন ছুটো চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শাশা। কিন্তু ভিখু তার দিকে তাকাতেই সে মাথা নীচু করল। ভার-ভার গলায় বলল, বাবা, তুমি আমাকে মস্কাউতে যেতে দিলে না।

আরে ভিখুভাইদের ঠিক আছে কিছু! ব্যথিত চোখে দূরে নৌকোটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল স্যারস্যাটোভ, আমাদের সঙ্গেই তো আস্ত্রাখানে ফেরার কথা ছিল, কি যে হলো চলল—

ঠিকই বলেছেন পধনসাহেব, কখন যে কি হয়ে যায়—

আরে ভিখুভাই, একটু তাড়াতাড়ি কর। গুরোভ তাড়া দিল, বরফ পড়তে শুরু করলে আর যাওয়া যাবে না।

নৌকো ছেড়ে দিল। ওকা নদীর ভাটির স্রোতের টানে নৌকো তরতর করে চলল এগিয়ে। আশ্চর্য। স্যারস্যাটোভ নয়, মোহনলাল নয়, শুধু শাশার দিকেই অপলক চোখে তাকিয়ে রইল ভিখু। তার বুকের ভেতরটা কেমন ভারী হয়ে উঠল। সেই গৌড় থেকে নভো-গোরোদ, এই সুদীর্ঘ পথের বাঁকে বাঁকে হাটে-বাজারে কত দেশের কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, ঝাপসা হয়ে গিয়েছে তাদের মুখ। কিন্তু আস্ত্রাখানের ভারতীয় বেনিয়াপল্লীর এই মেয়েটি তার মনের আকাশে তারার মতো জ্বলজ্বল করবে।

কিন্তু কেন, তার রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো দীঘল দেহে সমুচ্ছল যৌবনশ্রীর ভেতরে গঙ্গা আর কাস্পিয়ানের ঢেউ এসে মিলেছে বলে? যতক্ষণ দেখা যায় ভিখু তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। দেখতে দেখতে সেই তন্বী রমণী-মূর্তি দূরে—বহুদূরে কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে একটা অবাস্তব স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল।

ঝপ্-ঝপ্—ঝপ্—জোরে জোরে দাঁড় টানছে গুরোভ। বাতাসে ফুর ফুর করে উড়ছে তার ঘন সোনালী দাড়ি; উড়ছে পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো লম্বা চুল। দাঁড় টানার তালে তালে তার গায়ের লম্বা টিলের কোটের নীচে পিঠের পেশীগুলো লোহার এক-একটা বলের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। হঠাৎ সে হেঁকে অন্য একটা নৌকোর আরোহীদের বলল, তোমাদের নৌকো কোথায় যাবে হে?

আবার কোথায়—রাজধানী—রাজধানী হু-হু বাতাসে ভেসে এল তাদের উত্তর। সেই নৌকোর এক বৃদ্ধ যাত্রী দূরে মস্কাউয়ের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, জয় প্রিয় মাতা মস্কাউয়ের জয়—

জয় প্রিয় মাতা মস্কাউয়ের জয়!! যাত্রীদের সমবেত জয়ধ্বনি নদীর বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে—বহুদূরে মিলিয়ে গেল।

ভিখুর বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজছে। সে তাহলে সত্যিই মস্কাউ যাচ্ছে এবার! হঠাৎ সে বলল, আচ্ছা সুচ্‌স্কোভ ভাই, তোমাদের রাজধানীর নাম মস্কাউ কেন, আর তোমরা তাকে প্রিয়মাতা মস্কাউ-ই বা বল কেন?

সুচ্‌স্কোভ হাসে। তাদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান মস্কাউ সম্বন্ধে বাঙ্গালা সওদাগরের কৌতূহল দেখে খুব খুশি হয়। কৃষ্ণাবাঈয়ের মুখখানাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানুষটার অজানাকে জানার আগ্রহের শেষ নেই। যাক, যা খুশি করুক। হাকিমসাহেবের শোক তো সামলে উঠেছে সে! আর কোন দুশ্চিন্তা নেই।

জান ভিখুভাই 'মস্কোভা' নামে একটা ছোট নদী আমাদের রাজধানীকে অর্ধচাপের মতো ঘিরে রেখেছে বলেই সেই নদীর নাম অনুসারে শহরের নাম হয়েছে 'মস্কাউ'। সুচ্‌স্কোভের চোখদুটো গভীর হয়ে ওঠে। আবার বলে, আর আমাদের রাজধানীকে আমরা এত পবিত্র মনে করি কেন—সেটা মস্কাউতে গেলে বুঝবে।

আরে বলই না শুনি? ভিখুর চোখে উত্তেজনা জ্বলজ্বল করে। নৌকোর গলুইয়ের কাছ থেকে বাতাসে ভেসে আসে গুরোভের উল্লসিত কণ্ঠস্বর, আ-বে সুচ্‌স্কোভ, ভিখুভাইকে সেই ব্যাপারটা এখুনি বলবে নাকি?

কি ব্যাপার ভাই? ভিখু তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

ভিখুভাই, তুমি ওর কথা ছাড় তো, সুচ্‌স্কোভ গুরোভের প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলে, শোন মস্কাউতে গেলেই দেখবে শহরের যেদিকে তাকাও শুধু গীর্জা আর গীর্জা! সাধু নিকোলাসের গীর্জা, পবিত্রকুমারীর গীর্জা। রাজবাড়ি ক্রেমলিনের ভেতরের ক্যাথিড্রাল গীর্জা, শহরের কাছাকাছি 'এইস্তা মঠ', আরও কত গীর্জা যে আছে—

কেন, একটা শহরে এত গীর্জা থাকার কারণ কি? ভিখুর চোখদুটো উৎসুক হয়ে ওঠে। আবার বলে, আমাদের গৌড়ে তো পর্তুগীজদের মাত্র একটা—

শোন, ভিখুভাই আমি তো বেশি কিছু জানি না, সাধ নিকোলাসের সেই গীর্জার পাদ্রীর কাছে যা এক-আধটু শুনেছি মস্কাউ কি আমাদের দেশের ইতিহাস—সুচ্‌স্কোভের কণ্ঠস্বরে আবেগ ফুটে ওঠে, ওই যে নভোগোরোদের মেলা থেকে এলে, ওই নভোগোরোদ হলো রাশিয়ার সবচেয়ে পুরানো শহর। সেখানে কোন রাজা-টাজা ছিল না, বুঝলে! রাজ্যের লোকরাই নিজেরা নাকি রাজ্য চালাতো। ফলে যা হয়, নিজেদের ভেতরে মারামারি লেগেই থাকতো। তারা একদিন দল বেঁধে এল রুশবংশীয় এক রাজকুমার রুবিক আর তার

দুই ভাইয়ের কাছে। তারা অনুরোধ করল তাদের নভোগোরোদ শাসন করতে।

স্মচ্‌স্কোভটা যে কী কচকচি আরম্ভ করল?

আঃ, শুনতে দাও না গুরোভ ভাই!

কিন্তু রুবিক আর তার ভাইরা আবার নিজেদের ভেতরে বিবাদ করতে শুরু করল। সেই সুযোগে তাতাররা এসে কেড়ে নিল নভোগোরোদ। আর জাঁকিয়ে বসে সারা রাশিয়া শাসন—

ওই তাতারগুলো একদিন তোমাদের—

হ্যাঁ। এক-দুই বছর নয়, শুনেছি পুরো—দুটো আঙুল উঁচু করে দেখালো স্মচ্‌স্কোভ, দু'শো বছর আমাদের শাসন করেছিল।

তারপর?

ওই যে 'এইস্তা' মঠের কথা বললাম, ওই মঠ যে সন্ন্যাসীর, সেই সার্গিয়াস, তাঁর বরেই রাজকুমার দমিত্রিয়স তাতারদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হারিয়ে দিলে কি হবে, পুরো দেশটাকে সে বাগে আনতে পারে নি।

তাহলে কে পেরেছিল?

কেন, আমাদের বর্তমান এই জারের ঠাকুর্দা ইভান! তৃতীয় ইভান—আরে যাঁকে মহৎ ইভান বলে আমাদের দেশে। তাঁর সময় থেকেই মস্কাউয়ের উন্নতি শুরু হয়। একটু থামে। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তারপরেও কত অসংখ্য বার যে ওই তাতার কুকুরগুলো আমাদের মস্কাউয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আর আকাশের তারার মতো কত কোটি কোটি মানুষ যে খুন করেছে, রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে! অনেক রক্ত দিয়ে আমরা পেয়েছি আমাদের মস্কাউকে। তাই আমরা বলি পবিত্র মাতা মস্কাউ।

ভিখু কথা বলে না। তার মুগ্ধ চেতনার ভেতরে ভাসতে থাকে অনেক মঠ, অনেক গীর্জার গম্বুজে ছেয়ে-থাকা এক বিশাল শহরের ছবি।

ওকা থেকে ভল্গায় এসে পড়ে তাদের নৌকো।

হঠাৎ চমকে ওঠে কৃষ্ণাবাঈ। গৌড়ের জমিদারবাবুদের শ্বেত-পদ্মের পুকুরে যেমন সাদা সাদা পদ্ম দেখা যায়, তেমনি নদীর জলের ভেতরে সাদা সাদা ওগুলো কি ভাসছে!

ওগুলো কি?

ওঃ! ওই সাদা সাদা ফেনার মতো? ওগুলো বরফ—বরফ। হেসে বলল স্যুচ্‌স্কোভ! চলুন না, আরও কত দেখবেন!

একটু বেশি ঠাণ্ডা পড়লেই নদীর জল জমে বরফ হয়ে যাবে। গুরোভ যেন খুব চিন্তিত হয়। আরও জোরে জোরে জলে ঝপ্‌-ঝপ্‌ শব্দ তুলে দাঁড় টানতে থাকে।

বেলা বাড়ে। কুয়াশা আরও ঘন হয়। ভিখু দুম্বার চামড়ার পুস্তিনটা আরও ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে বসে থাকে। তার মনের অন্ধকারে ঝাপসা আর অস্পষ্ট এক-একটা ছবি ফুটে উঠতে থাকে। সেই আস্ত্রাখানের ভারতীয় বেনিয়া মহল্লার ঘরে ঘরে আগুনের লেলিহান শিখা—নৌকো বোঝাই সশস্ত্র রুশী শিকারীর দল—সেই ভল্গার সুদূর উত্তরে গভীর জঙ্গলে খেঁকশিয়াল, বেজী, কাঠবিড়ালীর গায়ের বড় বড় লোম—পশম—হাকিমসাহেব—নসীবন—

আমার খুব শীত করছে গো। ভিখুর কাছে সরে এল কৃষ্ণাবাঈ। ভিখুর আচ্ছন্নতা কেটে গেল। পরম আদরে তাড়াতাড়ি হামাদানী শালটা তার গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিল। স্যুচ্‌স্কোভ হেসে বলল, এইখানেই আপনার এত শীত লাগছে, মস্কাউতে তো আরও ঠাণ্ডা মনে হবে।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মতো বরফ পড়তে লাগল। সেই তুষার-বৃষ্টি আর তুহিনশীতল বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোনরকমে নৌকো চালিয়ে তারা কয়েকদিন পরেই পৌঁছে গেল মস্কাউতে।

তেইশ

মস্কাউ!

তীব্র উত্তেজনায় দুরু-দুরু কাঁপে ভিখুর বুক। ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়ের ওপরে সারা শহরটা* তৈরি হয়েছে। বাড়িগুলো নীচু নীচু। কোনটা একতলা, কোনটা দোতলা, দেওয়ালগুলো কাঠের। লাল, নীল, সোনালী রঙের টিনের কিংবা দস্তার চাল। হঠাৎ দূর থেকে দেখলে মনে হয় লাল, নীল, সোনালী কতগুলো গুটি কে যেন সাজিয়ে রেখেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলো থেকে একটু দূরে দূরে এক-একটা বাড়ির সামনে ছোট একফালি উঠোন। উঠোনের এক কোণে আবার ছোট্ট একটু বাগানও আছে। ভিখু হেসে বলল বন্ধুদের, আরে বাড়িগুলো খানিকটা তাব্রিজের মতো না?

ইস, কত যে গীর্জার গম্বুজ দেখা যাচ্ছে! অস্ফুটস্বরে বলল কৃষ্ণাবাঈ।

সুচ্‌স্কোভ আর গুরোভ বাজারের কাছাকাছি তাদের জন্য একটা বাড়িও ঠিক করে ফেলল। পাশাপাশি দু'খানা ঘর। সব বাড়ির মতো পাথরের মেঝে। কাঠের দেওয়াল। বন্ধুরা বাজারের মাঝখানে একটা দোকানঘরও ভাড়া করে দিল। কিন্তু মালপত্র নিয়ে দোকানে যেয়েই একটু অবাক হলো ভিখু আর কৃষ্ণাবাঈ।

এ কী! ওগুলো কিসের ছবি? দোকানঘরের দেওয়ালে টাঙানো কতগুলো সাধু-সন্তের ছবির দিকে তাকিয়ে ভিখু জিজ্ঞাসা করল।

সুচ্‌স্কোভ কোন কথা বলল না। স্নিগ্ধ একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ভিখুর পিঠে হাত রেখে বলল, তোমাকে আমরা

---

* "The Towns of Ancient Rus": Tikhomirov. Moscow, 1959.

ভালোবাসি ভিখুভাই—অনেক দূর থেকে ব্যবসা করতে এসেছো আমাদের দেশে—

আরে তার সঙ্গে এই ছবির যোগ কি ?

আছে, আছে ভিখুভাই। এই যে দেখছো, এই ছবিটা এটা হলো সাধু যোহনের ছবি। এটা মরিয়ম আর এটা হলো সাধু নিকোলাস—এগুলোকে আমরা বলি 'ইকন'। একটু থেমে আবার বলল, আমাদের বিশ্বাস ইকন দোকানে থাকলে ব্যবসায়ে খুব লাভ হয়। ভিখুর চকিতে মনে পড়ে গেল, গৌড়ের সওদাগর হোসেনচাচার কাছে প্রথম শুনেছিল এই 'ইকনের' কথা। বলল, তোমরা যে আমাকে কী ভালোই বাস !

ওসব বল না ভিখুভাই, গম্ভীর হয়ে গুরোভ বলল, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছো একবার, আর একবার জানের চেয়েও বেশি আমাদের পশম—

ধুর, কি যে বল গুরোভভাই ! লজ্জার ছায়া পড়ে ভিখুর চোখে। কৃষ্ণাবাঈ রক্তবর্ণ একটা মসলিনের শাড়ি পেঁচিয়ে পরেছে। একবার সাধু নিকোলাসের ছবির কাছে, একবার যোহানের ছবির কাছে যেন বাতাসে ভেসে ভেসে উড়ে উড়ে একটা রঙীন প্রজাপতির মতো যাচ্ছে আর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছে, ইস, কী সুন্দর—ছবিগুলো আমি কিন্তু দেশে নিয়ে যাব।

নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই, আরও অনেক ইকন দিয়ে দেব।

পরের দিন ভিখু শেষ অবশিষ্ট রেশম আর মসলিনের সেই সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভারের পসরা সাজিয়ে বসল মস্কাউয়ের বাজারে। সেই দোকানেরই এক পাশে চম্বন আলীর সেই মেহগিনি কাঠের বারকোষ খুলে কৃষ্ণাবাঈ বের করল একে একে মুক্তা, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ আরও কত রকমের রত্ন। ভিখুর সামনেই হাসি-হাসি মুখে বসল কৃষ্ণাবাঈ। ঘন নীল রঙের বদনখাস শাড়িপরা তার

দীঘল দেহটাকে যেন একটা নীলকান্ত মণিরই মতো মনে হতে লাগল। মুহূর্তে বাতাসের বেগে খবর রটে গেল মস্কাউয়ের বাজারের দিকে দিকে, এক বাঙ্গালা সওদাগর সপরিবারে এসেছে রেশম, মসলিন আর সুদৃশ্য রত্নের সওদা নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানে খরিদ্দারদের ভীড় বাড়তে শুরু করল। তাদের ভেতর গুঞ্জন উঠল, বাঃ বাঃ, সকালের রোদের মতো এমন সুন্দর রঙের কাপড়ও আবার হয় নাকি!

কত—কত রুবল?

আচ্ছা ওটা কি প্রবাল? দাম কত?

'ক্রাসকা' এনেছেন, 'ক্রাসকা'? আপনাদের দেশে তো আরও সুন্দর সুন্দর রঙ পাওয়া যায়?

গাছ-গাছড়ার ওষুধ এনেছেন?

আমরা শুধু রেশম, মসলিন আর পাথর, মণি-মুক্তার ব্যবসা করি মশাই, ভিখু হাত জোড় করে তাদের বলে, এই দেখুন, এই রেশমের কাপড়ের নাম মটকা, এটা খামরু—

কিন্তু ভিখুকে বেশি বিজ্ঞাপন দিতে হলো না। খানদানী খরিদ্দারেরা গ্রীষ্মকালে সেই লম্বা কোটের মতো চোগার জন্য কিনতে লাগল রেশম আর মসলিনে মেশানো সেই সুদৃশ্য কাপড়।

দেখা গেল কৃষ্ণাবাঈয়ের নানারঙের পাথর আর রত্নের বাক্সের সামনে মস্কাউ শহরের ধনী, বিলাসী নাগরিকদের জমাট ভীড়। তারা পাকা জহুরীর মতো এক-একটা রত্ন নেড়ে-চেড়ে দেখছে। কলকল করে তাদের দেশের ভাষায় (রাশিয়ান) কী যেন বলে চলেছে। আবার কেউ কেউ পার্শীতে বলছে, এই মুক্তা ভাল হবে তো?

এ মুক্তো সম্বন্ধে আর কিছু বলতে হবে না। হেসে হেসে কৃষ্ণাবাঈ বলে, খুব হাসিন জিনিস, খাটি মান্নার উপসাগরের সাচ্চা মুক্তা— আর এই যে ইন্দ্রনীল পাথর, এটা চোলমণ্ডলম্—

আরে ওসব পরে বলবেন, এই নিন, আগে রুবল ধরুন তো!

দিনের শেষে তারা দেখল, রাশি রাশি রুবলে ভরে গিয়েছে তাদের দুটো তাঞ্জাম।

সন্ধ্যা নামল মস্কাউ শহরে। দোকানপাট বন্ধ করে চলে এল গুরোভ আর সুচ্‌স্কোভ। কৃষ্ণাবাঈ হেসে বলল, কী, বন্ধুকে বুঝি অনেকক্ষণ দেখেন নি।

আরে এইরকম একজন বন্ধু পায় ক'জন ?

হ্যাঁ, আপনার মতই মারামারি আর খুনোখুনি করতে ওস্তাদ।

গুরোভের মুখে লজ্জার ছায়া পড়ে। সুচ্‌স্কোভ বলে, আমাদের প্রিয় পবিত্র মস্কাউতে এসেছেন, আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখতে হবে না ?

তারা কথা বলতে বলতে ভিখুদের বাড়ির দিকে চলেছে।

ঢং-ঢং-ঢং—হঠাৎ খুব জোরে একটা ঘণ্টার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। কয়েকমুহূর্ত সেই শব্দ কান পেতে শুনে উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাততালি দিয়ে চীৎকার করে উঠল গুরোভ, ইবেরীয় ম্যাডোনা—ইবেরীয় ম্যাডোনা আসছে !

দ্রুত এগিয়ে আসছে সেই ঘণ্টাধ্বনি। ভিখুর চোখদুটো ছটফট করছে। কিন্তু কিছু বলার আগেই সে দেখল, জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে চার ঘোড়ায় টানা একটা বিশাল সুদৃশ্য গাড়ি। গাড়ির মাঝখানে দু'জন পাদ্রী মস্তবড় ছবি কোলে করে বসে আছে।

ইবেরীয় ম্যাডোনা দেখেছি, সুচ্‌স্কোভ দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল গুরোভ, আর আমাদের পায় কে—আমাদের মনের সেই বাসনাটা—

আঃ আগে ইবেরীয় ম্যাডোনাকে অভিবাদন কর গুরোভ। বলেই তাড়াতাড়ি সুচ্‌স্কোভ মাথার টুপী খুলে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। বলল, জান ভিখুভাই, আমাদের বিশ্বাস এই ছবির অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে। প্রতিদিন একবার যে কোন সময়ে মস্কাউ শহরের রাজপথে এই ছবিখানাকে বের করা হয়।

যার নজরে পড়ে তার খুব শুভ হয়। গুরোভ বলে, সেই

তাব্রিজ যাওয়ার আগে দেখেছিলাম বলেই ব্যবসায় প্রচুর লাভ করেছিলাম।

সেকথা শুনেই দূর থেকে ইবেরীয় ম্যাডোনাকে প্রণাম করল কৃষ্ণাবাঈ। কেন যেন তার বুক শূন্য করে দিয়ে একটা ভারী নিশ্বাস বেরিয়ে এল। অস্ফুটস্বরে বলল, ওর মঙ্গল কর ঠাকুর—ওর মঙ্গল কর।

আবার রাস্তাব দু'পাশে বাড়ি-ঘর দোকান-পাটের মাঝে মাঝে এক-একটা চার গম্বুজের গীর্জা দেখতে দেখতে হঠাৎ ভিখুর নজরে পড়ল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গৌড়ের নবাববাড়ির চেয়েও অনেক বড় আর সুন্দর একটা বাড়ি।

এটা কি ?

আরে এই তো আমাদের রাজবাড়ি ক্রেমলিন। এইখানেই আমাদের 'জার' থাকেন।

এই ক্রেমলিনের প্রাচীবটা কত লম্বা জান ? গুরোভ বলে।

কত ?

পাকা এক ক্রোশ।

তা রাজবাড়ির ভেতরে অনেকগুলো গীর্জার চূড়ো দেখছি কেন ?

কি জানি ভাই, আমরা কারবারী মানুষ, অতশত জানি না। তবে শুনেছি, রাজবাড়ির ভেতরে কতগুলো ক্যাথিড্রাল গীর্জা ছাড়া পবিত্র কুমারীর সমাধির ওপরে আরও একটা গীর্জা আছে।

কেন সুচ্‌স্কোভ, গুরোভ বলল, মস্কাউ নগর যিনি প্রথম তৈরি করেছিলেন সেই রাজা থেকে শুরু করে মহৎ ইভান, তাঁর ছেলে বেজিল ইভান ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন রাজার কবর আছে, সেকথাও ভিখুভাইকে বল।

হ্যাঁ, আমাদের দেশের মাঝখানে এই জায়গাটা তীর্থস্থানের মতো পবিত্র।

আচ্ছা, এর ভেতরটা যদি ঘুরে-ফিরে একটু দেখতে চাই, দেবে না ?

পাগল নাকি তুমি! গুরোভ বলে, দেখছো রুশী তলোয়ার বাগিয়ে কত সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটার চারদিকে!

তুমি যদি তোমার বাঙ্গালা দেশের রাজার কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র নিয়ে আসতে,—সুচ্‌স্কোভ যেন পুরানো দিনের কোন কথা মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আমার বাবার মুখে শুনেছিলাম একবার এক ইংরেজ সওদাগর সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়ে কেমন করে যেন আমাদের দেশের এলাকায় সেই উত্তর শ্বেতসাগরে এসে পড়েছিল।

তারপরে?

আমাদের জারের এলাকায় এসে পড়েছে জানতে পেরে চলে এল মস্কাউতে—এল ক্রেমলিনে।

জারের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিল?

হ্যাঁ, পারবে না কেন? সেই ইংরেজ সওদাগরকে যে পাঠিয়েছিল তার দেশের রাজা—রাজার কাছ থেকে নিয়ে আসা পরিচয়পত্র সোজা দাখিল করে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে জার খুব খাতির-যত্ন করেছিল তাকে। একটু থেমে আবার সুচ্‌স্কোভ বলল, সেই ইংরেজ বেনিয়া তো আমাদের জারকে দেখে একেবারে থ!

কেন?

কেন হবে না বল, আমাদের জারকে* যে দেখবে তারই চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যাবে। গুরোভ মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলল, জার যে কোটটা পরেন তার গায়ে সোনার চুমকি বসানো, মাথায় সোনার মুকুট, হাতের রাজদণ্ডটা পর্যন্ত সোনা দিয়ে মোড়া।

ইস! একটু চেষ্টা করলেই হয়তো রাজা টোডরমল্লের কাছ থেকে আমরাও একটা পরিচয়পত্র আনতে পারতাম। বলেই কৃষ্ণাবাঈ ভিখুর মুখের দিকে তাকালো।

ভিখু স্তব্ধ।

কৃষ্ণাবাঈ জানে এখন ওই বড় বড় ছুটো চোখে স্বপ্ন নেমেছে। সে স্বপ্ন সেই অদৃশ্য রাজপুরুষের স্বপ্ন—যার মাথায় সোনার মুকুট, হাতে সোনার রাজদণ্ড—

দেখতে দেখতে কেটে গেল ক'দিন। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভিখু দেখল শহরের উপকণ্ঠে সেই সার্জিয়াসের এইস্তা মঠ, দেখল যাতুঘর। যাতুঘরে যেয়ে দেখল একটা বীভৎস মূর্তি।

এটা কি?

আরে এটাই তো হলো ভলসের মূর্তি। খ্রীস্টান হওয়ার আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ভল্‌সের পুজো করতো ভিখুভাই।

নভোগোরোদের একটা রাস্তার নামও সেইজন্যেই বুঝি ভল্‌স। গুরোভ বলল।

সেদিন বিক্রি-বাটা শেষ করে ভিখুরা একটু বেশি রাত্রেই ফিরে এল বাড়িতে। পাশের ঘরে ভিখুর মালদাই কাপড়ের গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কৃষ্ণাবাঈ বলল, তোমার মালও তো প্রায় ফুরিয়ে এল—আমারগুলো তো কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বলতে বলতে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল ভিখুর চওড়া বুকে। কেমন নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো আবেশ মাখানো চোখছুটো তুলে ধরল ভিখুর মুখের দিকে। ভিখু পরমযত্নে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, হ্যাঁ, মালও প্রায় শেষ, ছুটো পয়সা লাভও হয়েছে, এখন ভাবছি—বলতে বলতে থেমে গেল ভিখু।

কি ভাবছো গো?

ভাবছি, দেশে তো ফিরে যেতে হবে। হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার দারুণ জরুরী কিছু একটা মনে পড়ে গেছে এমন করে বলল, আচ্ছা, এখানকার কোন্ কোন্ জিনিসের চাহিদা হবে গৌড়ে?

কেন, রুশী তলোয়ার, তীর, বল্লম, চামড়া, পশম, মোম, মধু, শীল-মাছের দাঁত—হঠাৎ থেমে গিয়ে ভিখুর নিটোল চিবুকটা জোরে নাড়া দিয়ে হেসে বলল, আহা, তুমি যেন জান না কিছু—না? বলেই ভিখুর বুকের ভেতরে গভীর পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজল সে। ফিস ফিস করে বলল, আমি আর কিচ্ছু চাই না গো—যেখানেই যাও, যতদূরেই যাও—আমি তোমার—বলেই হঠাৎ বদ্ধ একটা উন্মাদিনীর মতো ভিখুর মুখে গালে কপালে চুমু খেতে লাগল। দেখতে দেখতে গভীর এক সুখের অতলান্ত সাগরে নিমগ্ন হয়ে গেল তারা। আর—

আর বাইরে শীতার্ত রাত্রিটাও নিবিড় একটা পুলকের অনুভবে আবিষ্ট হয়ে এল।

পরের দিন থেকেই মস্কাউ শহরে বরফ পড়তে শুরু করল। রীতিমত অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মতো তুষার ঝরছে তো ঝরছেই। দূরে ক্রেমলিনের ভেতরে সেই ক্যাথিড্রাল গীর্জার উঁচু চূড়া, ছোট-বড় পাহাড়ের ওপরে বাড়িঘর গাছপালা রাস্তাঘাট দেখতে দেখতে ছেয়ে গেল বরফে। ভিখুরা সেদিন দোকানে যায় নি। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিখু অপলক চোখে দেখছে সেই বরফ পড়ার বিচিত্র দৃশ্য। কখনো উল্লসিত গলায় চেঁচিয়ে ডাকছে—কৃষ্ণাবাঈ, দেখ—দেখ, দেখে যাও। রাস্তার ছেলেরা কেমন বরফের গোলা পাকিয়ে খেলছে! আবার কখনো বলছে, তুমি ঘরে কি করছো বল তো, আরে গৌড়ে তো তুমি এই দৃশ্য দেখতে পাবে না মাথা খুঁড়লেও—

আরে আমার কি ওসব দেখার সময় আছে, তোমার বন্ধুদের এখানে দুপুরে খেতে বলেছি না? রান্না করতে করতে হেঁকে বলে কৃষ্ণাবাঈ।

বেলা বাড়ে। বাড়ে তুষার-বৃষ্টির বেগ। কখন রান্না হয়ে গেছে। নিমন্ত্রিতদের দেখা নেই। গায়ে রুশী পশমের জামা। তার ওপরে

হামাদানী শাল। তবুও দারুণ ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে কৃষ্ণাবাঈ। বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার বন্ধুরা তো এসে পড়লেই পারে বাপু, আমি সেরেসুরে নিয়ে লেপের নীচে—হঠাৎ বলতে বলতে থেমে গেল কৃষ্ণাবাঈ। তার নিজের দুই চোখের ওপর হাত বুলিয়ে কি যেন আন্দাজ কবতে করতে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, আমার চোখের পাতা জমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না গো—

কি হয়েছে, কী ব্যাপার! সেই মুহূর্তে গুরোভ আর সুচ্‌স্কোভ এসে দাঁড়ালো উঠোনে। গুরোভ দ্রুতকণ্ঠে বলল, আসুন, আসুন শীগ্‌গীর। বলেই কৃষ্ণাবাঈকে টেনে নিয়ে এল রান্নাঘরে। চুল্লীতে তখনো নিভু-নিভু আঁচ ছিল। গুরোভ তাড়াতাড়ি দুটো কাঠের টুক্‌রো ফেলে দিল তাতে। জ্বলে উঠল কাঠ। জ্বলন্ত চুল্লীব সামনে কৃষ্ণাবাঈকে ঠেলে বসিয়ে দিয়ে বলল, উনানের ওপর মুখটাকে বাড়িয়ে ধরুন—

কৃষ্ণাবাঈ তাই করল। দেখতে দেখতে চোখের পাতাদুটো পরিষ্কার আর হাল্কা হয়ে গেল। হেসে বলল, আপনাদের দেশে আব থাকা যাবে না।

বিপদ কি একটা? খেতে বসে আর এক কাণ্ড ঘটল। রান্নাঘর থেকেই ডাকল ভিখুকে, একটু এদিকে এস তো—

ছুটে গেল ভিখু। মুখ কালো করে কৃষ্ণাবাঈ বলল, এখন কি করি বল তো? সব খাবার জমে বরফ হয়ে গেছে যে—

তাই তো, এখন কি করা যায়! ভিখুর চোখে দিশেহারা দৃষ্টি ফুটে উঠল।

কি—কি হয়েছে? কিছু একটা গোলমালের আভাস পেয়ে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিল গুরোভ। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বলল, ওঃ, রান্না করা খাবার জমে বরফ হয়ে গিয়েছে তো! দাঁড়ান একটু, এখুনি আসছি। বলেই গুরোভ ছুটে চলে গেল বাইরে। ভিখু বিব্রত বোধ করল। চেঁচিয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছো গুরোভভাই—

গুরোভটা যা পাগলা! মৃদু মৃদু হাসতে লাগল সুচ্‌স্কোভ।

এই নিন, বলেই একটা হাত দেড়েক লম্বা আর একটু মোটা লাঠির মতো বরফের টুক্‌রো হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এল গুরোভ।

বরফের টুক্‌রোটা আবার কেন?

আরে বরফের টুক্‌রো নয়, এটা আজ আমাদের দুপুরের খাবার।

মানে? ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল কৃষ্ণাবাঈয়ের। ভিখুর চোখে তীক্ষ্ণ কৌতূহল। হো-হো করে হেসে বলল গুরোভ, আরে এটা হলো মুরগী—মুরগী—

মুরগী!

হ্যাঁ ভিখুভাই, বরফে জমানো হাঁস-মুরগী মস্কাউয়ের বাজারে যে কিনতে পাওয়া যায়। হেসে হেসে সুচ্‌স্কোভ বুঝিয়ে দেয়, মুরগী মেরে তার পালক তুলে জলে ফেলে রাখে দোকানীরা। জলে জমে ওগুলো বরফ হয়ে যায়। বরফের ভেতরে জমাট মুরগীটা অনেকদিন ভাল থাকে।

খাওয়া-দাওয়া মিটতে মিটতে বেলা পড়ে এল। যাওয়ার সময় বন্ধুদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল ভিখু। শাঁ-শাঁ বাতাসে পেঁজা তুলোর মতো বরফের কুচি উড়ে উড়ে আসছে। এত বরফ পড়েছে যে, রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। দিকে দিকে ঘন হয়ে নেমেছে গভীর কুয়াশা। দিনের বেলাতেই চারদিকে অন্ধকার মনে হচ্ছে। যেতে যেতে কেমন করে যেন ভিখুর মুখের দিকে তাকালো গুরোভ।

কিছু বলবে গুরোভভাই?

না, থাক।

সেই ঘন কুয়াশা আর তুষারে আচ্ছন্ন রাস্তার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তারা।

॥ চব্বিশ ॥

মস্কাউয়ের তীব্র শীত আর অবিরাম তুষারপাত যেন অফুরাণ।

ঠাণ্ডায় কৃষ্ণাবাঈ খুব কষ্ট পাচ্ছে দেখে ভিখু ঠিক করে ফেলল, আর না—এইবার দেশে পাড়ি দেবে। আবার সেই আস্ত্রাখান, বাকু, তাব্রিজ, ইস্পাহান হয়ে চলে যাবে সেই বুশায়ার। সেখানে তাদের জাহাজ আছে। আজও সেখানে অপেক্ষা করছে তাদের মৌলিম জহরভাই; তাদের পথ চেয়ে বসে আছে সারেঙ ননী, খারওয়া দাশু—আরও অনেকে।

থেকে থেকে তুষার-বৃষ্টি আর হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় কৃষ্ণাবাঈ প্রায়ই আজকাল বাইরে বড় একটা যায় না। সেদিন সন্ধ্যা উতরে গেল, তবুও ভিখু আসছে না দেখে একটু চিন্তিত হলো কৃষ্ণাবাঈ। কি যে এত আড্ডা দেয় বন্ধুদের সঙ্গে! কথা আর ফুরোয় না। একা ঘরে বসে মনে মনে ফোঁসে, আর একটা মানুষ যে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে—

ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—ঘোড়ার গাড়ির জোর ঘণ্টা বেজে উঠল তাদের দরজার সামনে। এবার হয়তো প্রাণের ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে হুল্লোড় করতে করতে বাবু গাড়ি করে এলেন। কিন্তু—

দরজার সামনে যেতেই চমকে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। খুশির হাসিতে ভরে গেল তার মুখখানা। গাড়ি থেকে রাশি রাশি রুশী তলোয়ার, তীর, বল্লমের ফলা নামাতে নামাতে বলল, জিনিসপত্র যা কেনাকাটার সব কিনে ফেললাম, বুঝলে! আর না, এই শীতে তোমার খুব কষ্ট।

আমার কষ্ট তুমি একটুও সহ্য করতে পার না—না গো?

কেমন করে পারব বল, তুমি যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে—

ছি! ছি! ওসব বল না গো—ওসব বল না। বেশি ভালোবাসলে

তার জন্য মানুষ—বলতে বলতে থেমে গেল কৃষ্ণাবাঈ। তীব্র একটা ব্যথা যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল তার গলার কাছে।

ভিখু কিছুই বলল না। শুধু তার সেই বেদনায় স্নিগ্ধ মুখখানা দু'হাতে তুলে ধরে সস্নেহে একটা চুমু এঁকে দিল।

রাত নামল গভীর হয়ে।

কৃষ্ণাবাঈয়ের তন্দ্রার ভেতরে দূরে—বহুদূরে ঘষা ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা অস্পষ্ট ছবিব মতো ফুটে উঠতে লাগল সেই চিড়াইবাড়ির ঘাট, সমুদ্রগামী এক-একটা জাহাজেব দীর্ঘ মাস্তুল আর আকাশ-ছোঁয়া সেই মাস্তুলেব ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেই তার 'কনক কেতকী কুসুম গৌর'—কেয়াফুলের মতো দীর্ঘ ঋজু, কনকচাঁপার মতো গায়েব রঙ যার—গভীর ঘুমের ঢেউ এসে সেই ছবিগুলোকে তলিয়ে নিয়ে গেল।

সেদিন তুষার-বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছিল। ঠাণ্ডাটাও কম ছিল। কৃষ্ণাবাঈ সেদিন ভিখুর সঙ্গে দোকানে বেরিয়েছিল। যা এক-আধটু মাল আছে ঝেড়েঝুড়ে সব বিক্রি করে দেবে। নিজেদের ব্যবহারের জন্য টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করে নেবে। দু-একদিনের ভেতরেই তারা রওনা হবে দেশের দিকে। তাই দ্রুতহাতে দু'জনে বিক্রি-বাটা করছিল।

দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামল। মালও তাদের ফুরিয়ে গেল। মস্কাউয়ের বাজারে ঘুরে ঘুরে তারা কিছু জিনিসপত্রও কিনে ফেলল। কিন্তু বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিখু। বলল, ও-হো! আমি তো ভুলেই গেছি—বলতে বলতেই একটা গাড়ি ডেকে কৃষ্ণাবাঈকে তুলে দিয়ে বলল, তুমি বাড়ি চলে যাও। গুরোভরা কেন যে ডেকেছিল একবার শুনে আসি—এখুনি আসছি আমি।

ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। হেঁকে বলল কৃষ্ণাবাঈ, ঠাণ্ডা লাগিও না যেন—তাড়াতাড়ি—তা-ড়া-তা-ড়ি চলে এস—

কিন্তু সেই রাত্রে তাড়াতাড়ি এল না ভিখু। চর্বির তেলের আলো জ্বলা ঘরের নিভু-নিভু আলোয় একা বসে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল কৃষ্ণাবাঈ। আশঙ্কায় ভেঙে পড়তে লাগল তার বুক। গভীর রাত্রে দরজায় ভিখুর পায়ের শব্দ বেজে উঠল।

ভিখু এল।

একটা কথাও বলল না কৃষ্ণাবাঈ। তীব্র অভিমানে থম থম করছে তার মুখ। কিন্তু ভিখুর সেই গম্ভীর আর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়েই তার বুক দুরু-দুরু কেঁপে উঠল। মুহূর্তে তার সেই অভিমান কোথায় উড়ে গেল। ভিখুর কাছে এসে বলল, তোমার কি হয়েছে গো—শরীর খারাপ!

ভিখু মাথা ঝাঁকায়।

তোমার কি হয়েছে, আমাকে বলবে না?

এবারেও চুপ করে থাকে ভিখু। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল খোঁটে মেঝেতে। তীব্র অসহ্য একটা ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ে তার বুকের ভেতরটা।

ও বুঝেছি! অস্ফুটস্বরে বলে কৃষ্ণাবাঈ, সেই আঙুলকাটা তাতার ডাকাতটা বুঝি আবার মস্কাউতেও গুরোভদের পিছু নিয়েছে!

না কৃষ্ণাবাঈ, তা নয়।

তাহলে কি? তুমি এমন করছো কেন?

কেমন করে সেকথা তোমাকে বলি বল তো!

সে কী! কি এমন কথা যা তুমি আমাকে—অবরুদ্ধ ব্যথার উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারল না কৃষ্ণাবাঈ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভিখুর মুখের দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারল, ভেতরে ভেতরে যেন তীব্র একটা ব্যথা চাপতে চেষ্টা করছে সে। কাছে এসে একটু হেসে শান্ত গলায় বলল, বলই না—আমি কিছুই মনে করব না—

আমি গুরোভদের সঙ্গে যাব কৃষ্ণাবাঈ।

কোথায়? ধক্ করে উঠল কৃষ্ণাবাঈয়ের বুকের ভেতরটা।

সেই ভল্গার উত্তরের জঙ্গলে, কালো পশমের জন্য বেজী আর খেঁকশিয়াল শিকার করতে। সেই যে পধনসাহেব স্যারস্যাটোভ বলেছিল গো —

ভিখু কি বলছে, কাকে বলছে—কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না কৃষ্ণাবাঈ। মাথার ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল, সমস্ত চেতনা যেন অসংলগ্ন আর শৃঙ্খলাহীন হয়ে গেল মুহূর্তে। মনে হলো, যেন মেঘে ঢাকা কালো আকাশটা চেপে নেমে এসেছে তার বুকের ওপরে। সেই অবিশ্রান্ত তুষারের বৃষ্টি ভারী করে তুলেছে বাতাস। তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

তুমি 'না' বললে অবশ্য যাব না, তবে ওরা ভল্গা দিয়ে চলে যাবে সেই শ্বেতসাগরে—হঠাৎ থেমে গেল সে। দেখল, মাথা নীচু করে ধীরপায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে কৃষ্ণাবাঈ।

শোন—শোন কৃষ্ণাবাঈ, তুমি রাগ করছো কেন? ব্যাকুল হয়ে বলল ভিখু। মুখে তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটল।

প্রহরে প্রহরে রাত বেড়ে চলল। পাশের ঘরে সেই গৌড়ে বিক্রি করার জন্য তলোয়ার, তীর, বল্লমের বাক্সগুলোর ওপর বসে দু'হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে ভাবে ভিখু, এখন কি করা যায়! একদিকে যে তাকে সমস্ত সত্ত্বা ঢেলে দিয়ে ভালোবাসে, যে চিড়াইবাড়ির ঘাটে সমুদ্রগামী জাহাজ দেখে দেখে ঘুরে বেড়ানো এক কিশোরের দূর দেশে পাড়ি দেওয়ার উদ্দাম স্বপ্নকে সার্থক করেছিল আর একদিকে সেই ভল্গার সুদূর উত্তরে বরফে আচ্ছন্ন ভয়াল অরণ্যে যেখানে ঘন কালো লোমশ বেজী, খেঁকশিয়াল আর কাঠবিড়ালীরা অবাধে ঘুরছে, ঘুরছে বন্য হরিণ আর সেই খরগোস—শীতে যাদের রঙ সাদা, আবার গরম পড়লেই যাদের সাদা রঙ পাল্টে কটা হয়ে যায়। হঠাৎ তার মনে হলো বাক্সের সব তলোয়ারগুলো বের হয়ে এসে যেন তাকে

খোঁচাচ্ছে, আর দু'দিক থেকে দুটো তীর এসে বিঁধে গেছে পাঁজরে। সেই গৌড় থেকে মস্কাউ, এই সুদীর্ঘ পথের ভেতরে কত জাহাজে, কাফেলার সরাইখানায়, ইস্পাহানের সেই ডুরসানা-মঞ্জেলে, নাভোগারোদের সেই পাথরের ঘরে আরও কত—কত জায়গায় তাদের কত অজস্র রঙীন ছন্দসুরভিত মুহূর্তগুলো যেন এক-একটা বল্লমের মতো তাকে লক্ষ্য করে সেই অন্ধকারে শাঁ-শাঁ করে ছুটে আসছে।

কে? তার পিঠে হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পড়তেই চমকে উঠল ভিখু। মুখ ঘুরিয়ে দেখল, অন্ধকারে একটা পাথুরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণাবাঈ।

কি—তুমি কিছু বলবে? অবশ্য তুমি যদি নিষেধ কর—

তোমার যখন খুব ইচ্ছা, তখন তাই যাও। দূরে কুয়াশা ঘেরা জমাট অন্ধকারের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল আবার, তোমার ইচ্ছেকে কি বাধা দিতে পারি আমি!

তুমি বলছো! তুমি বলছো কৃষ্ণাবাঈ! আনন্দে উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল ভিখু। সেই তরল অন্ধকারে কৃষ্ণাবাঈয়ের দীর্ঘ তন্বী দেহরেখাকে দেবী-মূর্তির মতো মনে হলো তার। অস্ফুটস্বরে ভিখু বলল, জানি তুমি নিষেধ করবে না।

কৃষ্ণাবাঈয়ের বুকে উতরোল কান্নার ঢেউ তোলপাড় করছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে বুকটা। তবুও মৃদু শান্ত গলায় বলল, কবে যাবে তোমরা?

কাল ভোরে—গুরোভ আর সুচস্কোভরা নদীতে নৌকো নিয়ে তৈরি হয়ে থাকবে।

আর কিছু বলল না কৃষ্ণাবাঈ। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ভল্গার বুকে নৌকো বোঝাই সশস্ত্র শিকারীদের উল্লসিত চোখ-মুখ, আর চেতনার ভেতরে ছায়াবাজির ছবির মতো ফুটে উঠতে লাগল, উটের পিঠ থেকে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে লাফ দিয়ে পড়ে গুরোভকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচানো, ওর সঙ্গে এত দহরম-

মহরম, ওঠা-বসা, চব্বিশ ঘণ্টা গুজুর-গুজুর গল্প ; সব—সব কিছুর কার্যকারণ যেন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

গভীর শোকের মতো কুয়াশা নেমেছে। সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা, বাতাসের সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফও পড়ছে। ভিখুর সঙ্গে কৃষ্ণাবাঈও মস্কোভো নদীর ঘাটে এল।

ভি-খু ভাই—এস-এস—তোমার দেরী দেখে আমরা তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল গুবোভ। ভিখু কৃষ্ণাবাঈয়ের ঠাণ্ডা হাতদুটো ধরে ঝাপসা গলায় বলল, যাই—তাহলে যাই, কেমন!

এস। বন্ধু-বিদায়ের হাসি হাসতে চাইল কৃষ্ণাবাঈ। কিন্তু হাসতে গিয়ে চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

নৌকোয় উঠে ভিখু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দূরে, তুষার-বৃষ্টি আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কৃষ্ণাবাঈয়ের ঝাপসা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির দিকে। নৌকো ছেড়ে দিল। ভাটির খরস্রোতে তরতর করে এগিয়ে চলল নৌকো। আর—

সেই জনমানবহীন নদীর পাড়ে আবছায়া অন্ধকারে নিঃস্ব আর রিক্ত একটা নিথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণাবাঈ। তার জলভরা চোখের ঝাপসা দৃষ্টির সামনে দূরে—বহুদূরে নদীর বুকে ঘন কুয়াশার ভেতরে একটা বিন্দুর মতই মিলিয়ে গেল ভিখুদের সেই নৌকো।

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

যাঁদের বই থেকে সাহায্য পেয়েছি :

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	মধ্যযুগের বাঙ্গলা, ১৩৩০
মোহাম্মদ সোলেমান	খোস গল্প, কলকাতা, ১৩২১
রজনীকান্ত চক্রবর্তী	গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড
রুশদেশের বিবরণ	(Pictures of Russia and its Peoples), Calcutta, The Christian Literature Society, 1902
বিনয় ঘোষ	ভারত-সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া, কলকাতা, ১৯৪৭
বিশ্বকোষ,	'রেশম'
Biswas, K.	Common Medicinal Plants of Darjeeling and Sikkim Himalays. Govt. of W. Bengal, 1956.
Dieulately, Jane	At Susa, The Ancient Capital of Kings of Persia. Philapheldia, 1885.
Encyclopedia of Islam Vol. 3	London, 1934.
Ferrier	Caravan Journeys and Wanderings in Persia, Afganisthan—Countries lying between Russia and India, London. 1851.
Foster, W.	Early Travels in India, 1583-1619, London, 1921.
Fraser, James	Travels and Adventures in the Persian Provinces on the Southern Banks of Caspian Sea. London, 1826.
Gray, Louis	Mythology of all Races, Celtic Slavic, Vol. 3, London, 1918.
Gwen, Benwell & Artour Waugh	Sea Enchantress. London, 1961.